ককেশাসের মহানায়ক

ইমাম শামিল

শাহেদ আলী অনূদিত

ককেশাসের মহানায়ক
ঈমাম শামিল

রচনা ও গবেষণা ঃ
মেজর আব্দুল হামিদ

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম-ঢাকা

ককেশাসের মহানায়ক
ঈমাম শামিল
শাহেদ আলী

প্রকাশক

মুহাম্মদ নূর উল্লাহ্, পরিচালক (প্রকাশনা)

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

ঢাকা অফিস ঃ ১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০। ফোন ঃ ৯৫৬৯২০১

চট্টগ্রাম অফিস ঃ নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম। ফোন ঃ ৬৩৭৫২৩

সর্বস্বত্ব ঃ প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশ কাল ঃ

ফেব্রুয়ারী ২০০০ইং, মাঘ ১৪০৬ বাং

মুদ্রাকর ঃ

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি (প্রিন্টিং প্রেস) লিঃ

১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০। ফোন ঃ ৭১১০৫৬২

প্রচ্ছদ ঃ

আরিফুর রহমান

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ

বন্ধু কম্পিউটার্স

২৮/সি, টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল, ঢাকা। ফোন ঃ ৯৫৫০১০৭

মূল্য ঃ ১২০/-

প্রাপ্তিস্থান ঃ

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

১২৫ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

১৫০-১৫১ গভঃ নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা।

নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম।

CAUCASUSER MOHANAYAK; Written by Major Abdul Hamid, Published by Muhammad Nur Ullah, Director (Publication) Bangladesh Co-operative Book Society Ltd., 125 Motijheel C/A, Dhaka-1000. Price Tk. 120.00, US$ 3.00.

চেচনিয়ার
শহীদ প্রেসিডেন্ট দুদায়েভের
অমর স্মৃতির প্রতি–

অনুবাদকের কথা

ভূগোল ভাষা ও রক্তকেন্দ্রীক জাতীয়তাবাদ বহু খন্ডে বিভক্ত করেছে মানবজাতিকে। মানুষ এখন নিজেদের তথাকথিত জাতীয় গন্ডির বাইরে আর কারো সম্বন্ধে উৎসাহী কিংবা আগ্রহী নয়। সবাই নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। এ হলো এক অন্ধ জাতীয়তাবাদ যা মানবজাতিকে খন্ডে খন্ডে বিভক্ত করে রেখেছে। মানবজাতির সুখ, শান্তি ও অগ্রগতি যে অবিভাজ্য এটা মানুষ ভুলে গেছে।

মুসলমানেরা এক উম্মাহর অন্তর্গত হলেও তারা বাস্তবে খন্ড বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে আছে বিশ্বব্যাপী- আধুনিক পাশ্চাত্যের তথাকথিত জাতীয় এক আদর্শের অনুকরণে এক ভঙ্গুর সুখস্বপ্নে ডুবে আছে, যতক্ষণ না আগ্রাসী বা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আক্রমণে তার এই বিচ্ছিন্নতা বিনষ্ট হয়। আজ ইসলামে বিশ্বাসীরা বন্দী হয়ে আছে নিজ নিজ ভূখন্ডে; বলতে গেলে তাদের বিরুদ্ধে সমগ্র পৃথিবী ঐক্যবদ্ধ। বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্র ও জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব সম্পর্কে আমরা উদাসীন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের মোকাবেলায় কোথায় কি প্রতিরোধ আন্দোলন হচ্ছে তা নিয়ে কেউ মাথায় ঘামায় না।

চেচেন নামক একটি ক্ষুদ্র মুসলিম জাতিগোষ্ঠী যারা দীর্ঘপ্রায় এক শতাব্দী ধরে মহাপরাক্রান্ত দানবিক রুশ শক্তির বিরুদ্ধে কেবলমাত্র বিশ্বাসকে সম্বল করে একটি অসম জেহাদ চালিয়ে যাচ্ছে তার খবর আমরা কতটুকুইবা রাখি। উপমহাদেশে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের বিরুদ্ধে সৈয়দ আহমদ শহীদ জেহাদ ঘোষণা করে তার সকল সঙ্গীকে নিয়ে বালাকেটে শাহাদাতবরণ করেন ১৮৩৩ সনে। ১৮৬৩-এর আম্বালার যুদ্ধে বৃটিশের পরাজয় হয় মোজাহিদদের হাতে। অনেকটা একই সময়ে ককেশাস পর্বতমালা প্রত্যক্ষ করে জারের বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রথম মুসলিম গেরিলা নেতা ঈমাম শামিলের পরিচালিত মোজাহিদ বাহিনীর তুমুল সংগ্রাম। মধ্যপ্রাচ্যের সাথে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় তাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের কাহিনী উপমহাদেশে পূর্বাঞ্চলে আমাদের প্রায় সকলের কাছে অজ্ঞাত। তবু এই সংগ্রামের গুরুত্ব ও প্রেরণা হ্রাস পায় না। দুঃসাহসী বিপ্লবী নেতা ঈমাম শামিল জার দ্বিতীয় নিকোলাসের শক্তির বিরুদ্ধে যে মরণপণ জেহাদ শুরু করেন তা প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল রুশ শক্তিকে চেচনিয়া ও দাগিস্তান অঞ্চলে বিপর্যস্ত করে রাখে। অবশ্য পরিশেষে চেচনিয়ার সাময়িক পরাজয় হয়।

কিন্তু শাশ্বত ইসলামী জীবনমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে ককেশাসের পার্বত্য অঙ্গনে ঈমাম শামিল ও তার সঙ্গীরা যে দুর্বার প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন, সেই

চেতনার কি মৃত্যু ঘটেছে! তার মৃত্যু নেই। আধিপত্যবাদ বিরোধী সেই বিপ্লবী চেতনা আজো প্রজ্জ্বলিত। তাইতো দেখতে পাই আজ একবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রুশ হায়েনার বিষাক্ত নখরে মুসলিম ককেশাস যখন রক্তে রঞ্জিত তখন ঈমাম শামিলের যোগ্য বংশধরেরাই সংগ্রামের ঝান্ডা উড্ডীন রেখেছেন। শামিল বাসায়েভ, শহীদ দুদায়েভ, আসলাম মাসখাদোভ, মৌলভী উদাগভ এরা সবাই ঈমামের সেই বিপ্লবীর চেতনারই উত্তরাধিকার বহন করছেন।

খোলাফায়ে রাশিদার শাসন-আমলের পর মুসলমানদের রাজনৈতিক ইতিহাস তমসাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। প্রতিক্রিয়াশীল রাজতন্ত্র, গোষ্ঠীতন্ত্র ও স্বার্থান্বেষীরা আল্লাহ প্রেরিত জীবন-আদর্শের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনে অনীহা দেখায়। সেই শুদ্ধ জীবন দর্শনের পুনরুদ্ধার এবং বাস্তবায়নের জন্যে চেষ্টা হয়েছে যুগে যুগে। ইসলামের ইতিহাস তার সাক্ষী। কারবালায় পরিবার-পরিজনসহ ঈমাম হোসেনের আত্মত্যাগ, আব্বাসীয় স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে ঈমাম মোহাম্মাদের প্রতিবাদ, মোগল অভিজাততন্ত্রের মোকাবেলায় মোজাদ্দিদ আল ফিসানী (রঃ)-এর সোচ্চার কণ্ঠস্বর, আঠারো শতকের ঈমাম শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী নির্দেশিত পনিপথের তৃতীয় যুদ্ধ, ঊনিশ শতকে ককেশাসে ঈমাম শামিলের এবং পাক-ভারত উপমহাদেশে টিপু সুলতান, সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী এবং তিতুমীরের নেতৃত্বে পরিচালিত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম এবং বর্তমান ইরান, কাশ্মীর, আফগানিস্তান, আলজেরিয়া ও মিশরে যে ইসলামী রাজনীতির স্ফূরণ ঘটেছে... এসবের মূলে রয়েছে একটিমাত্র লক্ষ্য ও প্রেরণা- স্বাধীনভাবে নিজ দেশে ইসলামী জীবনাদর্শের ভিত্তিতে উন্নত ও সুখী জীবন গড়ার পরিকল্পনা। রাজতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রের দ্বারা কলুষিত জীবনাচরণ ও জীবন ব্যবস্থাকে তার আদি বিশুদ্ধরূপে প্রতিষ্ঠার জন্য এই জেহাদের কখনো মৃত্যু হতে পারে না।

আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশে রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে কোরআন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অগণিত মুসলিম তরুণ আত্মোৎসর্গ করেছে। ঈমাম শামিল বইটির বঙ্গানুবাদ প্রয়োজন ছিল বাংলাভাষী স্বাধীনতাপ্রিয় জনগোষ্ঠীর জন্য। সকল রকম আধিপত্যবাদ ও তাগুতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম অব্যাহত রাখতে ককেশাসের সেই মহান ঈমামের সংগ্রামী জীবন বাংলাভাষীদের জন্য অনুপ্রেরণার চিরন্তন উৎস হবে- এই বিশ্বাসে দুর্লভ, গবেষণামূলক জীবনীভিত্তিক বইটি অনুবাদ করা হলো। কে জানে হয়তো চেচনিয়া ও দাগিস্তানের এই সংগ্রাম ও চীনের উইগরদের অভ্যুত্থান হয়তো আবার জন্ম দেবে এক অভূতপূর্ব ইসলামী বিপ্লবের, মানবজাতি যার প্রতিক্ষায় রয়েছে।

আজ পশুশক্তি রাশিয়া তার বিপুল অস্ত্র ও সামরিক শক্তি নিয়ে ক্ষুদ্র চেচনিয়াকে চিশ্চিহ্ন করার জন্য প্রবল হামলা চালিয়েছে; এই রাশিয়ার বিরুদ্ধে একদিন চেচনিয়া

ও দাগিস্তান তুমুল সংগ্রাম চালিয়েছিল জারের আমলে, কমিউনিস্ট আমলে কমিউনিস্ট স্টালিন গোটা চেচেন জাতিকে নির্বাসিত করেছিল সাইবেরিয়াতে, আর বর্তমানে একই ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে পাশব রুশ শক্তির বিরুদ্ধে চালিয়ে যাচ্ছেন জেহাদ, মাঠে-ময়দানে-যুদ্ধক্ষেত্রে, যওহর দুদায়েভ (শহীদ), শামিল বাসায়েভ, আসলাম মাসখাদোভ, খাত্তাব প্রমুখ মোজাহেদীন। পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিবাদী দানবকে ধ্বংস করার জন্য রাশিয়া যে বিশ্ব বিধ্বংসী মারণাস্ত্রের ভান্ডার গড়ে তুলেছিল, আজ রাশিয়া সেই শত্রুর সঙ্গে হাত মিলিয়ে পৃথিবীর দেশে দেশে মুসলিম শক্তি ও জাতিগুলোকে ধ্বংস করার জন্য সেই সব অস্ত্র ব্যবহার করছে। চেচনিয়াকে ধ্বংস করাই যেন মার্কস, লেলিন, স্টালিনের বংশধরদের একমাত্র সাফল্য! ক্ষুদ্র চেচনিয়ার একমাত্র অপরাধ মুসলমান পরিচয় নিয়ে তারা স্বাধীন থাকতে চায়।

মূল বইটির গ্রন্থকার বহু গবেষণা ও অনুসন্ধানের পর মৃতদেহে জীবনসঞ্চারি এই বইটি লিখে একটি অনুৎঘাটিত বিপ্লবের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। এ জন্য মেজর মোহাম্মদ হামিদ অমর হয়ে থাকবেন।

শাহেদ আলী
৮০/ডি, রোড নং-১১
বনানী, ঢাকা-১২১৩
ফোন নং- ৮৮২৭২২৫
E-mail chemon@vasdigital.com
or
aliberdi@email.com

ভূমিকা

ইউরোপীয় আগ্রাসন ও সাম্রাজ্যবাদের হামলায় গোটা মুসলিম বিশ্ব কুপোকাত হয়ে পড়ে। তার দম নাকের ডগায় এসে পড়ে। মানচিত্র থেকে অনেকগুলো দেশকে মুছে ফেলা হয়। অন্যেরা হারায় তাদের আজাদী। অবশিষ্ট যেসব রাষ্ট্রকে বেঁচে থাকতে ও নামমাত্র স্বাধীন থাকতে দেওয়া হয় তারা পাশ্চাত্য জগতের এতোটাই পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণে এসে যায় যে, তারা তাদের নিজেদের অবাধ কর্তৃত্বে তাদের আভ্যন্তরীণ বিষয়গুলো পর্যন্ত রক্ষা করতে পারলো না। মুসলিম বিশ্বের পরাজয়ের বহু কারণ রয়েছে। কিন্তু এখানে সেগুলো আলোচ্য নয়। তবু এখানে এটা উল্লেখ করা আবশ্যক যে, মুসলিম স্বাধীনতার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে কয়েকটি জ্বলন্ত কয়লা খন্ড তখনো নিভে নিভে জ্বলছে। কোন কোন দল পাশ্চাত্য প্রভুত্বের জোয়ার ঠেকাবার জন্য চূড়ান্ত প্রয়াস চালায়। কিন্তু বন্যার পানি বেষ্টিত কয়লা খন্ডের মতো তারা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। অবশ্য তারা স্বল্পক্ষণের জন্য হলেও আলো জ্বালিয়েছিল- যার আলো এখনো আমাদের চেতনার গভীরতম প্রদেশগুলোতে আলো ছড়ায়। তারা যদি বাধা না দিতেন মুসলিম অন্তর থেকে স্বাধীনতার শিখা চিরদিনের জন্য নিভে যেতো। আল্লাহতায়ালা এইসব স্বাধীনতা যোদ্ধার কবরগুলোকে জ্যোতির্ময় করে তুলুন, যাদের অন্তর-বেদনা পরবর্তী সকল মুসলমানদের জন্য দিয়েছে আভ্যন্তরীণ শক্তির উৎস।

মুসলমানদের স্বাধীনতা ও শক্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়ার ফলে মুসলমানদের জীবনে যে ট্র্যাজেডী নেমে আসে- তা-ই তাদের বেঁচে থাকার ইচ্ছাকে নির্মূল করার জন্য যথেষ্ট- যদি না এইসব যোদ্ধা অস্বীকার করতেন যে- গোলামী কখনো মুসলমানদের নিয়তি হতে পারে না। তাঁরা দৃঢ়প্রত্যয়ী ছিলেন যে, দাসত্ব মুসলমানদের জন্য হতে পারে না- তাই তাদের দুর্দশার আঁধার রাত্রি নিশ্চয়ই উজ্জ্বল প্রভাতের উদয়ে নিঃশেষ হবে। যদি অন্ধকার দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং গভীরতর প্রতীয়মান হয়, তাতে কিছু আসে যায় না। কারণ আলোর অভ্যুদয় ব্যর্থ হতে পারে না। তারা জানতো না যে, তাদের সংগ্রামের মাধ্যমে আলো আসবে কি-না। তারা জানতো না- তাদের যে বিপুল পরিমাণ রক্ত ক্ষরিত হয়েছে, তাই স্বাধীনতার প্রভাতজ্যোতিকে সূচিত করবে কি-না এবং তাদের জখমগুলোকে চূড়ান্ত বিজয়ের মলম দ্বারা পুরস্কৃত করা হবে কিনা। জাগতিক

হিসাবী লোকরা, যারা সংশয়বাদী, তারা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল যে, তারা যে ছোটখাটো সাময়িক বাঁধ দিয়েছে, ইউরোপের অগ্রগতির মহাপ্লাবনকে ঠেকানোর জন্য তা টিকবে না। এইসব হিসাবী লোকের টিটকিরিকে এই অসীম সাহসী যোদ্ধারা কোন গুরুত্বই দেয়নি। সম্ভবত তারা জানতো যে, প্রভাতী আলোর আবির্ভাবের পূর্বে লক্ষ-কোটি তারকা অস্ত যায়। সম্ভবত এই কারণেই তারা এই অসম পবিত্র যুদ্ধে কখনো ঢিলে দেয়নি।

আমাদের উপমহাদেশে ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলো এ ধরনের সংগ্রামীদের বীরত্বপূর্ণ কার্যকলাপে ভূষিত। টিপু সুলতান জীবনব্যাপী পরনির্ভরশীলতা ও বিলাসিতার পরিবর্তে শহীদের মৃত্যুকেই শ্রেয় মনে করেছিলেন। এই অঞ্চলের ইতিহাসের এমন কোন সিরয়াস অনুসন্ধানকারী নাই- যিনি সৈয়দ আহমদ শহীদ ও তার দুঃসাহসী সঙ্গীদের কৃতিত্বের সঙ্গে পরিচিত নন। ১৮৫৭ সনের রক্তরঞ্জিত ইতিহাস এখনো অনুপ্রাণিত করে আমাদের লেখকদেরকে। যদিও দেশের মানুষ মাওলানা আহমদ উল্লা শাহ্, আজমতউল্লাহ খান, খান বাহাদুর খান এবং বীর্যবতী রানী হযরত মহলকে ভুলে যেতে পারে, তবু ইতিহাস কখনো তাদের ভুলতে পারবে না, আরো অগণিত মানুষ ভুলতে পারে না যারা তাদের লক্ষ্যের বিষয় সম্পর্কে আশা নেই জেনেও সংগ্রামে প্রাণ দিয়েছে। উপমহাদেশে এমন কেউ নেই যে ১৮৫৭ সনে বিদেশী প্রভুত্বকে নির্মূল করার জন্য যে মহাসংগ্রাম পরিচালিত হয়েছিল তার সঙ্গে পরিচিত নন।

এমনকি আমার জীবনকালে উত্তর আফ্রিকার সেনুসিদের বিরুদ্ধে ইটালিয়ানদের বর্বর কার্যকলাপের বিরুদ্ধে উপমহাদেশের পত্র-পত্রিকাগুলোতে প্রায়ই উল্লেখ দেখেছি। আরব নেতাদেরকে প্লেন বোঝাই করে নিয়ে গিয়ে ভূমিতে প্লেন ভূপাতিত করে তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছে। বিস্তীর্ণ মরুভূমিতে বিক্ষিপ্ত পানির ঝর্ণা এবং কূপগুলো কংক্রিট দিয়ে ভর্তি করে ফেলা হয়, যাতে সেখানে কোন মানুষ বসবাস করতে না পারে। উপকূলীয় এলাকাগুলোতে প্রবেশ আরবদের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়- যাতে করে ইতালীয় উপনিবেশবাদীরা সেখানে বসতি স্থাপন করতে পারে; কোন আরব যদি সেই বাউন্ডারি অতিক্রমের সাহস করতো তাকে দেখামাত্রই গুলি করে হত্যা করা হতো। তবুও সংগ্রাম চলতে থাকে। অবশেষে অগণিত শহীদের রক্তে নিষিক্ত স্বাধীনতার চারাটি হয়ে উঠে একটি বিশাল মহীরুহে- যা এখন সমৃদ্ধিশালী দেশ লিবিয়া।

ঔপনিবেশিক প্রভুত্বের অন্ধকারে মরক্কোর পর্বতসঙ্কুল রীফ অঞ্চলে মহান বিপ্লবী যোদ্ধা আব্দুল করিম স্পেনিশ সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তিকে নাড়িয়ে দিয়েছিলেন, একটি সংক্ষিপ্ত অথচ উজ্জ্বল মুহূর্তে। আতাতুর্ক যদিও ইসলামের নামে যুদ্ধ

করেননি, তবুও তিনি পরাজিত এবং যুদ্ধক্লান্ত তুর্কীদের সমবেত করে তাদের দেশ থেকে গ্রীকদের বিতাড়িত করেন এবং মিত্র শক্তির ষড়যন্ত্রকে চূরমার করে দেন।

এমনকি এখন পর্যন্ত ফিলিস্তিনের মুক্তিযোদ্ধারা- সন্দেহ নেই এদের কেউ কেউ বিভ্রান্ত এবং আত্মঘাতী নীতি অনুসরণ করছেন- তবুও বীর ফিলিস্তিনীরা জিওনিজম ও পাশ্চত্য মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে দুঃসাহসিক যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে।

এসব ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় মুসলিম জাতিপুঞ্জ তাদের হৃদয়ে জেহাদের সেন্টিমেন্ট নিরবচ্ছিন্নভাবে পোষণ করেছে। কখনো তারা এই অনুভূতিকে মৃত্যুবরণ করতে দেয়নি। ঈমাম শামিলের জেহাদও একই কাহিনীর অংশ। পৃথিবীতে আমাদের এই অংশে মুসলিম জগত পরিচিত নয়। প্রকৃতপক্ষে ঈমাম শামিলের নাম এই উপমহাদেশের লোকরা এতো সামান্যই জানে যে, অনেকে তার নাম পর্যন্ত শুনেননি। এই ঘাটতি এখন সুন্দরভাবে পূরণ করেছেন ক্যাপ্টেন মোঃ হামিদ- এই পুস্তকের গ্রন্থকার।

রাশিয়ানরা মুসলিম এলাকার বিশাল বিশাল অঞ্চল দখল করে নিয়েছিল, এখনো তারা এগুলো দখল করে আছে। সকল রকমের সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে কমিউনিস্ট সাম্রাজ্যবাদ সবচেয়ে বেশি স্থায়ী প্রমাণিত হয়েছে। এর কারণ হচ্ছে এটি টিকে থাকে একটি সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর উপর, যা ঈমানের অবক্ষয়ের উপর মরণ কামড় দিয়ে বসে। বৈদেশিক শাসন তাকে মদদ যোগায়। এভাবে মহামতি আনোয়ার পাশার চমৎকার এবং নিবেদিত নেতৃত্বে তুর্কীস্থানে মুসলিম সংগ্রাম পরিণামে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং বহু যুদ্ধের বীর অনেক বেশি বৃহত্তর যুদ্ধক্ষেত্রে যিনি জয়ী হয়েছিলেন, তিনি শহীদ হন, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর একটি বিপথচালিত অংশের বিশ্বাসঘাতকতায়; এই অংশটি তাদের নিজ জনগোষ্ঠীকে গোলামে পরিণত করতে সাহায্য করে। রাশিয়ার রুশ প্রভুত্বের অধীন মুসলিম অঞ্চলগুলোর সাথে আমাদের ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ছিল গভীর এবং অন্তরঙ্গ। পাকিস্তানের সংস্কৃতি আজকের দিনেও মধ্য এশিয়ার প্রভাব বহন করছে। সাহিত্য এবং কবিতার মাধ্যমে ককেশিয়া এবং আরো দূরবর্তী অঞ্চলের নগরীগুলোর নাম আমাদের কাছে পরিচিত। অবশ্য অল্প কয়েকটি নগরীর নাম বদল করে নতুন নাম দিয়েছে বিদেশী প্রভুরা, যাতে মুসলিম ইতিহাসের সঙ্গে তাদের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

এসব দেশ সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতার মূলে রয়েছে বিদেশীদের গোলামীকালে মুসলিম জগতের ইতিহাস। শুরুতে বলা যায়, দুটি বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি- গ্রেট বৃটেন এবং রাশিয়ার জার আমাদেরকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। সকল

সম্পর্কের এবং যোগাযোগের বন্ধন সম্পূর্ণ কেটে ফেলে। এখন ককেশিয়া এবং মধ্য এশিয়া চলে গেছে রুশ শাসনের লৌহ যবনিকার অন্তরালে। আমাদের সম্পর্ক ইচ্ছাকৃতভাবে নষ্ট করে দেওয়া হয় এবং সে সম্পর্ক আর পুনরুদ্ধার করতে দেওয়া হয়নি। এই জন্যই আমরা মুসলিম দেশসমূহে রাশিয়ান আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ইতিহাস সম্পর্কে বলতে গেলে কিছুই জানি না। আমরা এ সম্পর্কেও বেশি কিছু জানি না যে এসব দেশে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং তার আজ্ঞাবাহী গভর্ণমেন্টগুলোর দ্বারা পরিচালিত বিধ্বংসী প্রোগ্রামের মোকাবেলায় তাদের ঈমান রক্ষা করার জন্য মুসলমানরা গোপনে কী প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

এই কাহিনীর একটি যোগসূত্র আমরা পাচ্ছি জারের সরকারের বিরুদ্ধে ঈমাম শামিলের সংগ্রামে। ঈমামকে দমন করার জন্য জারের এই অভিযান উন্মুক্ত ময়দানে একতরফা লড়াই ছিল না। শেষ পর্যন্ত এই সংগ্রাম ব্যর্থ হয়। কারণ এই সংগ্রাম পরিচালনা করেছিলেন মুষ্টিমেয় সঙ্গতিবিহীন অথচ প্রচন্ড সাহসী যোদ্ধা, এক সুবৃহৎ এবং সুসংগঠিত শক্তির বিরুদ্ধে মুসলিম জগতের সামনে নির্ভরযোগ্য তথ্য পরিবেশন করে উম্মাহর যথার্থ খেদমত করেছেন। তিনি পরিশ্রমের সঙ্গে তথ্য সংগ্রহ ও বাছাই করেছেন।

আমার বিশ্বাস আগ্রহের সাথে এই পুস্তকটি পাঠ করা হবে এবং এই উত্তেজনাময় কাহিনীর বিবরণে এমন কি মৃত অন্তরও উত্তপ্ত হয়ে উঠবে।

– আর. এইচ. কোরেশী

মুখবন্ধ

মুসলিম বিশ্বের জন্য আঠার শতকের শেষার্ধ এবং ঊনিশ শতক ছিল মহাদুর্যোগের কাল। ১৭৯৯ সনে টিপু সুলতান শাহাদাত বরণ করেন। একই শতকে তুর্কী নৌবহর পরাজিত হয়। টিপু সুলতানের কবরের উপর 'হিন্দুস্থানের গৌরব ও রোমের মহিমার অস্ত' খুদিত লিপি আমাদেরকে দু'টি ঘটনার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

এই বছরই কাস্পিয়ান ও কৃষ্ণ সাগরের মধ্যে অবস্থিত দাগিস্তানের এক অজ্ঞাত পল্লীতে ঈমাম শামিল জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল ধরে মুসলিম দেশগুলোর উপর জারের সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অকুতোভয় সংগ্রাম চালিয়ে যান। উপমহাদেশের মুসলমানদের কাছে আমাদের ইতিহাসের এই রক্তরঞ্জিত অধ্যায় কখনো মেলে ধরা হয়নি। এই গেরিলা যুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিল দাগিস্তানের পাহাড়-পর্বত এবং জঙ্গলগুলোতে। এ ছিল এক অতুলনীয় সংগ্রাম। কারণ, অস্ত্র-শক্তি ও সাজ-সরঞ্জামের দিক দিয়ে দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও দাগিস্তানীরা জারের বিপুল সামরিক শক্তির অগ্রগতিকে ঠেকিয়ে রাখে, রসদ এবং সাজ-সরঞ্জামের একান্ত অভাব সত্ত্বেও তারা রাশিয়ান শক্তির কাছে মাথা নত করতে অস্বীকার করে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে গেরিলা যুদ্ধ অতিশয় গুরুত্ব অর্জন করেছে। সামরিক ইতিহাস লিখতে গিয়ে পশ্চিমা লেখকেরা গুরুত্বপূর্ণ এই জাতীয় যুদ্ধের উপর বিশাল বিশাল পুস্তক লিখেছেন। কেননা ল্যাটিন আমেরিকা এবং ইন্দোচীনে এই জাতীয় যুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিল। যন্ত্রশক্তির দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সামরিক বাহিনীকে পরাভূত করার জন্য অনেক জাতি এই ধরনের যুদ্ধ প্রণালী গ্রহণ করেছে। হোচীমিন এবং জেনারেল গিয়াপ ফরাসীদেরকে পরাজিত করেন এবং পরে আমেরিকানদের বিতাড়িত করেন এই ধরনের অনিয়ন্ত্রিত যুদ্ধরীতির মাধ্যমে। আলজেরিয়ানরাও একই যুদ্ধরীতি অবলম্বন করে তাদের দেশকে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের কবল থেকে মুক্ত করে।

ঈমাম শামিল ছিলেন এরূপ যুদ্ধের একজন প্রবর্তক, অগ্রবর্তী পথপ্রদর্শক। অত্যন্ত সঙ্গতকারণেই তাঁকে প্রথম মুসলিম গেরিলা নেতা বলা হয়ে থাকে- যদিও তিনি সম্পূর্ণ বিজয় অর্জন করতে পারেননি। তবুও পৃথিবীব্যাপী স্বাধীনতা যোদ্ধাদের জন্য তিনি পশ্চাতে রেখে গেছেন এক মহৎ দৃষ্টান্ত।

ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ হামিদ যিনি ঈমাম শামিলের উপরে এই অতুলনীয় বইটি লিখেছেন তিনি আন্তরিক অভিনন্দনের পাত্র। তিনি ক্রমবর্ধমান গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ের উপর বইটি লিখেছেন। বইটির রচনারীতি হৃদয়গ্রাহী। ভাবালুতাকে প্রশ্রয় না দিয়ে তিনি ঐতিহাসিক তথ্য পরিবেশন করেছেন। চিত্তাকর্ষক রচনারীতিতে তিনি বিষয়বস্তু পরিবেশণ করেছেন। ঈমামের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা এতই চমৎকার এবং এতই উত্তেজক যে, একজন অতি সাধারণ পাঠকও পর্যন্ত এই বইয়ের কোথাও একঘেঁয়ে বোধ করবেন না। মুসলিম মিলিটারী ইতিহাস সম্পর্কিত সাহিত্যে ঈমাম শামিলের জীবন নিয়ে রচিত এই গ্রন্থ একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

– ফজল মুকীম খান
মেজর জেনারেল (অবঃ)

গ্রন্থকারের মন্তব্য ঃ

প্রথমেই আমি আল্লাহকে শুকরিয়া জানাচ্ছি যিনি আমাকে এই বই লেখার তৌফিক দান করেছেন।

আমাদের মহানবীর মহৎ দৃষ্টান্ত আমাদের ইতিহাসের সবচেয়ে কঠিন মুহূর্তগুলোতেও সবসময় আমাদের পথ আলোকিত করেছে। অবশ্য বিগত শতকের দু'টি বছর অর্থাৎ ১৮৩১ ও ১৮৫৭ সন প্রোজ্জ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই দু'টি বছর আমাদের ইতিহাসে অভাবনীয় ট্র্যাজেডীর বছর। ১৮৩১ সনে বালাকোটে আমাদের আজাদী আন্দোলনের মহান বীরপুরুষ সৈয়দ আহমদ শহীদ তাঁর সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে শাহাদাৎ বরণ করেন। এভাবে আমাদের সংগ্রামের একটি অধ্যায় শেষ হয়। অবশ্য মুসলিম শাসকদের বিতাড়িত করার চেষ্ট চলতে থাকে। ১৮৫৭ সনে এসব প্রয়াস চূড়ান্ত সীমায় উপনীত হয়। তখন থেকে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের অনল শিখাকে নির্বাপিত করার জন্য বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ আজাদী সংগ্রামের মোকাবেলা করার জন্য চেষ্টা অব্যাহত রাখে।

১৮৩১ এবং ১৮৫৭-এর মধ্যবর্তী সময়টা সাধারণত আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে কম ঘটনাবহুল বলে বিবেচিত হয়ে এসেছে। যেসব মুজাহিদ বালাকোট থেকে আত্মরক্ষা করতে পেরেছিলেন তাঁরা পরে দীর্ঘকালব্যাপী তাদের সংগ্রাম অব্যাহত রাখেন। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে আমবালার যুদ্ধ এবং বৃটিশ ফৌজের পরাজয় ও ক্ষয়ক্ষতি প্রমাণ করে যে, মুজাহিদ যোদ্ধারা ছিল একটি প্রচন্ড শক্তি, তারা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের উপর মরণ আঘাত হানতে সম্পূর্ণ ক্ষমা রাখতো। যাই হউক, মোটামুটিভাবে বলা যায়, ১৮৩১ ও ১৮৫৭-এর মধ্যবর্তী বছরগুলো থেকে গেছে অনেকটা নীরব। কিন্তু সেই সময়ে ককেশাস পর্বতমালা ঈমাম শামিল পরিচালিত মুজাহিদ বাহিনী ও জারের ফৌজের মধ্যে প্রচন্ড সংগ্রাম লক্ষ্য করেছে। এই উপমহাদেশে আমাদের প্রায় সকলের কাছেই তাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী অজ্ঞাত থেকে গেছে। এতে কিন্তু এই সংগ্রামের গুরুত্ব বিন্দুমাত্র কমে যায় না। ঈমাম শামিলের গেরিলা দলগুলো জারের ফৌজকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়েছিল। ভালমীনোফ নামক একজন রুশ জেনারেল বলেছিলেন, "এইসব যুদ্ধে আমরা যেসব ফৌজ হারাই এবং আমাদের যেসব লোকজন নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, তারা আমাদের জন্য তুরস্ক হতে জাপান পর্যন্ত সুবিস্তৃত অঞ্চল জয় করতে পারতো।"

ইতিপূর্বে কখনো একজন গেরিলা নেতা হিসেবে ঈমাম শামিলের মহান ব্যক্তিত্বকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়নি। তিনি জারের বাহিনীর তখনকার দিনের বীরশ্রেষ্ঠ

জেনারেলদের পরিচালিত শ্রেষ্ঠ সেনাবাহিনীর মোকাবেলা করেন এবং তাদের পরাভূত করেন। তিনি নিজে বহুবার পরাজিত হন এবং প্রত্যেকবারই তাঁর ফৌজ ও লোকজনকে আবার সংগঠিত করেন এবং রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে আবার বিপুলতর সংখ্যক ফৌজ নিয়ে মোকাবেলা করেন। তিনি যুদ্ধের বিভিন্ন পর্যায়ে তার ফৌজকে চমৎকারভাবে পরিচালিত করেন এবং জারের ফৌজের বিশাল ব্যূহগুলোকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেন। গেরিলা যুদ্ধের ইতিহাসে এমন দুঃসাহসিক কার্য ও অত্যুৎকৃষ্ট কৌশলের দৃষ্টান্ত আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাকে পৃথিবীর প্রথম মুসলিম গেরিরা নেতা হিসেবে স্বীকার করে নেয়াই হবে একটি সঠিক সিদ্ধান্ত।

আমি সৈয়দ আহমদ শহীদ ও ঈমাম শামিলের ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিকের মধ্যে বিপুল সাদৃশ্য দেখতে পাই। স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতারা পবিত্র কোরআনের নির্দেশমত সংগ্রাম পরিচালনা করেছিলেন। তাদের জীবনে বহু অভিন্ন দিক দেখা যায়। কারণ মহাগ্রন্থ কোরআন যে বৈপ্লবিক প্রেরণা সঞ্চারিত করে থাকে- তাদের চিন্তা ও কর্মের মূল স্রোতের উৎস ছিল তাই। সৈয়দ আহমদ শহীদ শারীরিক দিক দিয়ে সহিষ্ণু জীবনযাপন করেন। ঈমাম শামিলও কঠিন পরিশ্রমী জীবনের কষ্টগুলোর সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে উঠেন। তিনি শারীরিক শক্তির দিক দিয়ে দুর্ধর্ষতম পার্বত্য লোকদের ছাড়িয়ে যান। তিনি অশ্বারোহন এবং গুলি চালনায় ছিলেন সকলের সেরা এবং এসব ব্যাপারে তিনি সমগ্র দাগিস্তানে ছিলেন বিখ্যাত।

সৈয়দ আহমদ শহীদ তাঁর জিহাদ আন্দোলন শুরু করার আগে সমাজকে সাধারণ পাপাচার থেকে মুক্ত করার জন্য চেষ্টা করেছিনে। ঈমাম শামিল সমাজে প্রচলিত আদাতগুলোরও মোকাবেলা করেন। এগুলো সামাজে প্রবেশ করে এতোটাই ছড়িয়ে পড়েছিল যে, এসবরে প্রাদুর্ভাব মারাত্মক আকার ধারণ করে। তিনি কেবলমাত্র সামাজিক পাপ ও অপরাধগুলোর বিরুদ্ধে লড়াই করবার পরই সবাইকে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়তে অনুপ্রাণিত করেন। সৈয়দ আহমদ সাধারণ মানুষের মধ্য থেকেই সংগ্রহ করেছিলেন তাঁর সহচরদের।

ঈমাম শামিলও কৃষকদের মধ্যে পেয়েছিলেন তাঁর অনুসারী।

এইসব পার্বত্য জনগোষ্ঠীর প্রতি আমাদের অবশ্যই শ্রদ্ধা নিবেদন করতে হবে- যারা প্রায় অর্ধশতাব্দী জারের বিশাল সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তাদের ঘরবাড়ি ধ্বংস করে ফেলা হয়েছিল, তাদের পরিবার-পরিজনকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়, তবুও তারা কখনো আত্মসমর্পণ করতে চায়নি। তাদের বাগ-বাগিচা ও ফলের বাগানসমূহ আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলা হয়, তাদের মাঠ-ময়দান পুড়িয়ে ভষ্মীভূত করা হয় এবং তাদের জীবিকার সমস্ত উপায় ব্যর্থ করে দেওয়া হয়, তবুও তাদের সংগ্রামের নেশা ছিল প্রচন্ড। ভীত না হয়ে তারা এইসব অত্যাচার ও ধ্বংসলীলার মোকাবেলা করে।

সংক্ষেপে এই-ই ছিল এই জনগোষ্ঠীর চরিত্র- যারা বাইরের কোন সাহায্য ছাড়াই কেবলমাত্র আল্লাহর উপর এবং তার নবীর উপর বিশ্বাসের বলেই, কোন কামান গোলা ছাড়াই যুদ্ধ চালিয়ে যায়। তাদের নিজেদের দক্ষিণ হস্ত এবং ঝলকে উঠা তলোয়ার নিয়ে রুশ মহাশক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। তারা রুশ ফৌজকে পরাজিত করে। তাদের বসতিসমূহের উপর হামলা চালায় এবং রাশিয়ার ধন-সম্পদ তার অহংকার ও বিপুল সংখ্যার প্রতি বিদ্রুপের হাসি বিচ্ছুরিত করে। পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে যে কাহিনী উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে, তাতে তাদের দুঃসাহসিক কার্যকলাপের বিবরণ মিলবে। তাদের এই সব কর্মকান্ড প্রেরণাদায়ক ও রক্তের উষ্ণতায় পূর্ণ হলেও তাদের ইতিহাস দীর্ঘদিন ধরে ধূলি সমাচ্ছন্ন আলমারীর অন্ধকারে মৃত ইতিহাসের পাতায় রক্ষিত আছে। মুসলিম বিশ্ব এবং তার পন্ডিতজনেরা এইসব জানার জন্য কোন চেষ্টাই করেনি। যাই হউক, মাত্র সম্প্রতি এই বীরত্বপূর্ণ গেরিলা যুদ্ধ সম্পর্কে কিছুটা আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। তুর্কী ভাষায় কয়েখটি পুস্তকও প্রকাশিত হয়েছে। ইংরেজি ভাষায় এই প্রথম শামিলকে তার সত্যিকার রূপে পেশ করা হচ্ছে। এর আগে জন এফ ব্যাডলী এবং লিজলি ব্লাংক তার সম্পর্কে লিখেছেন। ব্যাডলীর লেখা সিরিয়াস ধরনের। লিজলি ব্ল্যাংক শামিলকে ঘিরে সৃষ্টি করেছেন একটি রোমান্টিক আবহাওয়া। এখানে পৃথিবীর প্রথম মুসলিম গেরিলা নেতার কার্যাবলীর একটি প্রকৃত বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে, যে গেরিলা নেতা অর্ধশতাব্দী ধরে মহাশক্তিশালী একটি রাষ্ট্রের শক্তির মোকাবেলা করেছেন। এইসব মুজাহিদদের সম্মুখে সংখ্যায় বিপুল পরিমাণে শ্রেষ্ঠতর, সম্পদ এবং পেশাগত যোগ্যতার দিক দিয়ে প্রবলতর রুশ ফৌজ টিকতে পারেনি। এইসব মোজাহেদীন ঈমাম শামিলের ঝান্ডার নীচে রেখে গেছেন বীরত্বপূর্ণ কৃতিত্বের অনুপম সব দৃষ্টান্ত, যা পবিত্র কোরআনের এই আয়াতের সত্যতাই প্রমাণ করে- "আল্লাহর ইচ্ছায় অনেক ক্ষুদ্র শক্তিশালী দলও বৃহৎ দলের উপর জয়লাভ করেছে।"

এদের অকুতোভয় সাহসের ইতিহাস লিখিত রয়েছে ককেশাসের শিলাবহুল পর্বতগুলোতে। তাদের সম্পর্কে আমাদের লোকরা কম-ই জানে। আমি এই বিশ্বাস নিয়ে তাদের অপরিমেয় সাহসের প্রচন্ড কীর্তিমালার ইতিহাস লিখবার চেষ্টা করেছি- যেন তাদের এইসব অতুলনীয় বীরত্বের কাহিনী এবং কোরবানী জনগণের মধ্যে সৃষ্টি করে আশা, সাহস এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। কোন একটি অনুভূতিপ্রবণ হৃদয়েও যদি তা জাগে, আমার ক্ষুদ্র প্রয়াস বিপুলভাবে পুরস্কৃত হয়েছে বলে মনে করবো।

আমি যে অবস্থায় এই বইটি লিখে যাচ্ছি, তা এখানে উল্লেখ করা সঠিক হবে বলে মনে করি। যারা কার্যকারণের পৃথিবীতে বিশ্বাস করে তারা এর প্রতি ততোটা গুরুত্বারোপ নাও করতে পারে। কিন্তু আমি যে এই বইটি লিখতে পেরেছি, তা

আমি ঈমামের রুহানী আশীর্বাদ বলে মনে কর। ঈমাম ছিলেন নক্সবন্দিয়া তরিকার সদস্য এবং তিনি ছিলেন দাগিস্তানের তাহরিক-ই-মুরিদিয়াতের ঈমাম। আমি নিজে নক্সবন্দিয়া তরিকার প্রতি আনুগত্যশীল। আমার মুর্শিদ মরহুম আবদুল মালেক সিদ্দীকি নক্সবন্দির জরিয়ায় (আল্লাহ তার রুহকে সম্মানিত করুন) এভাবে আমি ঈমাম শামিল সম্পর্কে লিখতে পারাকে একটি মহৎ সম্মান মনে করছি। ১৯৭১ সনে ঢাকার পতনের পর আমি খুব হতাশ অবস্থায় বসেছিলাম পাকিস্তান মিলিটারী পাঠাগারে। আকস্মিকভাবে একটি পুস্তকে আমি ঈমাম শামিলের ছবি দেখতে পাই। এই বীর্যবন্ত মানুষটির মর্মভেদী দৃষ্টি আমাকে আকৃষ্ট করে। আমি পুস্তকটির পাতা উল্টিয়ে ঈমাম শামিল সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পাই। এরপর আমি আমার আয়ত্বাধীন সকল উপাদান সংগ্রহ করতে থাকি। অনেক সময় আমাকে ধুলিসমাচ্ছন্ন বিশাল বিশাল গ্রন্থ তন্ন তন্ন করে খুঁজতে হয়েছে মাত্র কয়েকটি লাইনের জন্য। আল্লাহর প্রতি সমস্ত শুকরিয়া যে, আমার ভালবাসার এই শ্রম ব্যর্থ হয়নি এবং বইটি সম্পূর্ণ করতে সক্ষম হই।

যেসব পন্ডিত এবং বন্ধুগণ আমাকে উৎসাহিত করেন এবং এই বইটি রচনার ব্যাপারে আন্তরিক আগ্রহ দেখান তাদের সংখ্যা বিপুল। অবশ্য এস্থলে তাদের কারো কারো নাম উল্লেখ করা সমীচিন হবে। সোভিয়েত মুসলমানদের ব্যাপারে একজন মহা পন্ডিত সামাদ শাহীন আমাকে সাহায্য করেন কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বই উদ্ধার করতে। তিনি সব সময় আমাকে উৎসাহ যুগিয়েছেন। জনাব আবদুল লতিফ উলফত আমাকে অনেকগুলো বই ধার দেন। ইসলামাবাদ ইসলমিক রিসার্চ ইনস্টিটিউটের লাইব্রেরীয়ান বিখ্যাত বিবলীওগ্রাফার জনাব মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস হাশমী এবং মহান রিসার্চ স্কলার জনাব মাহমুদ আহমদ গাজী, প্রেসিডেন্ট, কাউন্সিল অব ওয়ার্ল্ড মুসলিম এ্যাফেয়ার্স আমাকে সর্বপ্রকার সাহায্য করেন। ডঃ রিজাউল ইসলাম ইতিহাস বিভাগের প্রদান এবং ডঃ মোহাম্মদ সাবির, ইসলামিক হিস্ট্রির প্রধান, করাচী বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে সাহায্য করেন। ডঃ রিয়াজ, ডঃ সাবিরের অবিন্যস্ত একটি তুর্কী বই সম্পর্কে আমকে অবহিত করেন এবং আমাকে বইটি পাঠিয়ে দেন। মেজর ওয়ারিস কারিস তুর্কীস্থানের লোক, তিনি বইটির পাঠোদ্ধার করেন। ব্রিগেডিয়ার সৈয়দ নাসির উদ্দিন (বর্তমানে জেনারেল হেড কোয়ার্টারে আর্মি এ্যাডুকেশনের পরিচালক) আমার প্রজেক্ট সম্পর্কে প্রচুর আগ্রহ দেখান এবং আমাকে উৎসাহিত করেন। আমি যখন এই বইটি লিখছিলাম, তখন তিনি ছিলেন আমার ডিপার্টমেন্টের প্রধান।

বিমান হেড কোয়ার্টারের মেটিভেশন ডাইরেক্টর গ্রুপ ক্যাপ্টেন এনামুল হক এবং ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের একজন সাবেক লাইব্রেরীয়ান কিছু গুরুত্বপূর্ণ পুস্তকের অনুসন্ধান পেতে আমাকে সাহায্য করেন।

ডঃ ইশতিয়াক হোসেন কোরেশী আমাদের কালের একজন বিখ্যাত ইতিহাসবিদ এবং করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর, একটি প্রস্তাবনা লিখে দিয়েছেন এবং সৌদি আরবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত মেজর জেনারেল (অবঃ) ফজল মুকীমও একটি মুখবন্ধ লিখে দিয়েছেন। তারা আমার সম্পর্কে যেসব সদয় উক্তি করেছেন, তাতে আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। পাকিস্তান ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলীর সাবেক সদস্য মাওলানা জাফর আহমদ আনসারী আমাকে ঈমাম শামীলের পৌত্র আল-উস্তায আস-শাইখ সারিদ শামিলের ঠিকানা দেন; তিনি মাওলানা আনসারীর একজন বিখ্যাত বন্ধু। বর্তমানে মদিনায় বসবাস করছেন। ইস্তাম্বুলের ইসলামিক মাদনিয়াতের সম্পাদক ডঃ জাহিদ বালতাসি আমাকে ঈমাম শামিলের তুর্কী ভাষায় লিখিত দুটি জীবনী পাঠান। কর্ণেল ফারুক সিদ্দিকী তুর্কী ভাষার একজন পন্ডিত। আমার নিজের প্লাটুন কমান্ডার কর্ণেল মোঃ আজম ছাড়াও আমি একাডেমীতে আমার কোম্পানী কমান্ডারের কাছ থেকে সামরিক বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করি। পাকিস্তান মিলিটারী একাডেমীর পাঠাগারের কর্মচারীরাও আমার ধন্যবাদের পাত্র। আমি এই পাঠাগারে আমার জীবনের প্রকৃষ্ট মুহূর্তগুলো কাটিয়েছি এবং এখানেই এই বইটি লিখার তাগিদ পাই। উপমহাদেশের বিখ্যাত ইতিহাসবিদ জনাব সাবাহউদ্দিন আব্দুর রহমান, যিনি বর্তমানে আজমগর শিবলি একাডেমীর ডিরেক্টর বরাবরই আমার প্রতি ছিলেন অনুগ্রহশীল। তিনি পান্ডুলিপিটি আগাগোড়া পাঠ করেন এবং এর ভাষা ও বিষয়বস্তুকে সজ্জিত করেন। এ জন্য আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। মারিয়াম জমিলাও দয়া করে পান্ডুলিপিটি আগাগোড়া পড়েছেন এবং মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন, যার জন্য আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পুস্তকের শেষে যে নির্ঘন্ট সংযোজিত হয়েছে, তা মমতাজ মনোয়ার কুরেশী এমএলএস-এর প্রভূত পরিশ্রমের ফল। আমি এদের সকলের নিকটই কৃতজ্ঞ। কারণ এদের সহৃদয়তা ছাড়া এই পুস্তকটি এর বর্তমান রূপে প্রকাশিত হওয়া ছিল অসম্ভব।

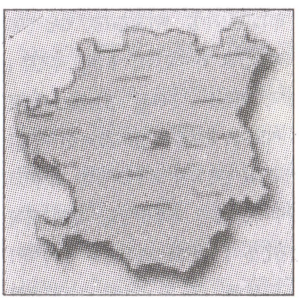
এই পুস্তকের যে কোন ভুলত্রুটি বা বিচ্যুতির জন্য কেবল আমিই দায়ী। পাঠকরা যদি তাদের মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে আমাকে সাহায্য করেন, আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হবো। আমি এখন একটি বড় প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করতে যাচ্ছি। অর্থাৎ দুই ভলিউমে মুসলিম মিলিটারী ইতিহাসের বিশ্বকোষের জন্য আমি এ ধরনের একটি উদ্যোগে আগ্রহী সকলের সাহায্য প্রার্থনা করছি।

মোঃ হামিদ
পাকিস্তান মিলিটারী একাডেমী, কাকুল
১৩ই জানুয়ারী, ১৯৭৭ইং।

সূচীপত্র

চেচনিয়া পরিচিতি-মানচিত্র-ব্যক্তিত্ব	১
অধ্যায় এক ঃ ভৌগোলিক অবস্থান	৯
অধ্যায় দুই ঃ জিহাদ আন্দোলন	১৭
অধ্যায় তিন ঃ রুশ অভিযান	২৭
অধ্যায় চার ঃ ঈমাম শামিলের আমল	৩৬
অধ্যায় পাঁচ ঃ ঈমামের নতুন কৌশল	৬১
অধ্যায় ছয় ঃ ঈমাম শামিলের সফল অভিযানসমূহ	৭০
অধ্যায় সাত ঃ বিফল দার্গো অভিযান	৮৪
অধ্যায় আট ঃ হাজী মুরাদ	১০১
অধ্যায় নয় ঃ শেষ মোকাবেলা	১২১
পরিশিষ্ট	১৩৬
দেশী-বিদেশী প্রচার মাধ্যমে চেচনিয়া যুদ্ধের উপর রিপোর্ট-	১৪২
ফটো গ্যালারী	১৪৮

চেচনিয়া পরিচিতি



চেচনিয়া একটি প্রজাতন্ত্র- উত্তর ককেশিয়া পূর্বাঞ্চলে দক্ষিণ-পশ্চিম রাশিয়ায় উত্তর-পশ্চিমে দাগিস্তান প্রজাতন্ত্র দক্ষিণে জর্জিয়া এবং ইঙ্গুসেতিয়া প্রজাতন্ত্র। চেচেনগণ তাদের প্রজাতন্ত্রকে বলে ইচকেরিয়া চেচনিয়া রাশিয়ার ২১টি প্রজাতন্ত্রের অন্যতম। এগুলো হচ্ছে রাশিয়ার অভ্যন্তরে সর্বাধিক পরিমাণ স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র।

১৯৩০ থেকে ১৯৯১ পর্যন্ত সোভিয়েত রাশিয়ার যৌথ চেচেন ইঙ্গুইস স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রে অংশ ছিল; ১৯৯৬ সনে নিজেকে স্বাধীন ঘোষণা করে এবং ইঙ্গুসেটিয়া প্রজাতন্ত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। রুশ সরকার চেচনিয়ার স্বাধীনতা মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়। ১৯৯৪-এর ডিসেম্বরে রুশ ফৌজ প্রজাতন্ত্রকে অবরোধ করে রাশিয়া এবং চেচেনদের মধ্যে সর্বাত্মক যুদ্ধে ৪০০০০ চেচেন শহীদ হয় এবং লক্ষ লক্ষ চেচেন নর-নারী-শিশু বাস্তুচ্যুত হয়।

চেচনিয়ার মোট ভূভাগ হচ্ছে ১৫০০০ বর্গকিলোমিটার বা ৫৪০০ বর্গমাইল। ককেশাস পর্বতমালার উত্তরমুখী ঢালে চেচনিয়া অবস্থিত। এর রয়েছে কয়েকটি প্রাকৃতিক অঞ্চল। ককেশাস পর্বতের মূল রেঞ্জ চেচনিয়ার দক্ষিণ অঞ্চলটি নিয়ে গঠিত। এটি প্রজাতন্ত্রে দক্ষিণ সীমানা। চেচনিয়ার সর্বোচ্চ শিখর হচ্ছে মাউন্ট টেবুলোসমতা (৪৪৯৩ মি. মি./১৪৭৪১ ফিট)। উত্তরে রয়েছে সমতল অঞ্চল এবং নিম্নাঞ্চল বালুকাময় শৈল শিলা এবং পাহাড়সহ। পশ্চিমে চেচনিয়ার তেরেক এবং সুঞ্জা উপত্যকায় প্রজাতন্ত্রে কৃষিকেন্দ্রসমূহ। চেচনিয়ার প্রধান প্রধান নদী হচ্ছে তেরেক সুঞ্জা, আর্গুন এবং আসসার। নিম্নাঞ্চল এবং উপত্যকা নিয়ে উর্বর এলাকা। অথচ উত্তরের প্রান্তরগুলো স্তেফ তরুলতার উপযোগী। প্রজাতন্ত্রের এক-পঞ্চমাংশ বীচগাছ, বার্চ হর্নবীম এবং ওকগাছ দ্বারা আচ্ছাদিত; এগুলো সাধারণ পর্বতের ঢালগুলোতে অবস্থিত। চেচনিয়ার গ্রীষ্ম খুব গরম এবং শীতকাল ঠান্ডা। আবহায়ওয়া মৃদ্যু এবং পার্বত্য অঞ্চলগুলোতে আবহাওয়ার মাত্রা কিছুটা উপরে। ১৯৯৭ সনে চেননিয়ার লোকসংখ্যা ছিল ৮৬২০০০ এবং প্রশাসনিক কেন্দ্র গ্রোজনীর লোকসংখ্যা ৩৭২৭৪২ (১৯৯৫)। প্রজাতন্ত্রের লোকসংখ্যা সাম্রাজ্যবাদী রুশফৌজের ধ্বংসযজ্ঞের ফলে চেচেন নরনারী পুরুষ বিপুল সংখ্যায় শাহাদাত বরণ করেন এবং লোকসংখ্যা ভয়াবহরূপে হ্রাস পায়। প্রজাতন্ত্রের বাসিন্দাদের মধ্যে

চেচেনরা হচ্ছে বৃহত্তম এথনিক গ্রুপ। তারা মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি। রুশ এবং ইঙ্গুইসরাও ছড়ানো-ছিটানো রয়েছে।

চেচেনরা নিজেদের বলে নখচি, এরা ককেশাস অঞ্চলের বাসিন্দা। চেচেনদের ভাষা ককেশিয়ার ভাষাগুলোর অন্তর্গত এবং ইঙ্গুইসদের ভাষার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। চেচেনদের লিখিত ভাষার ভিত্তি ছিল আরবী বর্ণমালা, রাশিয়ার কমিউনিস্ট শাসনের শুরুতে ১৯২০ সনে আরবী বর্ণমালার পরিবর্তে কমিউনিস্টরা ল্যাটিন বর্ণমালা চালু করে। ১৯৩৮ সনে ল্যাটিনের স্থলে সিরিলিক বর্ণমালা প্রবর্তন করে। কিন্তু ১৯৯০-এর প্রথম দিকে আবার ওরা ল্যাটিনে ফিরে যায়। ১৮০০ শতক থেকে চেচেনরা সুন্নী মুসলমান। চেচেনদের অস্তিত্বের মূল ভিত্তি হিসেবে ইসলাম যেমন বরাবরই একটা জীবন্ত শক্তি ও প্রণোদনা তেমনি সাম্রাজ্যবাদী রুশ শক্তির বিরুদ্ধে ইসলাম সবসময়ই পেসিভ রেজিস্টেন্স হিসাবে কাজ করেছে। প্রজাতন্ত্রের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ১৯৭২ সনে গ্রোজনীতে প্রতিষ্ঠিত স্টেট বিশ্ববিদ্যালয় (চেচেন-ইঙ্গুইস) রয়েছে।

পেট্রলিয়াম উৎপাদন হচ্ছে চেচেন অর্থনীতির মূল শক্তি। গ্রোজনীতে রয়েছে তৈল সংশোধন কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠাগুলো। এগুলো গ্রোজনীর চারপাশের এলাকাগুলোতে ছড়ানো রয়েছে। প্রধান প্রধান পাইপ লাইনগুলো প্রজাতন্ত্রকে ছেদ করে বিভিন্ন দিকে অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী রুশ ফৌজের আক্রমণে চেচনিয়ার প্রধান প্রধান পাইপ লাইনগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে। এই লাইনগুলো কাস্পিয়ানের তেল ক্ষেত্রগুলোকে রুশ কৃষ্ণ সাগরের সামুদ্রিক বন্দর নভোরোস্সিস্কের সঙ্গে যুক্ত করতো। চেচনিয়ায় উল্লেখযোগ্য গ্যাসসম্পদ রয়েছে। উৎপন্ন দ্রব্যাদির মধ্যে রয়েছে রাসায়নিক দ্রব্যাদি, নির্মাণ সামগ্রী, টিনজাত দ্রব্যাদি এবং কাষ্ঠ নির্মিত দ্রব্যাদি। প্রজাতন্ত্রের নদী উপত্যকাগুলোতে কৃষিকর্ম কেন্দ্রীভূত। রেললাইন পরিবহন ব্যবস্থার প্রধান।

অষ্টম শতক থেকে চেচেনরা ছিল মাল্টি এথনিক এলান রাষ্ট্রের অংশ। ত্রয়োদশ শতকে মঙ্গলরা এদের ধ্বংস করে দেয়। এরা এক পার্বত্য জনগোষ্ঠী, বহু গোত্রে বিভক্ত, পঞ্চ এবং ষোড়শ' শতকে এরা প্রথম সমতল অঞ্চলে নেমে আসে। এখানে ওরা রুশ ও জর্জিয়ানদের সঙ্গে যুদ্ধ এবং ব্যবসা দুই-ই শুরু করে। ষোল শতকের শুরুতে সাফাভিদ পারস্য ওসমানী খেলাফত ও জারের রাশিয়ার সঙ্গে রাজনৈতিক ও সামরিক প্রতিদ্বন্দ্বীতার কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। আঠারো শতকের মাঝামাঝি চেচেন নেতা সাহিক মনসুর ককেশাসে বৈদেশিক আক্রমণকারীদের প্রতিরোধ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। রাশিয়ানরা তাকে গ্রেপ্তার করে ১৭৯১ সনে এবং বন্দী অবস্থায় কয়েক বছর পর তিনি মারা যান। তিনি চেচেন জাতির লিজেন্ডারি বীর পুরুষে পরিণত হন।

পরবর্তী দশকগুলোতে ককেশীয় পার্বত্যবাসীরা রাশিয়ানদের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রয়াস পায়। কিন্তু রুশ জারের রাজনৈতিক প্রভুত্বকে প্রতিরোধ করে। ১৮৪০ থেকে চেচনিয়া এবং দাগিস্তানে আর একটি সংগাম জন্ম নেয় ঈমাম শামিলের নেতৃত্বে। শামিলের জেহাদ সাফল্যের সঙ্গে জারের রুশ বাহিনীকে কয়েক বছর ঠেকিয়ে রাখে। শামিলের এই আন্দোলনের পতন ঘটে ১৮৫৯ সালে এবং রাশিয়া সমস্ত চেচনিয়াকে দখল করে নেয়।

১৯১৭ সনে রাশিয়ায় কমিউনিস্টরা ক্ষমতা দখরে পর গৃহযুদ্ধের সময় চেচনিয়া আবার বিদ্রোহ করে। তারা স্থানীয় কোসাখ, হোয়াইট আর্মি এবং কমিউনিস্টদের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হয়। এই অঞ্চলে কমিউনিস্ট কর্তৃত্ব পুরাদস্তুর কায়েম হবার পর চেচেনরা অন্যান্য ককেশীয় জনগোষ্ঠীর সঙ্গে মিলিত হয়ে ১৯২০ সনে দাগিস্তান প্রজাতন্ত্র গঠন করে নভেম্বর মাসে। পরে সোভিয়েত গভর্ণমেন্ট উত্তর ককেশাসকে রক্তের ভিত্তিতে ভাগ করে ১৯২২ সনে দাগিস্তান রিপাবলিক থেকে আলাদ করে চেচেন স্বায়ত্তশাসিত অবলাসকে আলাদা করে ফেলে এবং ১৯২৪ সনে খোদ প্রজাতন্ত্রটিকে বিলোপ করে দেয়। ১৯৩০ সনে সোভিয়েত কমিউনিস্ট নেতারা জোর করে চেচনিয়াকে কতগুলো যৌথ খামারে বিভক্ত করে এবং ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়াস পায়। এসব অমানবিক রুশ পলিসির কারণে চেচনিয়ার মুসলমানদের চরম দুদর্শা ঘটে। তখন তারা বাধ্য হয়ে তাদের ঈমান আকিদা ও ট্রেডিশনাল জীবন পদ্ধতির পক্ষে মরণপণ লড়াই করে। ১৯৩৪ সনে চেচেন এবং ইঙ্গুইসরা সোভিয়েত রাশিয়ার অধীনে মিলিত হয়ে চেচেন ইঙ্গুইস স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র গঠন করে। ১৯৩৬ সনে এই অবলাস একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রে উন্নীত হয়। ১৯৪৪ সনে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে সোভিয়েত লীয়ার যোশেফ স্টালিন অভিযোগ করেন চেচেন ও ইঙ্গুইস জনগোষ্ঠী নাৎসিদের দালালী করছে। তিনি নির্দয়ভাবে চেচেনদের মধ্য এশিয়ায় বহিষ্কার করেন নারী-পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধ সবাইকে। চেচেন ইঙ্গুইস প্রজাতন্ত্র বিলুপ্ত হয়। ১৯৫৭ সনের জানুয়ারী মাসে আবার এই প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। নির্বাসিত সাবেক বাসিন্দাদের তাদের দেশে ফিরিয়ে আসতে অনুমতি দেওয়া হয়।

১৯৯১ সনে চেচেন সমরনায়ক জাখার দুদায়েভ গ্রোজনীর রুশ গভর্ণমেন্টকে বহিষ্কার করেন। অক্টোবর প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশন হলে দুদায়েভ বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন। ১৯৯১ সনের নভেম্বরে সমাজতানত্রিক সোভিয়েত রুশসরকার পতনের পর পরই চেচনিয়া নিজেকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করেন। কিন্তু রুশ সরকার তার বিরোধীতা করে। ইঙ্গুইসরা চেচনিয়া থেকে আলাদা হয়ে তাদের নিজস্ব প্রজাতন্ত্র গঠন করে। দুদায়েভ গ্রোজনীতে একটি গভর্ণমেন্ট গঠন করেন। কিন্তু তিনি কোন রাষ্ট্র কর্তৃক তার স্বাধীনতার স্বীকৃতি

আদায়ে ব্যর্থ হন। কোন দেশ তার অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে বিনিয়োগ করতে এগিয়ে এলো না।

১৯৯৪ সনে প্রেসিডেন্ট বরিস ইয়েলৎসিনের অধীনে রুশ ফেডারেশন সরকার চেচনিয়ার উপর সর্বাত্মক আক্রমণ চালায় যাতে চেচনিয়া স্বাধীনতা অর্জন করতে না পারে। ১৯৯৫ সনে রাশিয়া কর্তৃক গ্রোজনী দখলের পূর্বে গ্রোজনী প্রায় সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয় রাশিয়ানদের দ্বারা। এই যুদ্ধে হাজার হাজার লোক নিহত হয়। রাশিয়ানরা বিদ্রোহী নেতাদের বিতাড়িত করে এবং গ্রোজনীতে একটি পুতুল সরকার কায়েম করে। সেখানে রুশ ফৌজ মোতায়েন করা হয়। দুদায়েভ আত্মগোপন করতে বাধ্য হন; কিন্তু তার বিদ্রোহী ফৌজ আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। মহাশূন্যে মেঘের আড়াল থেকে রকেট নিক্ষেপ করে ১৯৯৬-এর এপ্রিলে রাশিয়ানরা হত্যা করে।

১৯৯৬-এর মে মাসের শেষের দিকে প্রেসিডেন্ট ইয়েলৎসিন এবং চেচেন প্রেসিডেন্ট সেলিম খান জান্দারবিলিয়েভ একটি যুদ্ধ বিরতি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন কিন্তু উভয় পক্ষের যুদ্ধ চলতে থাকে। ১৯৯৬ সনের জুন মাসে যখন আবার শান্তি আলোচনা চলছিল ততদিনে ৪০,০০০ লোক শাহাদাত বরণ করে। এর মধ্যে বিপুল সংখ্যক ছিলেন বেসামরিক লোক। তিন লাখ লোক পালিয়ে যা। বলা হয় রুশ গভর্ণমেন্ট চেচেনদেরকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দান করবে, তবে বিচ্ছিন্ন হতে দেবে না। যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য কিছুসংখ্যক চেচেন একটি আপোষ চুক্তিতে রাজি হলেও অন্যরা বললো রাশিয়া থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া আর কিছুতে তারা সন্তুষ্ট হবে না। আগস্ট মাসে একটি বড় রকমের চেচেন আক্রমণের মাধ্যমে তারা গ্রোজনী দখল করতে সক্ষম হয়। সেই মাসেই ইয়েলৎসিনের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা আলেকজান্ডার লেবেত চেচেন নেতাদের সঙ্গে একটি শান্তি চুক্তিতে পৌঁছেন, এতে উভয়পক্ষ স্বীকার করে নেয় ২০০১ সাল পর্যন্ত চেচনিয়ার মর্যদা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত মুলতবি থাকবে। ডিসেম্বরের ভিতরে সমস্ত রুশ ফৌজকে চেচেন প্রজাতন্ত্র থেকে প্রত্যাহার করা হয়। পরবর্তী মাসে চেচনিয়ার প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনে জান্দার বিলিয়েভ চেচেন ফৌজের প্রধান সমরনায়ক আসলাম মাসখাদোভ কর্তৃক পরাজিত হন। ১৯৯৭ সনের মে মাসে মাসভাদোভ এবং ইয়েলেৎসিন একটি শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এতে পূর্ববর্তী চুক্তির শর্তগুলোকে রূপদান করা হয়। উভয়পক্ষ অঙ্গিকারাবদ্ধ হয় কখনো বল প্রয়োগ করবে না বা বলপ্রয়োগের হুমকি দেবে না। পৃথক পৃথক প্রাথমিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করা হয় রাশিয়ার অর্থনৈতিক সাহায্য সম্পর্কে। চেচনিয়ার বিধ্বস্ত অবকাঠামো শিল্প এবং গৃহায়ণ নতুন করে গড়ে তোলার জন্য। কিন্তু ১৯৯৯-তে পুনরায় রাশিয়া আক্রমণ করে সন্ত্রাসবাদের অজুহাতে। গ্রোজনী নগরী সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়। গেরিলা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে চেচেন জনগোষ্ঠী।

সমকালীন চেচেন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

শামিল বাসায়েভ



শামিল বাসায়েভ

জন্ম সন ঃ ১৯৬৫ সন।

জন্ম স্থান ঃ গ্রাম- ভেদেনো, ভেদেনো জেলা, চেচেন প্রজাতন্ত্র।

পরিবার ঃ তিন ভাই; ১৯৯৫-এর শুরুতে ভেদেনোর শুরুতে এক ভাই নিহত হন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শিরওয়ানী বাসায়েভ ছিলেন বামুট নগরীতে একজন কমান্ড্যান্ড।

বৈবাহিক অবস্থা ঃ বিবাহিত

জীবনধারা ঃ ১৯৮৭ সনে তিনি মস্কো ইনস্টিটিউট ল্যান্ড টেনিওর টেনিওর ইঞ্জিনিয়ার্স এ ভর্তি হন।

১৯৯১ সনে আগস্ট মাসে রাশিয়ায় মস্কোতে হোয়াইট হাউস প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯১ সনে রাশিয়া থেকে চেচনিয়া ফিরে আসেন এবং পিপল অব ককেশাসের কনফেডারেশন বাহিনীতে সেনাপতি নিযুক্ত হন। ১৯৯২ সনে আগস্ট মাসে তিনি আব্ খাজিয়া যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এপ্রিল মাস থেকে ১৯৯৪-এর জুলাই পর্যন্ত তিনি ছিলেন আফগানিস্তানের খোস্ত প্রদেশে প্রশিক্ষণে। ১৯৯৪-এর গ্রীষ্মকালে তিনি জাখোর দুদায়েভের পক্ষে সামরিক তৎপরতায় অংশগ্রহণ করেন। ১৯৯৫-এর ১৪ই জুন তিনি রাশিয়ার বুদেনোভস্ক নগরীতে হাসপাতাল দখল করেন, চেচনিয়ার পরিস্থিতির উপর বিশ্ব সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য।

১৯৯৬-এর এপ্রিল মাসে তিনি চেচনিয়া প্রজাতন্ত্রের সশস্ত্র বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত হন।

১৯৯৬-এর ডিসেম্বর মাসে চেচেন প্রজাতন্ত্রের আসন্ন নির্বাচনে প্রেসিডেন্স পদপ্রার্থী হওয়ার জন্য তিনি সেনাপতির পদ পরিত্যাগ করেন। ১৯৯৭-এর ২৭শে জানুয়ারী তিনি নির্বাচনে ২৩.৫ ভাগ ভোট পেয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন এবং আসলাম মাসখাদোভ প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

প্রেসিডেন্ট আসলাম মাস্‌খাদোভ



প্রেসিডেন্ট আসলাম মাস্‌খাদোভ

আসলাম মাস্‌খাদোভ (ছবিতে) ১৯৫১ সনে কাজাকিস্তানে জন্মগ্রহণ করেন। ছয় বছর বয়সে তিনি তাঁর পিতা-মাতার সঙ্গে জেবির ইয়োর্থ চলে যান। মাসখাদোভ এ স্থানকেই তাঁর নিজ জন্মস্থান বলে মনে করেন। স্থানটি চেচেন ইংগুশ স্বায়ত্বশাসিত প্রজাতন্ত্রের ন্যাদতারেচনী জেলায় অবস্থিত।

তিনি ১৯৭২ সনে তিবলিসি উচ্চতর গোলন্দাজ কলেজ থেকে ডিগ্রী লাভ করেন। সেখান থেকে তিনি লেলিনগ্রাদের কালিনিন সামরিক কলেজে যোগাদান করেন। এখানেই তিনি ১৯৮১ সনে তাঁর শিক্ষা সমাপ্ত করেন। তিনি দূরপ্রাচ্যে একজন প্লাটুন কমান্ডার হিসাবে তার সামরিক জীবন শুরু করেন। সামরিক একাডেমী থেকে গ্রাজুয়েশনের পর তিনি হাঙ্গেরীতে একজন ব্যাটারী কমান্ডার হিসেবে কাজ করেন। এরপর তিনি রেজিমেন্ট কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৯১ সনে তিনি জানুয়ারী মাসে এক ডিভিশন মিসাইল ও গোলন্দাজ বাহিনীর একজন কর্ণেল হিসাবে তিনি ভিলগিয়াসের টেলিভিশন টাওয়ার দখল করার জন্য সোভিয়েট সৈন্যরা যে প্রয়াস চালায় তাতে অংশগ্রহণ করেন যা ছিল সোভিয়েট নেতা গর্বাচেভ কর্তৃক বাল্টিক অঞ্চলের স্বাধীনতা লাভের আন্দোলন দমানোর প্রয়াসের অংশ।

মাসখাদোভ ১৯৯২ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত চেচেন সশস্ত্র বাহিনীতে কাজ করেন। ১৯৯৩-এর ডিসেম্বরে তিনি চীফ অব স্টাফ পদে উন্নীত হন।

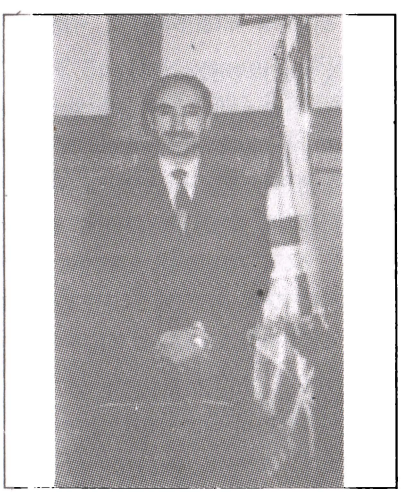
অতঃপর তিনি ১৯৯৬ সনে কোয়ালিশন চেচেন গভর্ণমেন্টের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন- ১৯৯৭-এর জানুয়ারী পর্যন্ত। ফেডারেল কর্মচারীদের সঙ্গে আপোষ-আলোচনায় মাসখাদোভ ছিলেন মুখ্য আলোচক। তিনি ১৯৯৫ সনের গ্রীষ্মকালে গ্রোজনীর আলোচনায় সক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি তখন চেচেনদের পক্ষে একটি সামরিক চুক্তিকে দস্তখত করেন।

তিনি নাজরানে ফেডারেল প্রতিনিধিদের সঙ্গে ১৯৯৬-এর জুন মাসের আপোষ-আলোচনায় অন্যতম মুখ্য আলোচক হিসেবে যোগ দেন এবং জুন ২৮ থেকে জুলাই

৪ পর্যন্ত (১৯৯৬) নভি আতাসীর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।
১৯৯৬ সনের ৩১শে আগস্ট সাবেক রুশ সিকিউরিটি কাউন্সিল সেক্রেটারী আলেকজান্ডার লেবেদ সঙ্গে আলোচনার পর তিনি খাসজুয়ুল চুক্তিতে দস্তখত করেন- এর ফলে রুশ ফৌজের সাথে বিরোধ প্রকৃতপক্ষে মিটে যায়।
এরপর ১৯৯৬ সনের ৩রা নভেম্বর রুশ ফেডারেশন ও চেচেন প্রজাতন্ত্রের সম্পর্ক নির্ধারণ করে মাখখাদোভ একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন, রুশ প্রধানমন্ত্রী ভিক্টোর চার্নোমিদিনের সঙ্গে।
মাসখাদোভ বিবাহিত। তিনি একটি পুত্র ও একটি কন্যার জনক।

জখোর দুদায়েভ (১৯৪৪–১৯৯৬)

স্বাধীনতাকামী চেচেন প্রজাতন্ত্রের প্রধান নেতা।



জখোর দুদায়েভ

চেচনিয়ার পারভোমেস্কিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। দুদায়েভের শৈশবাস্থায় তার পরিবারকে কাজাকিস্তানে জবরদস্তিমূলক পাঠানো হয়। এখানে দুদায়েভ ১৩ বছর অতিবাহিত করেন। টামভব উচ্চতর বিমান বাহিনী প্রকৌশল স্কুল থেকে দুদায়েভ গ্রাজুয়েশন নেন, ১৯৭৪-এ তিনি ইউরি গ্যাগারিন এয়ার ফোর্স একাডেমী থেকে গ্রাজুয়েশন ডিগ্রী লাভ করেন। ইস্টোনিয়ার টারটুতে স্ট্রেটেজিক বোমারু বিমানের ডিভিশন কমান্ডার হিসাবে দায়িত্ব পালনের পর ৩৬ বছর বয়সে জেনারেল পদে উন্নীত হন। দুদায়েভ ইস্টোনিয়ার ভাষা শিখেন এবং ইস্টোনিয়ার জাতীয়তাবাদী অনুভূতির প্রতি সহানুভূতি ব্যক্ত করেন এবং রুশ সরকারের আদেশকে অগ্রাহ্য করে ইস্টোনিয়ার টেলিভিশন ও পার্লামেন্টকে বন্ধ করা থেকে বিরত থাকেন। ১৯৯০ সনে দুদায়েভের ডিভিশনকে ইস্টোনিয়া থেকে ফিরিয়ে নেয়া হয় এবং তিনি ফিরে আসেন চেচেনদের রাজধানী গ্রোজনীতে। দেশে ফেরার পর জাতীয়তাবিরোধী সংগঠন পিপলস্ এক্সিকিউটিশ কমিটির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৯১-এর আগস্টে দুদায়েভ চেচেন ইংগুশ স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রের নেতাকে ক্ষমতাচ্যুত করে প্রজাতন্ত্রের সর্বময় ক্ষমতা গ্রহণ করেন। অক্টোবরে সদ্যঘোষিত

চেচেন প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে তাকে ঘোষণা করা হয় এবং পরের মাসে রাশিয়ান ফেডারেশন থেকে চেচেনিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ডিসেম্বর, ১৯৯৪-এ রাশিয়া আক্রমণ চালায় চেচেনিয়াতে রাশিয়ার আধিপত্য অক্ষুণ্ন রাখার উদ্দেশ্যে। রুশ এবং চেচেন ফৌজের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। ১৯৯৬-এর এপ্রিলে দুদায়েভ রাশিয়ান রকেটে হামলায় শাহাদাৎ বরণ করেন।

রুশলান ইমারনোভিচ্ খাস্‌বুলাটভ (১৯৪৪)

১৯৯১ থেকে ১৯৯৩ পর্যন্ত রুশ সরকারের আইন পরিষদ Supreme Soviet-এর চেয়ারম্যান ছিলেন। চেচনিয়ার রাজধানী গ্রোজনীতে খাস্‌বুলাটভ জন্মগ্রহণ করেন। লক্ষ লক্ষ চেচেন মুসলমানদের সাথে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তার পরিবারকে বাধ্যতামূলক কাজাকিস্তানে পাঠানো হয়। ঐ সময় চেচেন মুসলমানদের রুশ সরকার "Enemy Nation" আখ্যা দিয়েছিলো। ১৯৬৫ সালে মস্কো স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে খাসবুলাটভ অর্থনীতিতে উচ্চতর ডিগ্রী লাভ করেন। প্লেখানভ ইন্সটিটিউট এবং মস্কো ইন্সটিটিউট-এ National Economy'র অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। রুশ অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি থেকে দ্রুত মুক্তবাজার অর্থনীতিতে রূপায়িত করার তীব্র বিরোধিতা করেন খাসবুলাটভ। জাতীয় অর্থনীতিতে সরকারী হস্তক্ষেপের পক্ষে তিনি ছিলেন সোচ্চার। ১৯৯৩-এ ইয়েলেৎসিনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের উস্কানীর অভিযোগে খাসবুলাটভকে বন্দী করা হয়। ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪-এ তাকে মুক্তি দেয়া হয়।

খাসবুলাটভ চেচনিয়ায় ফিরে আসেন এবং স্বাধীনতাকামী নেতা জখোর দুদায়েভের বিরুদ্ধে বিরোধী আন্দোলন জোরদারে সচেষ্ট হন। ১৯৯৫ সালে চেচনিয়া নেতৃত্বের পদে প্রার্থী ঘোষণা দেয়া সত্ত্বেও তিনি কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তা প্রত্যাহার করেন।

অধ্যায় ঃ এক

ভৌগোলিক অবস্থান

ঈমাম শামিল এবং তাঁর আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনায় আসার পূর্বে এখানে কাওকাজ (ককেশাস)-এর ভৌগোলিক অবস্থান এবং এই পুস্তকে যেসব স্থানের নাম বার বার আসবে, সেগুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ উল্লেখ করা সমীচীন হবে। এতে তাঁর জীবনের ঘটনাবলী বোঝা সহজ হবে।

জেনারেল ভালমীনোফ ছিলেন ককেশাসের প্রধান সেনাপতি। তিনি ককেশাসের সামরিক গুরুত্ব সম্পর্কে লিখেন-

"কাওকাজ একটি সুদৃঢ় দুর্গের মতো- যার রয়েছে স্বাভাবিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা- তার সঙ্গে কৃত্রিম প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও সামরিক কর্মকান্ডের দ্বারা শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাসহ বিপুল সামরিক বাহিনীর দ্বারা যা আরো সুরক্ষিত। এই অবস্থায় সামরিক বিষয় সম্পর্কে যার কোন জ্ঞান নেই, কেবল এমন ব্যক্তিই দ্রুত একে পদানত করার চেষ্টা করবে এমনভাবে যাতে ধীরে ধীরে ওদের অবস্থান পরিষ্কার করা যায় এবং দুর্গটিকে দখল করার জন্য সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়।"

ভৌগোলিক অবস্থান

কাস্পিয়ান সাগর এবং কৃষ্ণসাগরের মধ্যবর্তী এলাকাটি কাওয়াজ নামে পরিচিত। এই পর্বতমালা দক্ষিণ-পশ্চিম হতে দক্ষিণ-পূর্বে বিস্তৃত। কেন্দ্রীয় পর্বতমালা-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই দুরন্ত পর্বত শীর্ষগুলো এই এলাকার বাসিন্দাদেরকে মস্তিষ্ক ও অন্তরের দুর্লভ গুণাবলীতে সমৃদ্ধিশালী করেছে। এই পর্বতশ্রেণীর বাসিন্দাদের মধ্যে এসব মহামূল্য গুণাবলী বিদ্যমান। এসব বরফঢাকা পর্বতশৃঙ্গগুলো জয় করা যেমন দুরূহ, তেমনি এখানকার সাহসী অধিবাসীদের জয় করাও দুরূহ।

একজন রুশ লেখক লিখেছেন ঃ

'হে পার্বত্য জনগোষ্ঠী-

স্বাধীনতা তোমার ঈশ্বর এবং সংগ্রাম তোমার জীবনের বিধান– যদিও তোমরা দেখাতে পার মহান বন্ধুত্ব ও ততোধিক তোমাদের প্রতিহিংসা পরায়ণতা।

তোমরা অপরাধের বদলা নাও অপরাধ দিয়ে এবং মহৎ গুণের মোকাবেলা কর মহৎ গুণ দিয়ে।

তোমাদের প্রেমের মতই তোমাদের জিঘাংসা কোন সীমা পরিসীমা মানে না।'

কোন রকম অতিশয়োক্তি না করেও বলা যায় যে, এই জনগোষ্ঠী ছিল পর্বতমালার সন্তান। তারা এমনই বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে যে, তারা এই পর্বতগুলোকে অজেয়ও প্রমাণ করেছিল। এই গোত্রগুলোর মধ্যে যেমন উচ্চ পর্বতশৃঙ্গ, সংকীর্ণ গিরিখাত এবং অনতিক্রম্য বনভূমি সঞ্চারিত করেছিল আজাদীর স্পৃহা, তেমনি এগুলো তাদের ঐক্য ও সংহতিকে করে তুলেছিল অধিকতর কঠিন।

এই দীর্ঘ পর্বতমালার মোট দৈর্ঘ্য হচ্ছে ৬৫০ মাইল। এর মধ্যে সম্পূর্ণ পার্বত্য ভূখন্ড রয়েছে ৪০০ মাইলের উপরে। কাস্পিয়ান থেকে বাকু পর্যন্ত পর্বতমালার দৈর্ঘ্য প্রায় ১৫০ মাইল। সেখানে কৃষ্ণ সাগরের উত্তরে অবস্থিত এলাকাটির দৈর্ঘ্য প্রায় ১০০ মাইল- যা কমবেশী একশ' মাইল প্রশস্ত একটি মালভূমি।

পুরো অঞ্চলটি ভৌগোলিক দিক দিয়ে তিনটি বিভাগে বিভক্ত। স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্যও এলাকাটিকে তিনভাবে ভাগ করা যায়। রয়েছে বনভূমি ঢাকা অঞ্চল, আলবুগজ্ থেকে কৃষ্ণ সাগরের উপকূল পর্যন্ত, যার গড় উচ্চতা সমুদ্র সমতলের উপর দশ হাজার ফুট। এই অঞ্চলটিতে বাস করে সার্কাশিয়ান জনগোষ্ঠী, যারা আঠার শতকের শেষার্ধ থেকে ১৮৬৪ সন পর্যন্ত রুশ হানাদারদের বিরুদ্ধে হিম্মতের সঙ্গে সংগ্রাম করে। একই সঙ্গে চেচেমিয়া ও দাগিস্তানের গেরিলাগুলো রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যায়। অনুর্বর মালভূমি অঞ্চলে বসাবাসকারী গোত্রগুলো রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিপুল সাফল্য অর্জন করে। কিন্তু পরবর্তীকালে উচ্চতর পর্বতশৃঙ্গে বসবাসকারী গোত্রগুলোর কাছ থেকে প্রবল বাধা পায়নি; এসব উচ্চ অঞ্চলে কোন গিরিপথই দশহাজার ফুটের কম নয়। এই গোত্রগুলো একটি অনিয়মিত যুদ্ধ চালিয়ে যায়। কিন্তু রাশিয়ানদের কোন হাতাহাতি যুদ্ধে বাধা দেয়নি। এই দুই যুদ্ধাঙ্গনের মধ্যবর্তী ব্যবধান দূর করা যায়নি মুজাহেদীনের সর্বাত্মক প্রয়াস সত্ত্বেও। ফলে উত্তর থেকে দক্ষিণে রুশ যানবাহন চলাচল তরঙ্গের মত প্রবাহিত হতে থাকে। জর্জিয়ার এই রাস্তাটি মুজাহিদদের জন্যে বহু সমস্যার সৃষ্টি করে। এই ভৌগোলিক সামরিক অবস্থান মনের চোখের সামনে না রেখে কারো পক্ষে এ সময়ের ইতিহাস সম্পূর্ণ বোঝা সম্ভবপর নয়।

জর্জিয়গণ

মোটামুটি দক্ষিণ দিকে অবস্থিত পর্বতমালার বাসিন্দারা হচ্ছে জর্জিয় বংশের লোক (স্ট্যালিন এবং তার কমরেড বেরিয়া উভয়ই ছিলেন জর্জিয়)। রুশ ফৌজ এসব পর্বতের প্রতিরক্ষার অজুহাতে হামলা চালায় এবং পাহাড়গুলো অতিক্রম করে। এই লোকগুলো বরাবরই ছিল রুশ ফৌজের প্রতি অনুগত। আরো দক্ষিণে পূর্বপার্শ্বে অবস্থিত ছিল মুসলিম খান শাসিত অঞ্চলগুলো এবং ইরানের অধীন রাষ্ট্রসমূহ আর

পশ্চিমে অবস্থিত ছিল তুর্কী রাজাদের স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ। রাশিয়ার মতলব ছিল সর্বপশ্চিমের গোত্রগুলোকে জয় করা। তাদের মৈত্রী ছিল তুরস্কের সঙ্গে এবং দাগিস্তান ও চেচেনিয়ার গোত্রগুলোকে পদানত করা, যাতে করে তারা ট্রান্স ককেশিয়াতে জর্জিয়দের একত্র করতে পারে। রুশদের আরেকটি মতলব ছিল হাজার হাজার তুর্কী ফৌজকে এশিয়া মাইনরে আটকে রাখা এবং এভাবে ইউরোপীয় সীমান্তে তুর্কী চাপ থেকে মুক্তি অর্জন। ককেশাসের যুদ্ধ প্রায় ৬০ (ষাট) বছর বলে। সে সময়ে রুশ বাহিনীকে ককেশীয়ার বিভিন্ন গোত্রের মোকাবেলা করতে হয়।

পূর্ব ককেশাস

আরব ইতিহাসবিদ আল-আজিজি পূর্ব ককেশাসকে 'অনেক পার্বত্য ভাষার পর্বত' বলে উল্লেখ করেন। তাঁর মতে এই অঞ্চলে ৩০০ ভাষা প্রচলিত আছে। আমরা একে অতিশয়োক্তি বলে গণ্য করলেও আমাদেরকে এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, আধুনিকতম গবেষণা মতে দাগিস্তানে চল্লিশটি ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় লোকরা কথা বলে এবং এর কোন একটিরই অন্য একটির সঙ্গে মিল নেই। পৃথিবীতে এমন আর কোন দেশ আছে কি-না সন্দেহ, যেখানে এই রকম ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষী লোক বাস করে এবং এমন ছোট্ট একটি ভূ-খন্ডে বসতি স্থাপন করেছে। উপভাষাগুলোর একটির সঙ্গে আর একটির মিল নেই- যার ফলে সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক ভাষার জন্ম হয়। এই বিস্ময়কর ব্যাপারে নানাবিধ কারণ দেখানো হয়ে থাকে। বলা হয়- মহাবীর আলেকজান্ডার তার বিভিন্ন রাজ্যের সকল অপরাধীকে এখানে পাঠিয়েছিলেন। এখানকার ভূমি এবং আবহাওয়ার অবস্থা দন্ডিত অপরাধীদের জন্য একটি নিভৃত স্থান বলে গণ্য হয়। ওরা যেহেতু পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে এসেছিল, তাই তারা ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথা বলতো। একই অবস্থা ছিল আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের বন্দীদের জন্য- যারা সারা জীবনের জন্য নির্বাসিত হয়েছিল আন্দামানে। আরো একটা ব্যাখ্যা এই যে, একাধিক বিজয়ী দল এটিকে পুনরায় জয় করার চেষ্টা করে। তাই পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের লোক এই ছোট নিরাপদ উপত্যকায় বসবাস করতে থাকে। যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাকায় তারা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতো। তাদের ভাষা ছিল পরস্পর বিচ্ছিন্ন এবং বিদেশী প্রভাবমুক্ত। একই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল ব্রাজিলে, যেখানে গভীর অরণ্যানীর কারণে বিভিন্ন ভাষা এবং জনগোষ্ঠীর বিকাশ ঘটে।

দাগিস্তান অঞ্চল

দাগিস্তান অঞ্চলকে তার খুটিনাটিসহ আলোচনা করা খুবই জরুরি। কারণ এই ভূ-অঞ্চলেই প্রায় সবক'টি যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল। উচ্চ মালভূমির উপর অবস্থিত

দাগিস্তান সুউচ্চ পর্বত দ্বারা বেষ্টিত।

মধ্য ককেশাসের মতই সবচেয়ে উঁচু শীর্ষগুলো পার্শ্ববর্তী অথবা দূরবর্তী পর্বতমালাগুলোতে অবস্থিত। এই শাভি-কিদেহ থেকে (এবং বাস্তবে আর্খোতিস মাতা থেকে) বাজাই ডিওয়াই পর্যন্ত মূল পবর্তমলা যেখানে এর উচ্চত ১৪৭২২২ ফুট, ১৭০ মাইল ব্যবধানে কোথাও যা ১১৮০০ ফুটের উঁচু নয়। অথচ পার্শ্বস্থ পর্বতমালাগুলো খুব কমই ১৩০০০ ফুটের চাইতে নীচু এবং বহু শৃঙ্গ আরোও উঁচু। বেগোস গ্রুপ যা আভর এবং আন্দেজ কোইসৌস উত্তর-পূর্ব দিকের মূল পর্বতমালা থেকে প্রবাহিত জলস্রোত দ্বারা গঠিত তার কমপেক্ষ তিনটি শৃঙ্গ ১৩০০০ ফুটের উপরে। আরো দক্ষিণ-পূর্বে রয়েছে দুই কিংবা ততোধিক শৃঙ্গ, সেগুলোর উচ্চতা ১৩০০০ ফুটের উপরে। দিউলতিদাগ পর্বতমালার উপরে এই শৃঙ্গগুলো অবস্থিত। এর দূরবর্তী পর্বতমালার দিউলতিদাগ পর্বতশৃঙ্গটি ১২৪৩৫ ফুট উঁচু। একই অভিমুখে আরো দূরে রয়েছে শ্যালো বোজ দাগ, ১৩৬৭৯ ফুট উঁচু এবং শাখদাগ ১৩৯৫২ ফুট। শেষোক্তটি বাকু প্রদেশে অবস্থিত।

এখানে দুইটি প্রধান নদীখাত রয়েছে– যার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে শৌলিক, যা কাজীকুমক, দ্বারা আভর এবং আন্দি এই চারটি কৌসৌস এর মিলনে গঠিত। এর মধ্যে কেবল শেষোক্তটির উৎপত্তিস্থল প্রদেশের বাইরে তেশেতিয়াতে। এ সবই প্রবাহিত হচ্ছে উত্তর এবং দুক্ষিণ-পূর্ব অভিমুখে দ্বিতীয় পর্বতমালার তরঙ্গের দিকে। এদের প্রত্যেকটি অস্বাভাবিক গভীর নালা সৃষ্টি করেছে। এই সঙ্কীর্ণ খাতগুলো পবর্তমালার বিশৃঙ্খলার পরেই সৃষ্টি করেছে দাগিস্তানের সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। অন্য প্রণালীটি হচ্ছে সামুর যার উৎপত্তি কারা এবং আভর কৌসুসের উৎস থেকে শুরু হয়েছে এবং যা দক্ষিন দিকে বেঁকে গিয়ে মোটামুটি পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়েছে। এর মধ্যে নীচু প্রবাহটি পূর্বের বর্ণনামতো দক্ষিণ-পূর্ব শেষ সীমায় প্রদেশটির সীমান্তরেখা হিসেবে কাজ করছে।

যুদ্ধের সময় ককেশাসের মোটমাট লোকসংখ্যা ছিল ৪০ লক্ষ। দাগিস্তানের লোকসংখ্যা ছিল ৫ লক্ষ, যার মধ্যে আভরদের সংখ্যা ছিল ১,২৫,০০০ প্রায়। ঐতিহাসিক দিক দিয়ে বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে ওরাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি। তারা বাস করতো দেশের একটি বিস্তৃত অঞ্চলে, যার দৈর্ঘ্য ছিল ১০০ মাইলের উপরে, উত্তরে চীর-যোর্থ থেকে দক্ষিণে জাকাতালি সীমান্ত পর্যন্ত। এতে দাগিস্তান সম্পূর্ণ দু'টি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। খোন্‌জাক এর মধ্যরেখায় এর প্রস্থ হচ্ছে ৪৫ মাইল। তাদের ভাষা দু'টি প্রধান উপ-ভাষায় বিভক্ত। খোন্‌জাক এবং আন্তৌখ- দু'টিই একটি অপরটি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

তিনজন ঈমাম- কাজী মুল্লা, হামজাদ বেগ এবং শামিল এই উপভাষায় কথা বলতেন এবং তাদের সকল প্রধান প্রধান লেফটেন্যান্টগণও। এ কারণে উপভাষা

মুরিদবাদের সরকারী ভাষা[১] হয়ে দাঁড়ায় এবং দাগিস্তানের সাধারণ ভাষায় পরিণত হয়। যুদ্ধপ্রিয় বিপুলসংখ্যক আভরেরা প্রভাবশালী হয়ে ওঠে।

দাগিস্তানের লোকেরা তাদের গ্রাম এবং শহরের স্থান নির্বাচন করতে গিয়ে প্রথমেই বিবেচনা করতো প্রতিরক্ষার কথা। তাই তারা নির্বাচন করতো সুউচ্চ স্থান। অথবা প্রায় সব সময়ই তারা অবস্থান নিতো একটি শৈলশিরাকে সামনে রেখে, বিচ্ছিন্ন অথবা অনধিগম্য উচ্চচূড়ার দ্বারা সুরক্ষিত হয়ে। আরাকানি গ্রামটি মোটামুটিভাবে একটি বিশেষ নমুনা। ঘরবাড়ী ছিল পাথরের, দোতলা উঁচু, মজবুতভাবে নির্মিত এবং খুব সুবিধাজনক। ঘরের অভ্যন্তরে ভাগ কাদা দিয়ে সিঞ্চিত ছিল। এ কাদাকে যত্নের সাথে পলিশ করা হতো এবং প্রায়ই চূনকাম করা হতো। এগুলো নির্মিত হতো এমফিথিয়েটার ধরনে, যাতে করে পরস্পরকে রক্ষা করতে পারে। রাস্তাগুলো হতো উঁচু-নীচু, সঙ্কীর্ণ- যাতে কোন রকমভাবে দুটি ঘোড়া পাশাপাশি চলতে পারে। মাঝে মাঝে রয়েছে এমন এক একটি ঘর যা স্থানে স্থানে বাধা হিসাবে কাজ করতো, যেখানে গৃহটির চারপাশে রয়েছে একটি কাঠের প্রতিবন্ধক- যার ফলে সেই রাস্তার মধ্যদিয়ে চলাচল অসম্ভব হয়ে পড়ে- যতক্ষণ না সেখানে মোতায়েন প্রহরীরা সেখান থেকে বিতাড়িত বা নিহত হয়েছে। আজকের দিনে আধাঘন্টার মধ্যেই এসব লোককেও অর্ধডজন পৃথক পৃথক অবস্থান থেকে আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্র ছাড়াই চূর্ণ-বিচূর্ণ করা সম্ভব। কিন্তু তখনকার দিনে নিটকবর্তী উচ্চতর অবস্থান থেকে এগুলো ছিল অনেক দূরে না হয় তাদের থেকে সম্পূর্ণ সুরক্ষিত। তাদের অগ্নিবর্ষণ থেকে ছুটে পালানো দরকার হতো না, যা থেকে সব সময় নিম্নে অবস্থানকারী শত্রুর উপর অগ্নিবর্ষণ করা যেত। আসলে কেবলমাত্র আকস্মিক আক্রমণ করেই তাদেরকে বন্দী করা যেতো। কিন্তু তা ছিল এক বিপদজ্জনক কাজ। কেননা আলাদা আলাদাভাবে প্রত্যেকটি গৃহই ছিল মরিয়া একদল পুরুষের গ্যারিসন এবং প্রায়ই ততোধিক মরিয়া রমণীগণের দুর্গ।

যেহেতু লাকড়ি ছিল কম, ঘর তৈরির ব্যাপারে তাদের পরবর্তী বিবেচনা ছিল উষ্ণতা। এ জন্য তাদের ঘরবাড়ী সবসময় তৈরি হতো দক্ষিণমুখী করে– যাতে করে, শীতকালে রোদ থেকে তারা সর্বোচ্চ পরিমাণ ফায়দা পেতে পারে। অন্যদিকে গৃহের পশ্চাৎবর্তী শিলা এবং পর্বতশৃঙ্গ দ্বারা তারা রক্ষিত হতো উত্তরের ঝড়-তুফান থেকে। এছাড়া আর সব বিবেচনাই ছিল গৌণ, যেমন- চাষের উপযোগী জমি কিংবা কতদূর থেকে খাবার পানি সংগ্রহ করতে হবে- তা তাদের বিবেচনায় ছিল গৌণ। দাগিস্তান পর্বতের বিভিন্ন গোত্র একে অন্য থেকে পৃথক, বহুদিক দিয়ে। কিন্তু তাদের মধ্যে সাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তারা বর্ণিত হয় বুদ্ধিমান হিসেবে, ধৈর্যশীল মানুষ কি ভাবছে এক পলকে তা পাঠ করতে সক্ষম এবং

১. সেনিগাল থেকে তিমুর পর্যন্ত এই অঞ্চলের ভিন্ন গোত্রের মধ্যে একটি ঐক্যবিধায়ক শক্তি হিসাবে এবং সমগ্র মুসলিম জাহানের সাধারণ ভাষা (লিঙ্গুয়া ফ্রাংকা) ছিলো আরবি ভাষা।

তাদেরকে একটিমাত্র শব্দে মূল্যায়নে পারঙ্গম। তারা কঠোরভাবে সম্মানের পাত্র এবং ইসলামের আদর্শের সত্যিকার অনুসারী। খাদ্য ও পানীয়ের দিক দিয়ে চূড়ান্ত কৃচ্ছ্রতার জন্য তারা প্রসিদ্ধ। তারা সামান্যই ঘুমায়। তারা যে অতিশয় দুঃসাহসী ছিল, এ বিষয়ে কোন কিছু বলার প্রয়োজন করে না। তারা রুশদের গোলামী করার চাইতে শাহাদাতকে অনেক বেশি সহজ কর্ম মনে করতো।

এ রকমই ছিল দাগিস্তান পাহাড়ের বাসিন্দারা। তারা জারের ফৌজের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, প্রায় সবক'টি যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল পর্বতসঙ্কুল দেশের সেসব অঞ্চলে- যেখানে বৃক্ষলতা সাফ করে ফেলা হয়েছিল। এখানে সাধারণ ভূ-তল ছিল কয়েক হাজার ফুট উঁচু, যার শৃঙ্গ বা শিখর উঠে গেছে তুষার রেখার বহু উপরে এবং এই উঁচু-নীচু মালভূমির মধ্যদিয়ে নদী-নালা বয়ে চলেছে তাদের সঙ্কীর্ণ খাত বেয়ে- যার গভীরতা সাধারণত ৩,০০০ ফুট কিংবা তারচেয়ে বেশি। এভাবে গঠিত খাতগুলোতে গ্রামগুলো (আউল) প্রায়ই থাকে লুকানো এবং এখানে লতাপাতা জন্মায় প্রচুর। ফলের গাছ, ভুট্টা ও অন্যান্য শস্যদানা প্রচুর জন্মায়। প্রকৃতির দিক দিয়ে এতো অনুর্বর স্থানটিকে সেচের খালের জন্যে এবং স্তরে স্তরে আবাদের ফলে স্থানে স্থানে উদ্যানে পরিণত হয়েছে। তা দেখে অধিকতর অনুগ্রহপ্রাপ্ত এলাকা থেকে আগত দর্শকদের বিস্ময় উৎপাদন না হয়ে পারে না। দাগিস্তানের শিলাগঠিত পার্বত্য অঞ্চলগুলোর মধ্যে খন্ড খন্ড আবাদী জমি রয়েছে। সেখানে মৃত্তিকার প্রত্যেকটি কণা আনা হয়েছে বহন করে। এর কতগুলো এতই ছোট যে আভর এবং আন্দিয়ানদের কাহিনী মতে- তাদের যে মাঠ ময়দান তাদের নিদ্রাকালে হারিয়ে গিয়েছিল তাই আবার পাওয়া যায় তার বোরকার নীচে (শোলার পোষাকের নীচে)। এই কাহিনী মোটেই আতিশয্য মনে হবে না।

রাশিয়ানরা পূর্বদিকে সৌলক, পশ্চিম দিকে মোটামুটিভাবে উজান-সৌন্দাজা এবং উত্তর দিকে ভাটি সৌন্দাজা ও তেরেক দ্বারা বেষ্টিত অঞ্চলটির নাম দিয়েছে চেচনিয়া। দক্ষিণের সীমান্ত স্পর্শ করেছে দাগিস্তানের আভর ও আন্দিয়ানদের অধ্যুষিত এবং তাওশীন ও লেভ্সোবদের পাহাড়ী অঞ্চলগুলো। গোটা দেশটিই ছিল এবং এর অধিকাংশ স্থান এখনো রয়েছে গহীন বনাঞ্চল আচ্ছাদিত- যাকে ভেদ করে গেছে গভীর এবং দ্রুত ধাবমান স্রোতস্বিনীসমূহ। সেগুলো উৎপন্ন হয়েছে দক্ষিণদিকে ক্রমে উচ্চ হতে উচ্চতর পাহাড়গুলোতে। এই স্রোতগুলোর তীরে বাস করতো চেচেনরা আলাদা আলাদা খামারে অথবা আউলে (গ্রামে)। সেগুলোতে কখনো কখনো থাকতো শত শত ঘরবাড়ী। এগুলো ছিল একতলা বাড়ী, চ্যাপ্টা সমতল ছাদ, রোদে শুকানো মাটি দিয়ে তৈরি- যাকে মজবুত করা হতো পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন কাষ্ঠ দ্বারা। তাদের প্রায় সকলেরই ছিল আরামদায়ক জিনিসপত্র, যেমন- গালিচা, মাদুর, বালিশ এবং লেপ-তোষক। প্রত্যেক বাড়ীরই ছিল তার নিজস্ব

বাগিচা বা ফলের উদ্যান এবং গ্রামের চারপাশে বনানীযুক্ত অঞ্চলে ছিল চাষের জমি প্রসারিত। সেখানে বোনা হতো ভুট্টা, যব, বার্লি, রাই অথবা বজরা, বোনা হতো অবস্থানের দিক দিয়ে সুবিধাজনক স্থানে। কিন্তু গ্রামগুলো যেহেতু ছিল অরক্ষিত, সব সময় লক্ষ্য রাখা হতো এদিকটা– যাতে জঙ্গলের সাথে লাগোয়া থাকে, যে দিক দিয়ে বিপদের প্রথম আলামত পাবার সাথে সাথে রমণী ও শিশুরা বহনযোগ্য সমস্ত সম্পদ নিয়ে পালিয়ে যেতে পারে। জঙ্গলে ছিল দেদার বিশাল বিশাল বীচ গাছ, যেখানে ছিল অগ্রসরমান রাশিয়ানদের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য নিশ্চিত আশ্রয় এবং আত্মরক্ষার সুযোগ। চেচেনদের যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য তাদেরকে কোমুখ প্রান্তর ও দাগিস্তানের মালভূমির। প্রতিবেশীদের চাইতে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করেছে এসবই তার জন্য দায়ী এবং যেহেতু তাদের দেশের বিশেষ প্রাকৃতিক আদল এভাবেই গঠিত ছিল যে, তাদের পদানত করার জন্য যুদ্ধের প্রকৃতি এবং স্থায়ীত্ব নির্ভর করতো তারই উপর... পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে এর বাস্তবতার প্রমাণ যথেষ্ঠ মিলবে। যতদিন অরণ্যানী বিদ্যমান ছিল- ততদিন চেচেনরা ছিল অজেয়। তাদের উপর রাশিয়ানদের কোন স্থায়ী ছাপ পড়েনি– কেবল সেই সময় ছাড়া যখন বীচ বৃক্ষগুলো কেটে ফেলা হয়। সত্যিকারভাবে বলতে গেলে তারা তরবারির দ্বারা পরাজিত হয়নি। হেরেছে গাছকাটা কুঠারের জোরে। ঈমাম শামিল জঙ্গলের গুরুত্ব সম্পূর্ণ বুঝতে পেরেছিনে এবং জঙ্গল সংরক্ষণের জন্য জারি করেছিলেন কঠোর নির্দেশ। গাছপালার নির্বিচার ধ্বংসের জন্য তিনি শুধু কঠোর শাস্তি আরোপ করেননি; এমন কি কখনো তার অনুমতি ছাড়া কেউ প্রয়োজনেও যদি গাছ কাটতো তার জন্য দন্ডের বিধান করেছিলেন। এভাবে প্রতিটি গাছ কেটে ভূপাতিত করার জন্য জরিমানা ছিল একটি গাভী বা ষাড়। এমন কি অন্যদেরকে সতর্ক করার জন্য নিশ্চিত অপরাধীকে কখনো ঝুলানো হতো ফাঁসিতে। কারণ জঙ্গল ধ্বংস করার মানেই হচ্ছে দাগিস্তানের আত্মরক্ষার সামর্থকে ধ্বংস করা। প্রত্যেক পুরুষই ছিল একজন জন্মগত ঘোড়সওয়ার, একজন মরিয়া তরবারী যোদ্ধা এবং অব্যর্থ তিরন্দাজ ও গোলন্দাজ। তার অস্ত্রগুলো (বন্দুক অথবা রাইফেল, তরবারী এবং বর্শা) ছিল তার সবচেয়ে বাঞ্ছিত সম্পদ- যা পিতা থেকে পুত্র, পুরুষের পর পুরুষ অর্জন করে উত্তরাধিকার সূত্রে এবং তার এসব অস্ত্রের পরে স্থান ছিল তার ঘোড়া, তার মূল্যবান সম্পদের।

চেচেনরা ছিল মুসলমান, যদিও ইসলাম গ্রহণের পওে জাহেলিয়াতের কিছু চিহ্ন তাদের মধ্যে কখনো কখনো বিদ্যমান ছিল। মসজিদ ছিল প্রধান প্রধান গ্রামগুলোতে- যেখানে মুল্লাগণ পবিত্র কোরআন শিক্ষা দিতেন। দাগিস্তান এবং উত্তর ককেশাসের সর্বত্র আরবী ছিল একটি পবিত্র ভাষা এবং একটি লিখিত লিপি। ঈমাম শামিলের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত সমস্ত দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার

নিষ্পত্তি হতো আদত বা প্রচলিত রীতি অনুসারে, শরিয়ত মোতাবেক নয়।

শারীরিক দিক দিয়ে চেচেনরা ছিল দীর্ঘদেহী। তাদের শরীর ছিল সুগঠিত এবং বাহুল্যবর্জিত। তারা প্রায়শঃই সুদর্শন। তারা ছিল সদা জাগ্রহ মনের অধিকারী, সাহসী এবং প্রজ্ঞাবান। সকল পার্বত্য গোত্রগুলোর মতোই মেহমানদারীতে তারা বরাবরই ছিল আন্তরিক এবং এখনো আছে। সবচেয়ে পবিত্র কর্তব্যাদি- যা ইসলামী ঐতিহ্যের পূর্ণ প্রতিফলন- জারের ফৌজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা একজন বয়স্ক লোকের জন্য একমাত্র উপযুক্ত কাজ বলে গণ্য হতো এবং বালিকাদের যারা রুশদের বিরুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন করেছে- তারা তেমন একজনকে বিয়ে করা জীবনের লক্ষ্য মনে করতো।

গৃহস্থালী ও কৃষিকাজ অর্পিত ছিল নারী কিংবা দাসদের উপর। প্রধানত যুদ্ধ বন্দীদের নিয়ে গঠিত ছিল এসব দাস সম্প্রদায়।

অধ্যায় ঃ দুই

জিহাদ আন্দোলন

ঈমাম শামিল জিহাদ আন্দোলনের প্রবর্তক ছিলেন না। আসলে তিনি মুরিদ তরীকা নামক একটি আন্দোলনের সাথে জড়িত। তিনি ছিলেন তরীকতের নক্সবন্দিয়া তরিকার সদস্য।[১] এই তরীকায় কেবল রুহানী ব্যাপারে মানুষের শিক্ষাদান জনগণকে স্বাধীনতায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য যথেষ্ট প্রেরণা যুগিয়েছে (কিওরীন জেলার একটি গ্রাম)। জারাগীর মুল্লা মোহাম্মদকে মুরীদিজমের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। এই আন্দোলন তাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে দাগিস্তান এবং চেচনিয়াকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল। অবশ্য তিনি প্রথম ঈমাম ছিলেন না। প্রথম ঈমামের এই অভিধাটির যথার্থ অধিকারী ছিলেন ঘিমড়ির মুল্লা মোহাম্মদ, যিনি কাজী মুল্লা নামে অধিকতর পরিচিত- যার স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন পরবর্তীকালে উপর্যুপরি হামজাদ বেগ এবং ঈমাম শামিল।

১৭৯৩ সনের দিকে ঘিমড়িতে জন্মগ্রহণ করেন কাজী মুল্লা। তিনি কারসনায় আরবী শিখেন এবং সাগীদ এফেন্দীর তত্ত্বাবধানে আরাকানীতে তার শিক্ষা সম্পন্ন হয়। তাঁর মধ্যে রজত কণ্ঠস্বর এবং সোনালী নীরবতার সম্মিলন ঘটেছিল। তার সম্পর্কে ঈমাম শামিল বলেন, তিনি ছিলেন পাথরের মতো নীরব। অন্যেরা তার সম্পর্কে বলতো- এই ব্যক্তির হৃদয় থেকে ঠোট পর্যন্ত গাম দিয়ে বন্দী করা ছিল এবং নিঃশ্বাসেই তিনি তাদের আত্মায় একটি ঝড় তুলতে পারতেন। তিনি বাগ্মিতায় ছিলেন অতুলনীয়। তাঁর জ্ঞান ও মেধার কারণে লোকজনের উপর ছিল বিপুল প্রভাব। তিনি ছিলেন বীর পুরুষ এবং জিহাদের উদ্দেশ্যে একনিষ্ঠভাবে নিবেদিত; এই দু'টি বালক ঘিমড়িকে যশস্বী করে তোলার জন্য ছিলেন আল্লাহ কর্তৃক নির্বাচিত। শৈশবে তারা নিকট প্রতিবেশী হিসেবে বাস করতেন। ঈমাম শামিল তার জীবনের খুব প্রথম দিকেই তার অসাধারণ দৈহিক শক্তি এবং মনোবলের জন্য সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি সর্ব উপায়ে তার এই শক্তিকে বিকশিত করেন। তিনি তরবারী চালনা, দৌড়-ঝাঁপ, বল্লম নিক্ষেপ এবং নানাবিধ শারীরিক কসরত অভ্যাস করেন। কুড়ি বছর বয়সে উপনীত হবার পর এসব ক্ষেত্রে তার আর কোন সমকক্ষ ছিল না। তার সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে- তিনি ২৭ ফুট প্রশস্ত একটি গর্ত

১. এই তরিকার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন খাজা মোহাম্মদ বাহাউদ্দীন বুখারী (১৩১৭-১৩৮৯)। নকশবন্দী মানে শিল্পী। খাজা নকশবন্দী তাসাউফকে তার সত্যিকার রঙ্গে পরিবেশন করেছেন এই তরিকার মাধ্যমে মধ্য এশিয়া, আফগানিস্তান, তুরস্ক, ইরান, পাকিস্তান ও ভারতে। তাসাউফের সবকটি মাজহাবই জোর দিয়ে থাকে মহানবীর জীবনী অনুসরণের। অবশ্য নকশবন্দী তরিকায় এই বিষয়টির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

এক লাফে পার হতে পারতেন, মাঝারী ধরনের দু'জন লোকের মাথার উপর দু'জল লোক কর্তৃক ধরে রাখা রজ্জুর উপর অনায়াসেই তিনি হাঁটতে পারতেন। তিনি সব ঋতুতে খালি পায়ে হাঁটতেন এবং তার বুক থাকতো অনাচ্ছাদিত। সাহসে ও শক্তিতে তিনি পার্বত্য দাগিস্তানের শক্তিশালী এবং সাহসী বাসিন্দাদের থেকেও ছিলেন অনেক অগ্রগামী। তিনি ছিলেন সদা জাগ্রত, উদ্যমী এবং জ্ঞান অন্বেষণে আগ্রহী ও গর্বিত। তবে তিনি ছিলেন কিছুটা বিষণ্ন এবং অত্যন্ত তীক্ষ্ণ অনুভূতিপ্রবণ।

ঈমাম শামিলের সহচর কাজী মুল্লা ছিলেন তার প্রথম শিক্ষক। ঈমাম শামিল পরবর্তীকালে বলতেন, তিনি তার কাছ থেকেই সবচেয়ে বেশী জ্ঞান অর্জন করেন। দু'জনেই দাগিস্তানের বিখ্যাত কয়েকজন পন্ডিতের কাছে শিক্ষা লাভ করেন। শেষ পর্যন্ত তারা যারাগীর সঙ্গে মোলাকাত করেন। তিনি তাদের দু'জনকে মুরীদ প্রথার নীতিমালায় দীক্ষিত করেন। সেখানে প্রথমেই তারা মদ্যপানের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন। যখন কাজী মুল্লা শিক্ষাদান করতে শুরু করেন তিনি ঈমাম শামিলকে বলেন- তাকে একটা লোহার দন্ড দিয়ে প্রকাশ্যে চল্লিশটি আঘাত করতে, কেননা তিনি এই অপরাধের ভয়াবহতা উপলব্ধি করার আগে মদ্য স্পর্শ করেছিলেন। শামিলও একই ধরনের শাস্তি গ্রহণ করেন। নেশার বিরুদ্ধে এই অবস্থান যার শুরু এমনি বিচিত্র রূপে তাঁর প্রভাব হয়েছিল বিপুল এবং স্থায়ী সাফল্য। ঘিমড়ির অধিবাসীরা আল্লাহর কাছে তাদেরকে মাফ করে দেবার জন্য প্রার্থনা করেন। অনেকে কাজী মুল্লার আলখাল্লা চুম্বন করেন এবং তাদের অতীত পাপের জন্য নিজেরাই নিজেদের আঘাত করেন।

রুশ বেয়োনেট

ইতিমধ্যে যখন রুশ বেয়োনেটের চক্র সবদিকেই ছোট হয়ে এলো, তখন মুল্লা মোহাম্মদের প্রভাব সবদিকেই বেড়ে চলে। দু'টি শক্তি বিপরীত থেকে একই গতিতে অগ্রসর হচ্ছিল এবং ঠিক সে মুহূর্তে মনে হচ্ছিল স্বাধীনতার সর্বশেষ স্ফূলিঙ্গটি পদতলে দলিত হতে যাচ্ছে– মধ্য দাগিস্তানে জারের সৈন্যদের দ্বারা; তখনই দেশটির সর্বত্র দপ দপ করে আগুন জ্বলে উঠলো সুদূর সীমান্ত পর্যন্ত।

দাগিস্তানে শুরুর দিকটা মুরীদ প্রথার যে সব ঘটনাবলীর দ্বারা চিহ্নিত, সেগুলোর সঠিক তারিখ নিরূপণ অস্পষ্টতায় আচ্ছন্ন। তবু বোঝা যায়, ১৮২২-২৩ সনে হাজী ইসমাইল কর্তৃক মুল্লা মোহাম্মদ মুর্শীদ নিযুক্ত হন। তখনই থেকেই তিনি যারাঘীর মসজিদে শরীয়ত সম্পর্কে প্রচার শুরু করেন। কাজী মুল্লা ঘিমড়িতে ১৮২৭ সনে প্রকাশ্যে প্রচার শুরু করেন। তিনি জামাল উদ্দিনের কাছে তরিকত অধ্যয়ন করেন। জামাল উদ্দিনও মুল্লা মোহাম্মদের কাছে তরিকতে শিক্ষা লাভ করেন।

যদিও তিনি তার কন্যা জায়দাততেক ঈমাম শামিলের কাছে বিয়ে দেন এবং তখন

থেকে তার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু এবং বিজ্ঞতম পরামর্শদাতা হয়ে উঠেন তবু তিনি জামাল উদ্দিনের সাথে জেহাদের প্রকৃত সময় এসেছে বলে একমত ছিলেন না। জামাল উদ্দিন কাজী মুল্লাকে জেহাদে অংশগ্রহণ করতে বারণ করেন। তখন কাজী মুল্লা আবার যারাঘিল যান এবং মুল্লা মোহাম্মদকে নিম্নভাষায় সম্বোধন করে বলেন, 'মহান আল্লাহতায়ালা তার কিতাবে কাফের এবং নাস্তিকদের বিরুদ্ধে জেহাদ করার জন্য আদেশ করেছেন। কিন্তু জামাল উদ্দিন আমাদেরকে এর অনুমতি দিচ্ছিল না। কার আদেশ আমি মানবো?" "আমাদেরকে অবশ্যই আল্লাহর হুকুম মেনে চলতে হবে- এসব মানুষের আদেশ নয়"- জবাব দিলেন মুল্লা মোহাম্মদ। তখন থেকেই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়ে যায়। তার নিজ এলাকায় ফিরে এসে তিনি প্রচার শুরু করেন শরীয়ত পুনঃপ্রতিষ্ঠার তাগিদ দিয়ে এবং আদত (প্রচলিত রীতিনীতি, প্যাগানদের যে সব প্রথা-পদ্ধতি প্রায় দেশের আইনে পরিণত হয়েছে) পরিত্যাগ করতে। একই সঙ্গে তিনি জোর দিতে থাকেন সকল প্রকৃত মুমিনের সমান রাজনৈতিক সাম্যের উপর- যারা তার মতে, আল্লাহর অনুগৃহীত জন এবং দেশের মানুষের বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিদের আনুগত্য ছাড়া অন্য কারো প্রতি আনুগত্যশীল হতে পারে না। তিনি এও বলেন যে, রুশদের কাছে আত্মসমর্পণ বাধ্যতামূলক নয়; প্রশংসিতও নয়- যদিও যখন প্রতিরোধ অসম্ভব প্রতীয়মান হয়, তখন একটা অস্থায়ী পন্থা হিসেবে তা অনুমোদিত। কাজী মুল্লা কেবল একজন বাগ্মীই ছিলেন না, তিনি ছিলেন প্রকৃত একজন পন্ডিত ব্যক্তি। কারণ তার ছিল চার হাজারেরও অধিক হাদিস মুখস্ত। তিনি তার বক্তৃতায় ঐসব হাদিস অবাধে উদ্ধৃত করতেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি মানুষের নিকট এত জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন যে, তারকুর সামখল, যিনি ছিলেন রুশ ফৌজের একজন মেজর জেনারেল এবং জারের অনুগত ব্যক্তি, কাজী মুল্লাকে তার রাজধানীতে দাওয়াত করেন এবং কাজীনীশচী মসজিদে তাকে প্রচারের অনুমতি দেন এবং আরপেলীতে তাকে একজন বিচারক হিসেবে মনোনীত করেন। কাজী কাওমুখের আছলান খান, যিনি ছিলেন রাশিয়ার প্রতি অনুগত তিনিও কাজী মুল্লাকে একইভাবে উষ্ণতার সাথে গ্রহণ করেন। দাগিস্তানের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত তার সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। নিজের দেশবাসীর মধ্যে যথেষ্ট শক্তি সংগ্রহের পর ১৮১৯-এর শেষের দিকে তিনি ঘিমড়িতে তার মুরীদদের প্রকাশ্যে আহ্বান করলেন জেহাদের জন্য প্রস্তুত হতে।

সামাজিক অবস্থাসমূহ

স্বাধীনতা যোদ্ধাদের সম্মুখে সবচেয় বড় অসুবিধা ছিল তাদের নিজেদের দেশের দুর্বলতা- যার মূলে ছিল প্রধানত আভ্যন্তরীণ বিরোধ ও মতানৈক্য; রুশ শক্তি সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক ছিল না। দাগিস্তান বিভক্ত ছিল বহু খান নিয়ন্ত্রিত এলাকায় এবং স্বাধীন সম্প্রদায়ে, যাদের অনেকেই ছিল পরস্পর বিরোধী। কেবল বিভিন্ন

জেলার মধ্যেই গোত্রে গোত্রে বিরোধ স্থায়ী ছিল না, বরং গ্রামে গ্রামে এবং ঘরে ঘরে স্মরণাতীতকাল থেকে চলছিল সে বিরোধ। ১৮২০ সনে সাইয়িদ আহমদ শহীদের আগমন পর্যন্ত ভারতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সামাজিক অবস্থা যা ছিল, দাগিস্তানের অবস্থাও হুবহু তা-ই ছিল। আদত বা প্রচলিত প্রথার দ্বারা পারিবারিক ও গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্ব ও প্রতিশোধ গ্রহণের একটি বিশদ পদ্ধতি কেবল অনুমোদিতই ছিল না, বরং আদত তার উপর জোর দিতো। দাগিস্তানের বিদ্যমান আদিম স্তরের রীতিনীতির চূড়ান্ত নমুনা হিসেবে এখানে দু'তিনটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে।

ঈমাম শামিল এই ধরনের রক্তারক্তি, হানাহানির একটি চমৎকার কাহিনী বর্ণনা করেছেন। তিনশ' বছর আগে কাদার পল্লীর একটি লোক তার প্রতিবেশীর একটি মুরগী চুরি করেছিল। তার বদলা নেওয়া হয় একটা ভেড়া চুরি করে। প্রথমটির প্রতিশোধ নেয়া হয় দু'টি ভেড়া চুরি করে- যার পরিণামে দ্বিতীয় জন বদলা নেয় একটি গাভী হরণ করে। আদি চোরটি তখন তার প্রতিবেশীর ঘোড়া চুরি করে। এতে প্রতিবেশী এতই উত্তেজিত হয় যে, তার ক্ষতিপূরণের জন্য যথেষ্ট মূল্যবান কোন সম্পত্তি না থাকায় তাকে হত্যা করে পালিয়ে যায়। রক্তের বদলে রক্ত দাবি করা হলো, কিন্তু হত্যাকারীকে পাওয়া গেল না। তাই অপরাধী লোকটিকে না পেয়ে নিহত লোকটির আত্মীয়-স্বজন আদত প্রথার কঠোর অনুসরণে তার ঘনিষ্ঠতম আত্মীয়-স্বজনের একজনকে হত্যা করে। এখন এই গোত্রগত খুনাখুনির পেল পূর্ণ রূপ।

এই দ্বন্দ্ব চলতে থাকে তিনশ' বছর ধরে। সে সময়ের মধ্যে বহু সংখ্যক, কেউ কেউ বলে শত শত নিরপরাধ লোককে হত্যা করা হয়- এই ট্রাইবেল প্রথার সম্মান রক্ষা করার জন্য– এবং এ সবই ছিল একটি মুরগী চুরির প্রতিশোধ হিসেবে। ১৮২৬ সনে এক গ্রামের একটি কক্ষে এই লড়াই শুরু হয়ে যায় এবং কক্ষের চৌদ্দজন লোকের মধ্যে একজন বাদে সকলেই নিহত হয়। এ লড়াইয়ের কারণ ছিল রক্তপণ- যাতে ইতিমধ্যেই ঘটেছে প্রাণহানি। আদতগুলো গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, গোষ্ঠী থেকে গোষ্ঠীতে খুটিনাটি ব্যাপারে অনেক পৃথক হলেও সেসবের মূলনীতি ছিল একই। কোরআনুল করীমে রক্তপণের ব্যাপারটি বর্নিত হয়েছে এভাবে- "এবং যে কেউ অন্যায়ভাবে নিহত হলে তার উত্তরাধিকারীদের আমি ন্যায় বিচার দাবী করার ক্ষমতা দিয়েছি। কিন্তু সে যেন অতিশয় নিষ্ঠুরভাবে খুনীকে হত্যা করতে গিয়ে অথবা যে ব্যক্তি প্রকৃত হত্যাকারী তার কোন বন্ধুকে হত্যা করে সীমা লঙ্ঘন না করে।" এবং "হে প্রকৃত মুমীন বান্দাগণ, নিহত ব্যক্তির জন্য... বিধান দেওয়া হয়েছে, স্বাধীন বক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি এবং গোলামের বদলে গোলাম এবং নারীর বদলে নারী, কিন্তু যে তার ভ্রাতার হত্যাকারীকে মাফ করে দেবে, সে

হত্যাকারীর নিকট থেকে ন্যায়সঙ্গত ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে এবং তার উপর একটি ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে এবং তার উপর একটি জরিমানা ধায্য করা হবে মানবিকতার সঙ্গে। ইহা তোমার প্রভুর কাছ থেকে ক্ষমা ও দয়া। এরপরও যে হত্যাকারীকে হত্যা করে সীমা লঙ্ঘন করবে, তার জন্য রয়েছে মর্মান্তিক শাস্তি।"

এখানে উল্লেখ অনাবশ্যক যে, স্থানীয় আদতগুলো ছিল উপরে উল্লেখিত ইসলামী আইনের বরখেলাফ। দুঃখের বিষয়, গোত্রগুলো ইসলাম গ্রহণ করলেও তারা জাহেলিয়াতের প্রাচীন আদতগুলো পরিত্রাগ করেনি। ইসলামের শাসন শিথিল হয়ে পড়লে পুরানো রীতি-প্রথা আবার প্রবল হয়ে উঠে।

শরীয়া প্রবর্তন

ঈমাম শামিল সমগ্র দাগিস্তানে শরীয়া জারি করেন। কেউ প্রকৃত খুনী ছাড়া অন্যকে আক্রমণ করলে তিনি তাকে কঠিন শাস্তি দিতেন। এতে পরিস্থিতির অনেক উন্নতি ঘটে। তিনি সবাইকে পরামর্শ দিলেন, উপদেশ দিলেন রক্তপাতের দাবি ছেড়ে দিতে। কারণ আল্লাহর দৃষ্টিতে তা-ই বাঞ্ছনীয়। তবু ঈমাম শামিলের জামানা, যা শরীয়ার জামানা বলে পরিচিত, সেই সময়কে বাদ দিলে অন্য সময়ে এইসব আদত আবার সমাজকে দখল করে। কারণ এগুলো দেশের মানুষের জীবনের গভীরে শিকড় গেড়ে বসেছিল। দাগিস্তানের যেসব অঞ্চলে ঈমামের প্রভাব ছিল অধিক, সেসব স্থানে শরীয়ার ছাপ এখনো বিদ্যমান। এখনো সেখানে আপোষ মীমাংসাকে প্রাধান্য দেয়া হয় এবং এখনো রক্তপণের ব্যাপারে ঐক্যমত গৃহীত হয়। যারা মক্কা থেকে হজ্জ্ব করে ফিরে আসেন, তারা শরিয়ত আইনের প্রভাব আরও বর্ধিত করেন।

ককেশাসের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় দাগিস্তানে এখন অনেক কম খুনাখুনি হয়। সম্ভবত মুরীদদের প্রকৃত সংখ্যা কখনো খুব বেশি ছিল না। আমরা জানি ঈমাম শামিলের ক্ষমতাকালে কেবল নিকটবর্তী দেহরক্ষীরাই ছিল যোদ্ধা মুরীদ। মোট সংখ্যা কখনো ১৩২ এর বেশি ছিল না। তবে ঈমামের চারপাশে যারা জমা হয়েছিল, তারা ছিল অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে নির্বাচিত এলিট, যাদের ছিল মহত্তম চরিত্রের সর্বোচ্চ স্তরের গুণাবলী। তারা ছিল সব স্থানীয় নেতা, যারা সমস্ত দাগিস্তানে জেহাদের নেশা ছড়িয়ে দেয়। তারা ছিল সম্মুখ সারির যোদ্ধা। দাগিস্তান এবং চেচনিয়ার বীর জনতা তাদের নেতৃত্বে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতো।

গুয়েভেরা, গেরিলা যুদ্ধের একজন বিশেষজ্ঞ, এই বিস্ময়কর ব্যাপারকে একটিমাত্র বাক্যে প্রকাশ করেছেন ঃ 'গেরিলা যোদ্ধাদের বন্ধন হচ্ছে একটি নিউক্লিয়াস, যার চারপাশে জনতা সমবেত হয়ে লড়াই করে।'

জেহাদ আন্দোলন

জেহাদ ঘোষণার তারিখ থেকে কাজী মুল্লার জীবন ছিল সংক্ষিপ্ত এবং ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ। তার এই জীবনকালে তিনি উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেন বার বার এবং উল্লেখযোগ্য ব্যর্থতাও ঘটে বার বার। তিনি একদিনের জন্যও তার জীবনের অভীষ্ট লক্ষ্য সম্পর্কে বিস্মৃত ছিলেন না। দাগিস্তানের লোকদের তিনি যে প্রথম সাধারণ আবেদন প্রচার করেন, তা লিখিত হয়েছিল ১৮২৯ সনে। ঘিমড়িতে প্রথম একটি সাধারণ সভার পর সে সভায় দাগিস্তানের প্রায় সকল অঞ্চলের ধর্মীয় নেতারা যোগ দিয়েছিলেন, যারা একবাক্যে কাজী মুল্লাকে ঈমাম বলে গোষণা করেন এবং জেহাদের জন্য তার আহ্বানে সম্মতি দান করেন, সেই সভাতে জিহাদের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আভরের উপর আক্রমণ

স্থির হলো যে, প্রথম আক্রমণ করা হবে আভরের উপর। আভরের খান ছিল তখন একজন নাবালেগ অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক। কিন্তু শাসনভার ছিল তার মায়ের উপর। তার মা ছিলেন পাখো বীখে নাম্নী এক অসাধারণ প্রজ্ঞাবতী ও সাহসী মহিলা। ১৮৩০ সনের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি কাজী মুল্লা ৩০০০ যোদ্ধা নিয়ে আন্দির দিকে রওয়ানা করেন। সেখানে আরোও ৩০০০ মুজাহিদ তার সঙ্গে যোগ দেন। যাত্রাপথে তিনি তার প্রতিবেশী ইরগানাই এবং কাগাতলির প্রতিবেশীদের সশস্ত্র প্রতিরোধের সম্মুখীন হন। কিন্তু সহজেই তিনি তাদেরকে পরাজিত করেন। তার ২৭ জন মুজাহিদ মারা যান এবং আরো অনেকে জখম হন। ঘিমড়ি থেকে সারা পথ তিনি আসেন পায়ে হেঁটে। কারণ তখনো তিনি গাজ্ওয়াতের ঝান্ডা উচ্চে তুলে ধরেননি। তিনি এতটাই বিনয়ী ছিলেন যে, তিনি ঘোড়ায় চড়তে রাজী ছিলেন না। মাঝে মাঝে তিনি থামতেন এবং কাঁধের উপর মাথা রেখে সামনে ঝুঁকে দাঁড়াতেন, যেন তিনি কিছু শুনছেন- যদিও নীরবতা রাজত্ব করতো পর্বতগুলোর উপর। যখন তার সাথীরা প্রশ্ন করতেন তিনি জবাব দিতেন- 'তোমরা কি শুননা; আমার মনে হয় এ হচ্ছে শৃঙ্খলের ঝনঝন শব্দ, যাতে বেঁধে রুশী বন্দীদের আমার সামনে হাজির করা হচ্ছে।' এরপর একটি শিলার উপর বসে তিনি তার ধারণার রূপ দিতেন এবং ককেশাস বিজয়ের প্ল্যান তৈরী করতেন এবং মস্কো জয় করে আমরা যাব ইস্তাম্বুল। আর আমরা যদি দেখতে পাই সুলতান একজন ধার্মিক মানুষ, শরিয়ার আদেশ-নিষেধ কঠোরভাবে মেনে চলছেন, তাহলে আমরা তার উপর হাত দিব না। অন্যথায় তাকে শৃঙ্খলিত করব এবং তার সাম্রাজ্য এসে যাবে মুমীনদের হাতে। তিনি যখন আন্দির নিকট এলেন, সকল লোক বেরিয়ে এলো তার কাছে এবং আন্দির মুসলমানরা তাদের গাত্রাবরণ বিছিয়ে দিল তাদের জন্য।

বহু স্থানে এই ঘটনাটির বিপুল প্রভাব পড়ে জনতার উপর। খোদ আভারিয়াতে প্রায় সকল লোক ঈমামের সঙ্গে যোগ দেয়। অবশ্য রাজধানী শহর খোন্‌জাখ, যেখানে ছিল ৭০০-এর বেশি বাড়ীঘর, সেখানে পরিস্থিতি ছিল কঠিনতর। খোন্‌জাখ স্থির করে কাজী মুল্লাকে প্রতিরোধ করবে এবং শেষ মূহূর্ত পর্যন্ত রাজধানী রক্ষা করার জন্য সংগ্রাম করবে। ১৮৩০ সনের ১৪ই ফেব্রুয়ারি মুরীদরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে আক্রমণ করে। এই দুই দলের সেনাপতি ছিলেন কাজী মুল্লা নিজে এবং ঈমাম শামিল। তাদের যুদ্ধধ্বনি ছিল 'আল্লাহু আকবর, লাইলাহা ইল্লাল্লাহু'। খোন্‌জাখের লোকেরা এর পূর্বে কখনো এরূপ চিত্তাকর্ষক গুরুগম্ভীর কিছু দেখে নাই বা শুনে নাই। তাদের অস্ত্রশস্ত্র আপনা-আপনি হাত থেকে খসে পড়ে এবং তারা যে প্রতিরোধের আগুন জ্বেলেছিল, তা হঠাৎ থেমে যায়। এই সময়ে পাখোবীখে বুঝতে পারলেন ডিফেন্ডাররা নতি স্বীকার করতে তৈরী হয়ে গেছে। তখন তিনি তার রমণীসূলভ প্রভাব খাটিয়ে একটি তরবারী হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলেন। তিনি চিৎকার করে বললেন, 'আভরগণ, তোমরা অস্ত্র বহনের উপযোগী নও; তোমরা যদি এগুলো ব্যবহার করতে অক্ষম হও, আমাদেরকে এগুলো দিয়ে দাও এবং তোমরা আমাদের জুব্বার নীচে আশ্রয় গ্রহণ কর।' এই নির্মম বিদ্রুপে ডিফেন্ডারগণ দংশিত হয়ে সার বেঁধে দাঁড়ায় ঠিক যখন শত্রুবাহিনী বালির বস্তার উপর আরোহণ করতে যাচ্ছিল। এই যুদ্ধে মুরীদগণ পশ্চাৎ অপসরণ করতে বাধ্য হয়। তাদের দু'শ' জন শহীদ হন এবং অনেকে আহত হন। ঈমাম শামিল মৃত্যুর মুখ থেকে বেঁচে আসেন। এই প্রথম তিনি রক্ষা পেলেন পরবর্তীকালের আরও বহুবারের মতো। তিনি রক্ষা পেলেন এ কারণে যে, আল্লাহ তাকে এই পৃথিবীর কাজ করার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন। অন্যদিকে কাজী মুল্লা পিছু হটে ঘিমড়ি চলে গেলেন। তিনি বলেন, এই পরাজয় হচ্ছে মানুষের উপর আল্লাহর শাস্তি। তাদের ঈমানহীনতার জন্য তাদেরকে তাদের ঈমান এবং আচরণ দুরস্ত করতে হবে।

রাশিয়ানদের মোকাবেলা

খোন্‌জাখ দখল করার পর কাজী মুল্লা চাইলেন চেচনিয়ার সেই অংশটি অবরোধ করতে- যাকে বলা হত আউখ। তিনি ভিনেজাপনায়া দুর্গে রাশিয়ানদের আক্রমণ করলেন। এর মোকাবেলায় রুশ সেনাপতি ব্যারন রজেন দ্রুত একটি ক্ষুদ্র অথচ মজবুত বাহিনী নিয়ে সেই অবস্থানটির রক্ষার জন্য ধাবিত হলেন। খোন্‌জাখের ঘটনাবলী শোনার পর তিনি ছুটলেন খারখাস পর্বতে। সেখানে খিমড়ি বাদে সমস্ত কৈসোবো আত্মসমর্পণ করে। এতে তৃপ্ত হয়ে বেরোন রজেন যুদ্ধ ক্ষান্ত দেন। কাজী এই ভেবে স্বস্তি পেলেন যে, রুশীরা তাকে আক্রমণ করতে সাহস পায়নি। কয়েক সপ্তাহ পরে তিনি আবার এক বিরাট ফৌজের নেতৃত্বে আঘাতোহ্‌কালাতে একটি অনধিগম্য স্থানে অবস্থান গ্রহণ করেন। তাকে এখান থেকে বিতাড়িত করার জন্য

মেজর জেনারেল প্রিন্স বেকোভিসের সেনাপতিত্বে রুশীরা আরেকটি ব্যর্থ যুদ্ধ পরিচালনা করে। এতে কাজী মুল্লার সম্মান আরও বেড়ে যায়। তিনি বিপুলসংখ্যক সহচরকে নিয়ে আলি বোনীওনের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন এবং সেখানে ব্যারোন তুবে নামক একজন রাশিয়ান সেনাপতিকে পরাজিত করেন। এরপর শামখালের (স্থানীয় সর্দার) বসতি প্যারাউল ধ্বংস করে টারকু দখল করেন এবং বোরনাইয়াব রুশ দুর্গ অবরোধ করেন। যা আত্মসমর্পণ করতে যাচ্ছিল, কিন্তু সে সন্ধি করে, রুশীদের সঙ্গে আরো ফৌজ এসে যোগ দেয়। বিপুল ক্ষয়ক্ষতির মধ্যে তিনি পরাজিত হলেন এবং পাশ্চাত্য অপসাবরণ করতে বাধ্য হলেন। তিনি পুনরায় তেকোমেসকেন্তে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এ হচ্ছে ১৮৩০[১] সনের ঘটনা এবং দশদিন বিশ্রামের পর তিনি আবার ভিনাজপনায়াতে মার্চ করেন এবং মজবুত অবস্থানটি অবরোধ করেন। জেনারেল ইমানুয়েলের নেতৃত্বে রুশ ফৌজ সে দুর্গ রক্ষায় দ্রুত ছুটে আসে। কিন্তু ঈমাম তার বুর্নাইয়ার অভিজ্ঞতার বদৌলতে সময় থাকতে পার্শ্ববর্তী অরণ্যে পশ্চাত অপসরণ করেন। সেখানে রাশিয়ানরা যখন তাকে অনুসরণ করে, কাজী মুল্লা তাদেরকে একেবারে পর্যুদস্ত করেন দেন, একটি বন্দুক দখল করেন এবং জেনারেল ইমানুয়েলকে আহত করেন। ইমানুয়েল তখন কমান্ড অর্পণ করেন জেনারেল ভালমীনফকে।

ঈমাম হামজাদের প্রয়াস

পর্বতের অপর পার্শ্বে ঈমাম হামজাদ (পরবর্তীকালে দ্বিতীয় ঈমাম) দাজরবিলো কানিসের লোকদের মধ্যে একটি স্বাধীনতার আন্দোলন শুরু করতে সক্ষম হন। এই আন্দোলন দমন করতে গিয়ে জেনারেল স্ট্রিকালোপের অধীনে রুশ ফৌজ জ্যাকাতলিতে মারাত্মকভাবে পরাজিত হয়। এই যুদ্ধে ছয়জন অফিসার নিহত হয়, ২৪৩ জন সৈন্য মৃত্যুরবণ করে, ১০ জন অফিসার এবং ১৩৯ জন সৈন্য যখম হয়- মোট তিন ব্যাটেলিয়ন সৈন্যের মধ্যে। এতে তিনটি কামান নষ্ট হয়। সম্রাট নিকোলাস এবং পাস্‌কি এবিসকে এ যুদ্ধ অনুশোচনার সাগরে নিক্ষেপ করে। এরিভান রেজিমেন্টের দুটি ব্যাটালিয়ানই মুজাহিদদের দেখে আতঙ্কে পলায়ন করে। কাজী মুল্লা আবার ফিরে গেলেন তেকোমেসকেন্তে। সেখানে তিনি তাবাস্‌সারানের অধিবাসীদের পক্ষ থেকে একটি ডেপুটেশনকে সাক্ষাত দেন। তারা তাকে রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে জেহাদে তাদের নেতৃত্বদানের জন্য আহ্বান জানায়। পুনরায় তিনি দারবেন্দ অভিমুখে যাত্রা করেন এবং আটদিন এই দুর্গ অবরোধ করে রাখেন। তিনি এখানে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করতে পারেননি। তাই তিনি কিজ্‌লিয়ার শহরে একটি দুঃসাহসী এবং সফল আক্রমণ করেন (কাজী মুল্লা এবং শামিল উভয়ের

১. এই সময়ে সৈয়দ আহমদ শহীদ নর্থওয়েস্টার্ন পাকিস্তানে বালাকেটে যুদ্ধ করতে করতে শাহাদাত বরণ করেন।

নিকট শহরটি পরিচিত ছিল তাদের যৌবনকাল থেকে এবং তাঁরা সেখানে গিয়েছিলেন কয়েকজন স্কলারকে দেখতে। তারা দু'জনেই তখন ছিলেন ধর্মতত্ত্বের ছাত্র। শহরটি দখল করে কাজী মুল্লা দুশ' বন্দী নিয়ে দাগিস্তান ফিরে যান। এ সময় মালে গনিমাতের পরিমাণ হয়েছিল প্রায় ৪০ লক্ষের উপরে। জেনারেল কাখানোফ চুমখেসকেস্তের দুর্গটি যে কোনো উপায়ে ধ্বংস করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। ২৪শে নভেম্বর একটি ব্যর্থ অভিযানের উপর কর্ণেল মিখলাস সেভস্কি আবার পহেলা ডিসেম্বর আক্রমণ করেন। প্রাকৃতিক এবং কৃত্রিম প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও দুর্গটি আক্রান্ত হয়। এই যুদ্ধে ৪০০ রুশ ফৌজ মারা যায়- যদিও তারা কেবল দুশ' আত্মরক্ষী কর্তৃক রক্ষিত একটি কাঠের টাওয়ার মাত্র দখল করতে পেরেছিল। এই আক্রমণে আটজন রাশিয়ান অফিসার মারা যায়। এদের মধ্যে মিখলাশেভস্কি ছিলেন। রুশীরা ইমানুয়েলের কাছ থেকে অধিকৃত কামানটা নিয়ে যায়। কিন্তু তাতে তাদের আশিজন সৈন্যকে প্রাণ দিতে হয়। এই যুদ্ধে ১৫০ জন মুজাহেদীন প্রাণ দেন।

নাজরানের ঠিক দক্ষিণের পার্বত্য অঞ্চলগুলোতে কাজী মুল্লা ককেশাসের গোত্রগুলোকে একটি মহান মুসলিম রাষ্ট্রে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি দাগিস্তানের একটি বাহিনীকে তাদের মধ্যে ইসলামের বাণী প্রচার করার জন্য প্রেরণ করেন। এই প্যাগান গোত্রগুলোর মধ্যে এই প্রচার সম্পূর্ণভাবে সফল হয়। এই নবদীক্ষিত গোত্রগুলোর উৎসাহ-উদ্দীপনা এতই প্রবল ছিল যে, তারা রাশিয়ান প্রী-স্টাফ এবং অন্য অল্প কয়জন সরকারী কর্মচারীকে হত্যা করে এবং এভাবে তারা ইসলাম ও স্বাধীনতার জন্য তাদের আগ্রহ-উদ্দীপনা প্রমাণ করে। এর প্রতিশোধ নেবার জন্য ব্যারন রোজেনের নেতৃত্বে এই পর্বতগুলোর বিরুদ্ধে রুশ ফৌজ ধাবিত হয়। জেনারেল ভালমীনফ ছিলেন তার প্রধান সেনাপতি।

গালগেইসের লোকেরা ছিল সংখ্যায় অল্প এবং খুবই দুর্বল। প্রবল প্রতিরোধ তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু তারা তাদের পার্বত্য অবস্থানগুলোর উপর নির্ভর করে আত্মসমর্পণের দাবি প্রত্যাখ্যান করে এবং প্রী-স্টাফকে হত্যা করার জন্য যারা দায়ী তাদেরকে অর্পণ করতে অস্বীকার করে। তারা কল্পনা করেছিল তাদের অবস্থানগুলো রাশিয়ান ফৌজের জন্য অনধিগম্য। রাশিয়ানরা বাল্টাতে একটি উড়ো কলাম গঠন করে ভ্লডিকাওকাজ থেকে ১৪ ভার্স্ট দূরত্বে, যার মধ্যে ছিল ৩০০ রেগুলার সৈন্য, চারটি পার্বত্য কামান এবং ৫০০ অসিটাইন মিলিশিয়াম্যান। যেহেতু কোন রাস্তাঘাট ছিল না, তাই সৈন্যরা তাদের সঙ্গে তাবু কিংবা ন্যাপসেক কিছুই নেয়নি। প্রত্যেকে তাদের অস্ত্র ছাড়া কেবল এক ব্যাগ বিস্কুট বহন করে, যা

মাত্র ছয়দিনের খাবার হতে পারে। তার সঙ্গে ছিল মালবাহী ঘোড়া কর্তৃক বাহিত ১০ দিনের খাদ্য। অল্প কয়জন লোক কলামের পিছু পিছু যাত্রা করে। এমনকি দ্বিতীয় দিনের পর অফিসারদের তাঁবু পশ্চাতে রেখে যাওয়া হয়। অবশ্য প্রধান সেনাপতি, তার চীফ অব স্টাফ ও চেনসারির জন্য তিনটি তাবু বহন করে নিয়ে যাওয়া হয়। ভোরে তেরেক পার হয়ে একটি অস্থায়ী ব্রিজের উপর দিয়ে ফৌজ সারি বেঁধে মার্চ করে। কিন্তু চতুর্থ মাইলে এসে তারা এক বিপদজ্জনক গর্তের সম্মুখীন হয়। রাস্তা সংকীর্ণ হয়ে উঠে এবং ফৌজকে একজন একজন করে এগুতে হয়। কামানগুলো চাক্কা থেকে খুলে ঘোড়ার জিনের মধ্যে স্থাপন করা হয়। সে কারণে ক্ষুদ্র হওয়া সত্ত্বেও পথটি হয়ে উঠলো সুদীর্ঘ– সম্মুখ থেকে পশ্চাৎ পর্যন্ত ৫ মাইলের কম নয়।

পঞ্চম দিনে আস্‌সা নদীর তীরে যোতি নামক গ্রামের নিকটে প্রথম গোলা নিক্ষেপ করা হয়। অবশ্য মারাত্মক কোন যুদ্ধ হলো না। পুরা সময়টাই অভিযান চলে। গ্রামগুলো ধ্বংস করে ফেলা হয়। টাওয়ারগুলো উড়িয়ে দেয়া হয়। রাশিয়ানরা ফসল কেটে নেয়। অবশ্য এই স্বাধীনতা যোদ্ধারা ভাল করে জানতো কখন রাশিয়ান ফৌজের মোকাবেলা করতে হবে প্রবলভাবে। তারা সুবিধাজনক অবস্থানগুলো থেকে আক্রমণকারীদের উপর শিলা এবং পাথর নিক্ষেপ করে, কিংবা পিছিয়ে পড়া কোন সৈন্যকে কয়েদ করেই তারা সন্তুষ্ট ছিল।

সর্বশেষ উল্লেখিত জনবহুল গ্রাম যোতি ধ্বংস করাই ছিল এই অভিযানের চূড়ান্ত লক্ষ্য। পুরো বাহিনী এই গ্রামের দিকেই তাদের মার্চ পরিচালিত করে। একমাত্র পথটি এতই সঙ্কীর্ণ ছিল যে, ফৌজকে একজন একজন করে এগুতে হচ্ছিল এবং একজন থামলে তার পিছনের সবাইকে থেমে পড়তে হতো। এতে হাস্যকর ঘটনা ঘটে। তিসোরি থেকে অদূরবর্তী একটি বর্গাকৃতি শক্তিশালী টাওয়ার পথটি রক্ষা করছিল এবং বেপরোয়া লোকদের দ্বারা বাধাগ্রস্থ হয়ে রুশ ফৌজ পুরো তিনদিন তাদের অগ্রযাত্রা বন্ধ করে রাখে। প্রচন্ড বিপদের মধ্যে সলিড শিলার ভিতর দিয়ে একটি ঢাকা রাস্তা নিয়ে যাওয়া হয় টাওয়ারের মূলে এবং সেখানে একটি মাইন পাতা হয় এবং গ্যারিশনটি আত্মসমর্পণ করে। রাশিয়ানরা জেনে বিস্মিত হলো যে, মাত্র দু'জন মুজাহিদ তাদের ৪০০০ ফৌজকে তিনদিন ঠেকিয়ে রেখেছিল।

অধ্যায় ঃ তিন

রুশ অভিযান

গাল গেইস্ অভিযানের কিছুকাল পর রোজেন এবং ভ্যালিয়ামীনেফের নেতৃত্বে নাজরান থেকে নয় হাজার সৈন্য এবং ২৮টি কামান নিয়ে রওয়ানা করে নিম্ন চেচনিয়ার সমগ্র অঞ্চল লুটপাট ও ধ্বংস করার জন্য।

সেই সময়ে (১৮৩২) রুশীরা তখন পর্যন্ত অরণ্যের মধ্য দিয়ে কোন রাস্তা তৈরি করেনি। অবশ্য ১৮৩২ সনের প্রথম দুই দশকের শুরুতে সুপ্রসিদ্ধ গয়টেন অরণ্যের মধ্যদিয়ে রাস্তার দুই পার্শ্বে একটি গাদা বন্দুকের গুলির দূরত্ব পর্যন্ত ব্যবধান ইয়ারমুলফ পরিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু সেই রাস্তাটি ইতিমধ্যে অভেদ্য ঝোপঝাড় দ্বারা ঢাকা পড়ে যায়। এরপর রুশদেরকে চেচনিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে চূড়ান্ত কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। চেচেনরা সাহসী যোদ্ধা হিসেবে ছিল পরিপূর্ণ শ্রদ্ধার যোগ্য। তাদের অরণ্যানী এবং পর্বতের মধ্যে পৃথিবীর এমন কোন শক্তি ছিল না যা তাদেরকে তাচ্ছিল্য করতে পারে। অব্যর্থ লক্ষ্য ভয়ঙ্করভাবে দুঃসাহসী সামরিক ব্যাপারে তীক্ষ্ণধি ককেসাশের অন্যান্য অধিবাসীদের মতই তারা ছিল স্থানীয় অবস্থার সযোগ গ্রহণে তৎপর। রুশীরা যেসব ভুলত্রুটি করেছে, তার প্রত্যেকটির সুযোগ গ্রহণ করতে চেচেনরা ছিল অগ্রগামী এবং অবিশ্বাস্য দ্রুততার সঙ্গে সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতো শত্রুদের ধ্বংস করার জন্য।

চেচেনদের সঙ্গে যুদ্ধে একদিন ছিল অন্যদিনের মতোই। কেবল কোন কোন বিরল বিরতিতে অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটনা ঘটতো। যেমন একটি বৃহৎ ফৌজের সঙ্গে সাক্ষাত, একটি সুরক্ষিত আউলের (গ্রাম) উপর হামলা অথবা পার্শ্ব আক্রমণ হলে যুদ্ধের মারাত্মক একঘেঁয়েমিতে বৈচিত্র্য আসতো। রুশরা তাদের দিবসের মার্চের দৈর্ঘ্য মাপতো নদীর তীর বরাবর বন জঙ্গল সাফ করে পরিস্কার করা ব্যবধানের দূরত্ব দ্বারা। এখানে তারা তাদের ক্যাম্প গাড়তো নিকটতম জঙ্গল থেকে এক গাদা-বন্দুকের গুলির দূরত্বে। রাস্তা ছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুউচ্চ বৃক্ষের গভীর অরণ্যের মধ্যদিয়ে। এখানে-ওখানে রাস্তা বাধাপ্রাপ্ত হতো বনের ভিতর ফাঁকা জায়গায় স্রোত এবং গিরিখাত দ্বারা। প্রত্যেক অভিযানের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ চলতো। গাদা বন্দুকের গুলির আওয়াজ... শনশন ধ্বনি সর্বত্র। সৈন্যরা ধর ধর করে পড়ে যেত। কিন্তু মুজাহেদীনের সাক্ষাত পাওয়া যেত না কোথাও। জঙ্গলে ধূঁয়ার কুন্ডলীই কেবল তাদের গোপন আস্তানাগুলোকে প্রকাশ করে দিত। রুশ

ফৌজের পথ প্রদর্শনের জন্য অন্য কোন উপায় ছিল না। কেবল সেই ধূঁয়া দেখেই তারা অগ্রসর হতো।

একটি মার্চের পর তারা এক কিংবা দু'দিনের জন্য তাঁবু ফেলত। তারা পার্শ্ববর্তী যে গ্রামগুলোকে ধ্বংস করতে যাচ্ছে, সেগুলোর সংখ্যা হিসাব করে তারা তাদের তাঁবু খাটাত। ছোট ছোট ফৌজের সারি চারদিকে পাঠানো হতো মুজাহেদীনের ফসলের মাঠ ও বস্তিগুলো দখল করার জন্য। পল্লীগুলো আগুনে ভষ্মীভূত হতো। ফসল কেটে নেয়া হতো। মাসকেটের গুলির আওয়াজ হতো, কামানগুলো গর্জে উঠতো, আবার আহত ফৌজ এবং মৃত সিপাহীর লাশ আনা হতো (রুশদের মিত্র) তাতারেরা আসতো ছিন্ন মস্তক তাদের ধনুকের ছিলায় ঝুলিয়ে। কিন্তু কোন বন্দী থাকতো না। ওরা বসতিতে থাকতো না। পূর্বাহ্নে স্ত্রী লোক ও শিশুদেরকে এমন জায়গায় লুকিয়ে রাখা হতো, যেখানে তাদের অনুসন্ধান করবার সাহস কেউ করতো না। একটি রাশিয়ান সারির মাথা নৈশ অভিযানের পর ফিরে আসতো, কিন্তু তার পশ্চাৎভাগ তখনো দৃষ্টিগোচর হতো না। জঙ্গলের ভিতর তারা লড়াই করতো। যতই সৈন্যসারি নিকটবর্তী হতো, ততই দ্রুততর হতো গুলি বর্ষণ। মুজাহেদীনগণ যারা রুশ সৈন্যদেরকে ঘেরাও করে ফৌজের পশ্চাৎবর্তী অংশকে চারদিক থেকে চাপ দিতো, তাদের যুদ্ধের ধ্বনি শোনা যেতো। তারা তরবারী হাতে নিয়ে ছুটে আসতো এবং কোন মুহূর্তে শত্রুর ফৌজ পরিষ্কার জায়গায় দৃশ্যমান হবে সেই মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করতো বুলেট বর্ষণ করার জন্য। এই যুদ্ধের মোকাবেলার জন্য রুশ ব্যাটালিয়ন এবং কয়েকটি কামান ছুটে আসতো। পদাতিক বাহিনীর অবিরাম গুলি বর্ষণ এবং গোলন্দাজদের কেনাস্তারা ও বড় ধরনের হত্যাকান্ড ছাড়াই জঙ্গলের ভিতর থেকে ফৌজের কলাম বেরিয়ে আসতো।

রুশ সৈন্যরা ঘাস কাটার জন্য অগ্রসর হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় নতুন আর একটি লড়াই এবং তাঁবু ছাড়া অস্থায়ী শিবিরে আগুনের জন্য বা রান্নার জন্য জ্বালানী সংগ্রহ করতে রুশ ফৌজের মরিয়া হয়ে লড়তে হতো। যদি স্রোতের এক তীর ঘাসবন দ্বারা আচ্ছাদিত হতো কিংবা দেখা যেত পানি সংগ্রহের জন্য গর্তের আভাস, রুশ ফৌজ তা করতো অর্ধেক ব্যাটালিয়ন এবং গোলন্দাজদের দ্বারা। অন্যথায় তাদের ঘোড়াগুলোকে গুলি করে মেরে ফেলা হতো কিংবা মুজাহেদ্‌রা তাড়িয়ে দিত। যুদ্ধের একদিন ছিল অন্য দিনের মতোই। গতকাল যা ঘটেছে- আগামীকালও তা ঘটবে। সর্বত্রই রয়েছে পর্বতমালা। সর্বত্রই রয়েছে বনভূমি এবং চেচেনরা হচ্ছে দুঃসাহসী এবং অক্লান্ত যোদ্ধা। তারা রুশ ফৌজকে একটা শিক্ষা দেয় কেননা ওরা চেচেনদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে এবং তাদের ঈমান ও মুক্ত অঞ্চলগুলোকে পদানত করতে চায়।

পারিপার্শ্বিকতার সবচাইতে উপযোগী অবস্থায় রুশ ফৌজের কুচকওয়াজ এবং

বিন্যাস এরকইম ছিল। যুদ্ধের অবস্থাও ছিল এইরূপ এবং কখনও তার ব্যতিক্রম ঘটতো না। কলাম বিন্যস্ত হতো এভাবে- একটি ব্যাটেলিয়ন সম্মুখভাবে কুচকাওয়াজ করে অগ্রসর হতো, একটি পশ্চাতভাগে। প্রত্যেকেরই থাকতো হালকা যুদ্ধাস্ত্র অথবা রাস্তা অনুপযোগী হলে তারা বহন করতো পর্বতে ব্যবহার উপযোগী কামান। কলামের মধ্যখানে থাকতো ঘোড়সওয়ার বাহিনী, অতিরিক্ত সেপাই, গোলন্দাজ বাহিনী এবং ট্রান্সপোর্ট। তাদেরকে পাহারা দিত দুই পার্শ্বে কুচকাওয়াজ করা অগ্রসরমান পদাতিক বাহিনী। অগ্রগামী রক্ষী ফৌজের সামনে এবং পশ্চাৎভাগে এবং তাদের উভয় পার্শ্বে কলামের সারি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত থাকতো অব্যর্থ লক্ষ্য যোদ্ধারা- তাদের অতিরিক্ত ফৌজ এবং কামান বন্দুক নিয়ে। সমতল অঞ্চলে অথবা খোলা জায়গার পাশে পাশে থাকতো তিনটি পার্শ্বরক্ষী লাইন অথবা শিকল- কলাম থেকে একটি প্রকৃষ্ট গাদা বন্দুকের গুলি থেকে দূরে। কিন্তু জঙ্গলে প্রবেশ করার পর তারা অনুকূল ভূমিতে কুচকাওয়াজ করে অগ্রসর হতো এবং মুজাহেদগণ গোলাগুলি থেকে যতদূর সম্ভব দূরে থাকতে চেষ্টা করতো। ফৌজের একটি জমাট দলের উপর লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়া হলে তা হতো মারাত্মক রকমের বিধ্বংসী। রুশীরা বলতো এ যেন ফৌজের সারিকে একটি বাক্সের ভিতরে বহন করা। কুচকাওয়াজের সময় পুরো যুদ্ধটা সংগঠিত হতো বেষ্টনীর লাইনের মধ্যে। যখন অগ্রসর হতো, তখন লড়াই হতো পশ্চাৎভাগে... এবং প্রায় সব সময়ই যুদ্ধ হতো উভয় পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে। আর এর মধ্যে ছিল সবচাইতে কঠিন এবং সবচাইতে বিপজ্জনক কাজ। শার্প শুটারেরা অগ্রসর হতো জোড়ায় জোড়ায় এবং প্রায়ই তারা জঙ্গলের মধ্যে একে অন্যের কাছ থেকে অদৃশ্য হয়ে যেত এবং পথ হারিয়ে ফেলতো। চেচেনরা যখন ওদেরকে জমিনের উপর দেখত, তখন এই বিচ্ছিন্ন সৈন্য দু'টির দিকে তারা ধাবিত হতো এবং তাদের কমরেডরা আসার আগেই তাদেরকে কেটে কেটে টুকরো টুকরো করতো। সৈন্য ফৌজ যে রাস্তা ধরে অগ্রসর হতো, তা থেকে মুজাহেদগণ গতিবিধি কচিৎ কখনো দেখা যেত, কারণ তারা বন-জঙ্গল ও অসমতল জমিনের দ্বারা নিজেদেরকে গোপন করে রাখতো। রুশীরা সিঙ্গা ফুকে এবং সন্নিবেশিত ফৌজকে দেওয়া সিগনালের সাহায্যে পশ্চাৎ, সম্মুখ ও পার্শ্ববর্তী ফৌজদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতো এবং এই সংখ্যাগুলো ঘন ঘন বদলানো হতো। কেননা বার বার একই সংখ্যা ব্যবহার করলে মুজাহেদনগণ তার সঙ্গে পরিচিত হয়ে পড়বে, যখন কোন বিশেষ দলের অবস্থান অথবা বিশদ তথ্য জানার দরকার হতো, তখন পূর্বে ঠিক করা প্রশ্নবোধক সিগনালের সঙ্কেত দেওয়া হতো এবং সকল দলের সিগনালারগণ তাদের নিজ নিজ নম্বরসহ জবাব দিত। ধ্বনি বিচার করে আদেশ দেওয়া হতো গতি বাড়ানোর- যখন যেমন দরকার হতো তেমনি। মাঝে মাঝে দেখা যেতো মুজাহেদগণের গুলি একেবারে রুশ ফৌজের মধ্যভাগে প্রবেশ করেছে এবং তারা কখনো কখনো মূল

সৈন্যবাহিনীকে আড়াল করার জন্য প্রেরিত যোদ্ধাদের শৃঙ্খল ভেদ করে মূল কলামের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তো। রুশ ফৌজ সব সময়ই স্থাপিত হত বর্গাকৃতিতে। পাশে থাকতো পদাতিক ও গোলন্দাজ বাহিনী, ঘোড় সওয়ার বাহিনী ও যানবাহন থাকতো মধ্যে। ফৌজ যখন ক্ষুদ্রাকৃতির হতো, তাকে বৃহৎ আকার দান করা হতো মালবাহী গাড়ীঘোড়ার দ্বারা। দিনের বেলায় একটা হালকা পিকেট এর ব্যবস্থা করা হতো তাবুর চার পার্শ্বে, তাঁবুগুলো থেকে একটি মাসকেটের গুলির দূরত্বে রাত্রিকালে শার্প শুটারদের সংখ্যা বাড়ানো হতো। অতিরিক্ত অগ্রবর্তী অবস্থানে স্থাপন করা হতো এবং সকলের সম্মুখভাগে বিপদসঙ্কুল স্থানগুলোতে সন্ধ্যার পরে গোপন পিকেট বসানো হতো, যাতে তাদের গতিবিধি সম্পর্কে মুজাহেদগণ জানতে না পারে। কঠোর নীরবতার নির্দেশ জারি করা হতো তাদের উপর এবং হুইসেল ছাড়া তারা কেউ কাউকে চ্যালেঞ্জ করতে পারতো না। কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়েও সামান্য শব্দ শোনা গেলেই তারা গুলি করবে- এই আদেশ ছিল তাদের উপর। বর্গক্ষেত্রের মধ্যে সম্মুখভাগের প্রত্যেকটি পার্শ্বকে নির্দেশ দেয়া ছিল সত্যি সত্যি আক্রমণের মোকাবেলায় তারা যেন পিকেটের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। তাঁবুর সামনে তিনটি লোক উপুড় হয়ে পড়ে থাকতো, তাদের বন্দুক এবং কার্টিজের বেল্ট নিয়ে। বাকি সৈন্যরা এবং অফিসারগণ পোশাক খুলে নিদ্রা যেত এবং চেচেনরা প্রায় প্রত্যেক রাত্রিতে হামাগুড়ি দিয়ে সকল রকমের সতর্কতা সত্ত্বেও ক্যাম্প পর্যন্ত এসে গুলিবর্ষণ করতো, এ বিষয়ে ভ্রুক্ষেপ না করেই।

১৮ তারিখে রুশ ফৌজের বিরুদ্ধে কাজী মুল্লা তার শেষ সাফল্য অর্জন করেন। তেরেক নদীর তীরবর্তী আমির হাজী যোরত-এর কাছাকাছি হঠাৎ আবির্ভূত হয়ে তিনি গ্রেবেনস্কি কোসাকদের ৫০০ সিপাহীকে ২৫ মাইল দূরে জঙ্গলে নিয়ে যেতে সক্ষম হন। এরপর তিনি চারদিক থেকে ওদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং তাদের সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত করলেন। এই যুদ্ধে আরও একজন অফিসারসহ রুশ কমান্ডার নিহত হন, ১০৪ জন রুশ সেপাই এবং তিনজন অফিসার এবং ৪২ জন সিপাহী জখম হয়। ছয়দিন পরে ব্যারন রোজেন, বরং বলা যায় ভেলিয়ানিনোফ, কারণ কমান্ডার-ইন-চীফ তার উপরই সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন, হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়েন সামান্য ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে ঘারমেনচোগ্ পল্লীর উপর। এই পল্লী ছিল সে সময়ে চেচনিয়ার সবচেয়ে বড় এবং বিত্তবান পল্লী। এই পল্লীতে ছিল ৬০০-এর বেশী ঘরবাড়ী। কাজী মুল্লা এই পল্লীটি রক্ষা করার জন্য তার একদল মুরীদকে পাঠান। গ্রামবাসীদের কোন কামান বন্দুক ছিল না। প্রায় সমতল অঞ্চলে একটি সুসজ্জিত গোলন্দাজ বাহিনীর বিরুদ্ধে পল্লীটিকে রক্ষা করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু গ্রামটিকে রক্ষা করতে গিয়ে চেচেন যোদ্ধারা একেবারে মরিয়া হয়ে লড়াই করে। গ্রামটির এক সীমানায় ছিল মাত্র তিন জন সেপাহী এবং আত্ম উৎসর্গকারী চেচেন ও মুরীদদের একটি দল।

চেচেনরা তিনটি গৃহে নিজেদেরকে রক্ষা করে প্রচন্ডতার সঙ্গে গুলি চালিয়ে যাচ্ছিল এবং ইতিমধ্যেই তারা একজন লেফট্যান্টন কর্ণেলকে হত্যা করতে এবং কয়েকজন সিপাহীকে জখম করতে সক্ষম হয়। তখন চীফ-অব-স্টাফ ভলখভাস্কি কর্ণেল ব্রামারসহ গোলন্দাজ বাহিনীকে কমান্ডার রূপে নিয়ে অগ্রসর হন। সঙ্গে ছিলেন ভিওভোলোবস্কি এবং বোগদানবিচ– লক্ষ্য সশরীরে এই যুদ্ধের বিজয় অর্জন। জেনারেল তোরনান ইতিমধ্যে গ্রামের মধ্যদিয়ে একটি রাস্তা আবিষ্কার করেছিলেন। সেই রাস্তা দিয়ে তাদের নিয়ে অগ্রসর হন। ঘরগুলোকে তিন সারি শার্প শুটার দ্বারা বেষ্টন করা হয়। তারা বেষ্টনের বেড়া এবং জঙ্গলের পিছনে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে ঘরগুলোকে ঘেরাও করে থাকে। কেউই মুজাহিদগণের দৃষ্টিতে পড়ার মত সাহস করেনি। কারণ অসতর্ক সেপাইকে অব্যর্থ লক্ষ্য বুলেটে ছিন্নভিন্ন করে শাস্তি দেওয়া হতো; রুশগণও বেষ্টনির পশ্চাতে পড়ে থাকে। কারণ তারা দেখতে পাচ্ছিল টার্গেট হিসেবে নিজেদেরকে চেচেনদের নজরে ফেলায় কোন ফায়দা নেই। রুশগণ তাদের সঙ্গে একটি হালকা কামান এনেছিল, তা দিয়ে তারা তিনটি গৃহকে গুলি করে ঝাঝরা করে দেয়, দ্বিতীয় বার আক্রমণের পর তাদের লোকজন তাদের একথা বলতে ছুটে এল যে- রুশগণ অপর পার্শ্বে নিজেদের লোকজনের উপর গুলি করে চলেছে। যদি তারা শার্প শুটারদের একটি দিক এবং অতিরিক্ত সেপাইদের খালি করে দেয়, তাহলেই সেই ফাঁক দিয়ে শত্রু পালিয়ে যাবে। কিন্তু তা চিন্তা করা যায় না। তাই তারা অর্ডার দিল গুলি বন্ধ করে ঘরগুলোকে আগুন লাগিয়ে দিতে- একপাশ থেকে হলেও। বলা যতো সহজ ছিল কাজটা ততো সহজ ছিল না। প্রথমত ঘরগুলোর ছিলো একফুট পুরো কাদামাটির এক একটি আস্তর– ভিতরের ডালপালা বুনে তৈরি করা প্রাচীরগুলো রক্ষা করছিল, দ্বিতীয়তঃ প্রাচীরগুলোর সর্বত্র ছিল ছেদা, বরং মারাত্মক রাইফেল দ্বারা ঠাসা। যাই হউক গুপ্ত সুরঙ্গ তৈরীতে পারদর্শী রুশ ফৌজ শেষ পর্যন্ত দায়িত্ব গ্রহণ করে তারা তাদের সামনে বলদ চালিত গাড়ীর একটি শীল্ড ঠেলে ঠেলে, যে গাড়ী বোঝাই ছিল খড় ও ব্রাস উডের আঁটি দিয়ে, শেষ ঘরটির সংকীর্ণ দিকটি পর্যন্ত হামাগুড়ি দিয়ে অগ্রসর হয় এবং একমাত্র ভিত্তিটি বহুকষ্টে ভেঙ্গে ফেলে এবং প্রাচীরে আগুনে গোলা বর্ষণ করে যা ফায়ার প্রুফ আস্তরের নিচে ধিকিধিকি জ্বলতে শুরু করে; এমনকি এই দিক থেকেও চেচেনগণ গুলি করে চলে, যতক্ষন না জ্বলন্ত প্রাচীরের আগুন তাদেরকে বিতাড়িত করে। সেপাইগণের সঙ্গে এখন যুক্ত হয় দুইজন গোলন্দাজ, তাও ছিল ভলান্টিয়ার, তারা দগ্ধ প্রাচীর বেয়ে প্রথম ছাদের উপর আরোহন করে এবং সেপাইদের কাছ থেকে হ্যান্ড গ্রেনেড নিয়ে টিউবে আগুন জ্বালিয়ে প্রশস্ত চিমনীর ভিতর দিয়ে সেগুলো নীচে দালানের ভিতর নিক্ষেপ করে, যেখানে আত্মরক্ষাকারীগণ ছিল ঠাসাঠাসি করে। প্রথম দু'টি গ্রেনেড বিস্ফোরিত হয়, কিন্তু বাকীগুলো নয়।

পরবর্তীকালে জানা যায় বারুদে আগুন ধরার আগে চেচেনগণ গ্রেনেডের উপর শরীর চেপে বসেছিল, ধীরে ধীরে আগুন ছড়িয়ে পড়ে বাকী দুটি ঘরে। মুজাহিদীনের পক্ষে আত্মসমর্পণ করা বা দগ্ধীভূত হওয়া- এই দুইয়ের একটি ছাড়া কোন উপায় ছিল না। ভলখোভস্কি এই সাহসী যোদ্ধাদের জন্য দুঃখবোধ করেন এবং একজন মুজদক কসাক, যার নাম ছিল আতার্শচিকফ, যে দোভাষী হিসেবে কাজ করছিল- তাকে আদেশ দিলেন– চেচেনদের কাছে এই প্রস্তাব দিতে যে, যদি তারা হাতিয়ার ফেলে দেয়, তাহলে তিনি কমান্ডার-ইন-চীফের নামে এই অঙ্গীকার করছেন যে, কেবল তাদের নিজেদের জীবনই রক্ষা করা হবে না; রুশ যুদ্ধ বন্দীদের সঙ্গে তাদের বিনিময়েরও অঙ্গীকার থাকবে এবং তাদেরকে এই আশ্বাস দেয়া হচ্ছে যে, ভবিষ্যতে তারা পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে যেতে পারবে। আতার্শচিকফ যখন অগ্রসর হল, তখন গুলি বর্ষণ বন্ধ হয়ে গেল এবং চেচেনদের ভাষায় তাদের জানাল যে- সে তার সঙ্গে আপোষ আলোচনা করতে চায়। ডিফেন্ডারগণ প্রস্তাবটি শুনে কয়েক মিনিট নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে। তারপর অর্ধউলঙ্গ, আগুন ও ধোয়ায় কৃষ্ণবর্ণ এক চেচেন বেরিয়ে আসে এবং একটি সংকীর্ণ বক্তৃতা করে। তারপর ঘরের সবগুলো ছেদা থেকে গুলি বর্ষণ শুরু করে। সে যা বলেছিল, তা এই- **"আমরা কোন আশ্রয় চাই না, আমরা রুশদের কাছ থেকে কেবল একটিমাত্র দয়াই চাই যেন তারা আমাদের পরিবার-পরিজনকে জানিয়ে দেয় আমরা যেভাবে বেঁচেছিলাম, সেভাবে মৃত্যুবরণ করেছি। কোন বিদেশীর জোয়ালের নীচে মাথা নীচু করি নাই।"**

রুশগণ তখন সকল দিক থেকে ঘরগুলোর উপর গুলি বর্ষণের হুকুম দেয়, সূর্য তখন অস্ত গেছে এবং ধ্বংসের দৃশ্য আলোকিত হলো কেবলমাত্র অগ্নিশিখার লাল আভার দ্বারা। চেচেনগণ মৃত্যুবরণের জন্য ছিল দৃঢ় সংকল্প, তারা এখন তাদের মৃত্যুর গান গাইতে শুরু করে প্রথমে উচ্চকণ্ঠে, কিন্তু গানের ধ্বনি ক্রমে নীচু থেকে নীচুতে নেমে আসতে থাকে, আগুন এবং ধোয়ায় তাদের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। অবশ্য আগুনের উপরে মৃত্যুবরণ এমন এক ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা- যা সহ্য করার ক্ষমতা সকলের নেই। সহসা একটি জ্বলন্ত গৃহের দরজা খুলে গেল। দরজার চৌকাঠে দাঁড়ানো একটি মানুষ। মুহূর্তের মধ্যে রুশদের কানের উপর দিয়ে ছুটে গেল শন্‌শন্ ধ্বনি তুলে একটি বুলেট এবং তরবারী নাচাতে নাচাতে চেচেন ঝাঁপিয়ে পড়লো তাদের উপর, তখন তার নগ্ন বক্ষ লক্ষ্য করে রুশরা গুলি ছোঁড়ে। চেচেনটি লাফ মেরে শূন্যে অনেক উপরে উঠে যায়, পড়ে গিয়ে আবার নিজের পায়ে দাঁড়ায় এবং সারা শরীর প্রলম্বিত করে ধীরে ধীরে সম্মুখে ঝুঁকে পড়ে এবং তার রক্তস্নাত জমিনে মৃত্যু মুখে ঢলে পড়ে। পাঁচ মিনিট পরে এ দৃশ্যটির পুনরাবৃত্তি ঘটে। সেও লাফ দিয়ে বেরিয়ে গুলি ছোঁড়ে এবং তরবারী নাচিয়ে শার্প শুটারদের

দুটি লাইন ভেদ করে অগ্রসর হয়, কিন্তু থার্ড লাইন থেকে তাকে বেয়নেট দিয়ে হত্যা করা হয়। জ্বলন্ত দেওয়াল ও গৃহগুলো ভেঙ্গে পড়তে লাগল, পদদলিত বাগিচার উপর ছড়িয়ে পড়ল আগুনের স্ফুলিঙ্গ। এই ধূম্রাচ্ছন্ন ধ্বংসাবশেষের মধ্য থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এলো ছয়জন ক্ষতবিক্ষত দাগিস্তানী; এদের এই জীবন্ত রক্ষা পাওয়ার ব্যাপারটি একটি অলৌকিক ব্যাপার বলে মনে হয়। রুশ ফৌজরা তাদেরকে নিয়ে এ্যাম্বুলেন্সে তুললো। চেচেনদের একজনও জীবিত ছিল না। ৭২ জন চেচেন আগুনে তাদের জীবন বিসর্জন দেয়।

এই রক্তাক্ত নাটকের শেষ অংক এভাবেই শেষ হলো। দৃশ্যের উপর নেমে এলো রাত্রির যবনিকা। প্রধান নায়কেরা চলে গেছে তাদের চিরস্থায়ী নিবাসে। অবশিষ্টরা কেবলমাত্র যারা দর্শক ছিল তাদের নিয়ে পাষাণ হৃদয়ে ফিরে গেল তাদের তাঁবুর আশ্রয়ে। হতে পারে একাধিক ব্যক্তি তার হৃদয়ের গভীরে এই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়- এমনটি কেন ঘটবে? পৃথিবীতে সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা আক্রান্ত না হয়ে যারা নিজেদের মতো বাঁচতে চায় এই পৃথিবীতে, তাদের জন্য, সেই সব স্বাধীনতাকামীর জন্য এই দুনিয়াতে কোন স্থানই নেই? রুশরা সবুজ উদ্যানকে লাল করে দিল মুসলিম রক্তে। চেচনিয়ার সুখের ঘরবাড়ীকে পরিণত করলো ধ্বংসস্তুপে। তবুও এই এলাকার লোকগীতির মধ্যে এখনও রুশদের বিরুদ্ধে হিংসার বীজ লক্ষ্য করা যায়। শহীদেরা মৃত্যুবরণ করে না, দাগিস্তানীদের দুঃসাহসী বক্ষে এখনও তারা বেঁচে আছে। তাদের প্রশংসায় গীত হয় গান এবং রমণীরা তাদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে সাহসী যুদ্ধের প্রেরণা জাগানোর জন্য এখনও তাদের দুঃসাহসী যুদ্ধের কাহিনী বর্ণনা করেন, যা বিগত শতকে পর্বতগুলোকে রক্ষা করেছিল রুশ ধ্বংসলীলা থেকে। এই চেতনার জন্য সাময়িকভাবে কেবলমাত্র ৮০টি গ্রামের বশ্যতা লাভ করে এবং ৬১টি গ্রামকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ফেলা হয়। এই যুদ্ধে রাশিয়ার একজন অফিসার ও ১৬ জন ফৌজ নিহত হয়। ১৮ জন অফিসার ও ৩৩ জন ফৌজ আহত হয়।

ঘিমড়ীর প্রতিরক্ষা

কাজী মুল্লা প্রস্থান করলেন দাগিস্তানে এবং ঈমাম শামিলের সাহায্য নিয়ে তিনি ঘিমড়ীর প্রতিরক্ষার প্রস্তুতি নিতে লাগলেন, কারণ তিনি আসন্ন বিপদ বুঝতে পেরেছিলেন। শাহাদাত বরণ করার জন্য তিনি ছিলেন উদগ্রীব।

এই ভয়াবহ অভিজ্ঞতার পর কাজী মুল্লা এবং ঈমাম শামিল প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা যে উচিত নয়- এ বিষয়ে রুশদের মুখোমুখি হয়ে তা বুঝতে পেরেছিলেন। ঘিমড়ীর ৫/৬ মাইল উজানে, কিন্তু পথ দু'টির মিলন স্থলের ভাটিতে এবং গভীর সংকীর্ণ উপত্যকাটির উপর তারা তিনটি প্রাচীর নির্মাণ করলেন। উভয় পার্শ্বে পাথর দিয়ে তৈরি হলা বুক সমান উঁচু বেষ্টনী। জায়গাটি

ছিল সুনির্বাচিত, তারা এই অবস্থানের প্রাকৃতিক শক্তির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন। বাইরের প্রাচীরের কাছে ছিল পাথরের তৈরী ছোট ঘর। রুশরা এগুলোর ব্যাপারে কোন মনযোগই দেয়নি। তারা কখনো ভাবেনি যে এগুলোর চারপার্শ্বে কেন্দ্রীভূত হবে ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধসমূহ।

পাথর নির্মিত সাকালিয়া বা গৃহ দু'টি দখল করেছিল ৬০ জন মুরীদের একটি দল, যারা মৃত্যু পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করবে বলে স্থির করেছিল অথবা যতক্ষণ না তারা আকস্মিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। যখন বাইরের প্রাচীরটি তাদের নিয়ন্ত্রণে এসে যায়- তখন রুশীদের মূল শক্তি সম্মুখে ধাবিত হয়। কিন্তু পরিখা খননকারীদের দু'টি দল সেখানে রয়ে গেল দু'টি পার্বত্য কামানসহ। ভেলিমিনোফ অজান্তেই সাকালিয়া বা গৃহগুলো সাফ করে ফেলার জন্য নির্দেশ দিলেন। কামান থেকে কয়েকবার গুলি বর্ষণের পর রুশ ফৌজ হামলা চালায়। প্রতিরক্ষাকারীরা কোন আশ্রয় প্রার্থনা করেনি অথবা আশ্রয় পায়নি। তারা একজন দু'জন করে বেরিয়ে এলো এবং বীরের মতো যুদ্ধ করতে করতে শাহাদাৎ বরণ করলো। তাদের মধ্যে কেবল দু'জন রেহাই পেয়ে যান। এই দু'জনের একজন ঈমাম শামিল। তিনি তার অসাধারণ শক্তি, ক্ষীপ্রতা এবং তরবারী চালনার বদৌলতে নিজের জান বাঁচাতে সক্ষম হন। তিনি ফৌজের পশ্চাৎ সারির উপর ঝাঁপ দিলেন একটা বাঘের মতো। ওরা তখন তিনি যে উঁচু দরজার পথে দাঁড়িয়েছিলেন, তার ফাঁক দিয়ে গুলি বর্ষণ করতে ছিল উদ্যত। তিনি ঘুরে তরবারীতে ঘূর্ণি তুলে আক্রমণ করে তাদের তিনজনকে হত্যা করলেন। কিন্তু চতুর্থজন তার বেয়নেট ঈমাম শামিলের বক্ষে বিদ্ধ করে। তখন তিনি বেয়নেটটি একহাতে ধরে বেয়টনধারীকে হত্যা করেন। এরপর তিনি তার বুক থেকে বেয়নেটটি টেনে বের করে জঙ্গলে অন্তর্ধান করলেন। বেয়নেটের ক্ষত ছাড়াও পাথরের আঘাতে তার পাঁজর এবং ঘাড় ভেঙ্গে যায়।

তিনদিন লুকিয়ে থাকার পর তিনি অন্টসকুলে পৌঁছেতে সক্ষম হন এবং সেখানে তিনি পড়ে থাকলেন পঁচিশ দিন। মৃত্যুর বিরুদ্ধে জীবন বাঁচানোর সংগ্রামে রুশ বেয়নেটটি সোজা তার একটি ফুসফুস ভেদ করে যায়। তার শ্বশুর আবদুল আজীজ ছিলেন একজন মশহুর সার্জেন। তিনিও আত্মগোপন করেছিলেন। তিনি ফিরে আসার পর মোম, আলকাতরা ও সমপরিমাণ মাখন মিশিয়ে একটি মিক্সার তৈরি করেন। এই মিক্সারের বদৌলতে তার ক্ষতগুলো বেশ ভালভাবেই সেরে যায়। দাগীস্তানের লোকেরা চিকিৎসা ক্ষেত্রে যদিও খুব পারদর্শী ছিল না, তবুও সার্জারীতে নিশ্চয় অভিজ্ঞ ছিল। কারণ তাদের ঘন ঘন যুদ্ধ করতে হতো। তারা সকল প্রকার ক্ষত অপারেশন করতে পারতো কিংগেলের সাহায্যে। এটি ছিল তাদের জাতীয় অস্ত্র। তারা সাধারণ আব্দুল আজীজের তৈরি মলম ব্যবহার করতো। রাশিয়ান অফিসাররাও তাদের কাছ থেকে সাহায্য চাইতো- যখন তাদের নিজস্ব সার্জেন্টগণ

ক্ষত সারাতে ব্যর্থ হতো। বলা হয়ে থাকে তারা এন্টিসেফটিক ব্যবহার করতো যদিও রুশ রোগ-জীবাণু সম্পর্কে তারা বেশী কিছু জানতো না।

কাজী মুল্লার শাহাদাৎ বরণ

ধ্বংসলীলার দৃশ্যের উপর সূর্যাস্তের পূর্বে একটি আবিষ্কারের আলোকে সেই মুহূর্তে শামিলের পরিত্রাণ জানা থাকলেও তা সামান্যই গুরুত্বপূর্ণ মনে হতো। ঘটনাটি অক্টোবর সন্ধ্যাকে মৃত্যুর শীতলতায় স্তব্ধ করে দেয়। যারা মৃত্যু ভয়ের মধ্যে পড়েছিলেন তাদের মধ্যে একজন ব্যক্তির রাজকীয় চেহারা ও শারীরিক গঠন সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দেখা যাচ্ছিল তিনি সালাত আদায় করছেন, একহাতে তরবারী ধারণ করে অন্যহাত আকাশের দিকে তুলে। যখন স্থানীয় কয়েকজন লোককে আহ্বান করা হলো মৃতদেহ সনাক্ত করার জন্য, তারা ভীষণ আতঙ্কিত হয়ে পড়ে এবং মাতম শুরু করে। তিনি তো আর কেউ নন- তাদের ঈমাম কাজী মুল্লা। তারা সকলে মিলে তার জন্য আহাজারী করতে থাকে। তারা বিশ্বাস করতে চাইলো না যে, ঈমাম কাজী মুল্লা নিহত হয়েছেন- ঠিক যেমন সৈয়দ আহমদ শহীদের সাথীরা বিশ্বাস করতে চাননি যে তিনি শাহাদাৎ বরণ করেছেন। তার লাশ নিয়ে যাওয়া হয় টারকুতে, শামখালের রাজধানী টারকু এবং সেখানে বোর্ণেয়াতে তাকে দাফন করা হয়। পরবর্তীকালে ঈমাম শামিল রাত্রিকালে দুশ' অশ্বরোহী পাঠিয়েছিলেন তার লাশটি কবর থেকে তুলে আনবার জন্য এবং তারা লাশটি ঘিমড়ীতে নিয়ে আসে।

সরকারীভাবে এই যুদ্ধে রাশিয়ার ক্ষয়ক্ষতি ছিল মৃত একজন অফিসার এবং চল্লিশজন সেপাহী; ১৯ জন অফিসার এবং ৩০০ জন সেপাহী; ১৮ জন অফিসার এবং ৫৩ জন সিপাহী ক্ষতবিক্ষত। একুনে ৪৫২ জন। যুদ্ধ ক্ষেত্রে মুরীদদের ১৯২ জন আত্মদান করেন।

কাজী মুল্লার যখন পতন হলো, ঈমাম শামিল তখন তার নিজের জান বাঁচানোর জন্য সংগ্রাম করে চলেছেন। সমগ্র মুরীদ আন্দোলন এক মহাসংকটের সম্মুখীন হলো। এই সময়ে হামজাদ বেগকে নতুন ঈমাম নির্বাচন করা হয়। তার সময়ে কোন গুরুত্বপূর্ণ অভিযান চালিত হয়নি। কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাও ঘটেনি। দুর্ভাগ্যক্রমে কতগুলো ষড়যন্ত্রকারী একটি মসজিদের ভিতরে হামজাদ বেগকে হত্যা করে। সেই মুহূর্তে ঈমাম শামিল ছিলেন খুনজাখ্ থেকে দূরে। তিনি হামজাদ বেগের হত্যার কথা জানতে পেরে একটি ফৌজ গঠন করে গোটসাটলে পৌঁছেন। সেখান থেকে তিনি অগ্রসর হন আশিলতার দিকে, যেখানে তাকে ঈমাম ঘোষণা করা হয়।

১. ১৭৮৯ সালে, খোনজাকের ১২ মাইল উত্তর-পূর্বদিকে নিউ গোটসাটলে হামজাদ বেগ জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা সেকান্দর ছিলেন সাহস ও বুদ্ধিমত্তার জন্য বিখ্যাত। তিনি বহুবার কাখেতির উপর হামলা চালান এবং আহমদ খান তাঁকে খুব উচ্চ সম্মান দিতেন। হামজাদ বেগ আরবী শিখেছিলেন। প্রথমে চোখ নামক স্থানে এবং পরবর্তীকালে খোনজাকে কোরআন অধ্যয়ন করেন। তার শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি মিশরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন। সেখানে কাজী মুল্লা তাকে সানন্দে গ্রহণ করেন এবং তিনি হয়ে উঠেন কাজী মুল্লার একজন চরম উৎসাহী এবং মূল্যবান সমর্থক।

অধ্যায় ঃ চার

ঈমাম শামিলের আমল

ঈমাম শামিলের আমলের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো ১৮৩৭ সনে জেনারেল ফিজের অভিযান। ৫২০০ সৈন্য নিয়ে গঠিত এই ফৌজ ১৮০টি ফিল্ড গান ও মর্টারসহ মে মাসের প্রথমদিকে এরোমা নদীর তীরে পৌঁছায়। এই ফৌজ যাত্রা করে তেমিরখান শূরা থেকে এবং ৫ দিন ২৭ মাইল অতিক্রম করে। সৈন্যবাহিনী মে মাসের শেষ দিকে খুনজাখ্ পৌঁছে। পথ যে কত কঠিন ছিল তা কল্পনা করা যায় এই বাস্তবতা থেকে যে, ১০০ মাইল অতিক্রম করতে তাদের ২০ দিন লাগে। খুনজাখের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা নেয়া হয়। এখানে চারটি কোম্পানী রেখে এবং ছটি কামান বাদে বাকী সমস্ত গোলা বারুদ এবং ভারী অস্ত্রশস্ত্র রেখে সজ্জিত করা হয়। অতঃপর জেনারেল ফিজে ৫ই জুন অণ্টসকুল এবং আশিলতা রওয়ানা করেন মাত্র দু'সপ্তাহের রেশন সঙ্গে নিয়ে।

রাশিয়ান ফৌজের উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে অণ্টসকুলের লোকরা আত্মসমর্পণ করে। তারা দলত্যাগী রুশ সেপাই ও বন্দীদের ফেরত দিতে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং যুদ্ধ বন্দীদের অর্পণ করে। দাগীস্তানের লোকদের বিরুদ্ধে এসব অভিযানে বেশ কিছু রুশ ফৌজ দল ত্যাগ করেছিল। স্থানীয় লোকদের সঙ্গে রাশিয়ানরা যেসব চুক্তি করে তার সবক'টির মধ্যেই এ ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত।

১৭ই জুন ঈমাম শামিল তাশাফ হাজী এবং কীবাত মোহুমা রুশ ফৌজের রাত্রি অবরোধ ভেঙ্গে ফেলার জন্য আক্রমণ করেন। এর ফলে একটি রক্তাক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যাতে দু'জন রুশ অফিসার এবং ৯২ জন সৈন্য নিহত হয় এবং তিজন অফিসার, ১৯৮৩ জন্য সৈন্য আহত হয়, প্রায় সমপরিমাণ ক্ষতি হয় মুরীদগণের। বীরের মতো আত্মরক্ষার সংগ্রামে ১০০ জন মুরীদ শাহাদাৎ বরণ করেন এবং বেশ কিছু সংখ্যক আহত হয়। দাগীস্তানে রুশ ফৌজের মোট লোকসংখ্যা ছিল ৫০০০ জন। এই বিবেচনায় রাশিয়ান ক্ষয়ক্ষতি হল বিপুল।

আশিলতার উপর আক্রমণ

৯ই জুন জেনারেল ফিজে অণ্টস্কুলের উজানে একটি মালভূমিতে তার সৈন্য সমাবেশ করেন এবং তাদেরকে আশিলতায় আক্রমণ করতে নির্দেশ দেন। মুরীদ ফৌজ বিটল নদীর বাম তীরে একটি দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করে। এই অবস্থানের দক্ষিণ দিকটা সুরক্ষিত ছিল উচ্চ পার্বত্য প্রাচীর দ্বারা। যে পল্লীতে তাদের

প্রতিরক্ষার প্রথম লাইন ছিল সেখান থেকে তারা বিতাড়িত হয়। পাহাড়ের পার্শ্বদেশ থেকে পার্শ্বদেশে এবং খাঁজ থেকে খাঁজে পিছু হটার সময় তারা প্রতিটি ইঞ্চি ভূমির জন্য লড়াই করে। আঙ্গুর কুঞ্জগুলো তাদের রক্তে রঞ্জিত হলো। তিন ঘন্টা ধরে যুদ্ধ চলে আঙ্গুর জমিন এবং ফলের বাগানের ভিতরে। পরিশেষে রুশীরা আশিলতার মুখোমুখি দাঁড়ালো। সেখানে বলা হয় কোরআন শপথ করে ২০০০ মুরীদ দন্ডায়মনা ছিল। তারা প্রয়োজনবোধে আশিলতার প্রতিরক্ষার জন্য জান কোরবানী দিবে। জেনারেল ফিজে তার ফৌজকে সমবেত করে পল্লীটির উপর হামলা করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। তিনি তার ফৌজকে তিনটি কলামে ভাগ করলেন। কেবল একটি ব্যাটালিয়ন এবং তিনটি কোম্পানীকে রাখলেন রিজার্ভ হিসেবে। তারা ভূমির কঠিন প্রকৃতির জন্য পিছনে পড়া গোলন্দাজদের প্রয়োজনবোধে রক্ষা করবে। অবশ্য কালবিলম্ব না করে দুইটি পার্বত্য কামান আনয়ন করা হয়। এ কামান দুটি আক্রমণে ব্যবহার করা হয়। বাদিকের কলামটি প্রথমে ঐ পল্লীতে পৌঁছে। কলামটি মরিয়া গুলিবর্ষণের সম্মুখীন হয়। নিজের অবস্থানে টিকে থাকা কলামটির জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কলামটির পশ্চাৎভাগ ঠেকেছিল একেবারে বামপ্রান্তে একটি শিলা প্রাচীরে। ইত্যবসরে একজন খুবই সাহসী অফিসার মেজর ফুচেজ এর সেনাপতিত্বে গ্রামের একেবারে দক্ষিণপ্রান্তে চাতালটিতে পৌঁছতে সক্ষম হয়। এতে বাম দিকের কলামের উপর চাপ কমে যায়। জেনারেল ফিজে এখন মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান গ্রহণ করেন। তখন প্রত্যেকটি পৃথক পৃথক সাকালিয়ার ভিতর অথবা চারপাশে হাতাহাতি যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় বিভিন্ন দলের মধ্যে। যুদ্ধের নির্দেশ কমান্ডিং অফিসারদের হাত থেকে সম্পূর্ণ চলে যায়। ব্যক্তিগত বীরত্ব এবং শক্তিই সিদ্ধান্তমূলক হয়ে উঠে। বীর মোজাহেদীন মরিয়া হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো রুশ সৈন্যের উপর এবং বেয়নেটে বিদ্ধ হয়ে প্রাণ বিসর্জন দিল। তার চাইতেও হৃদয়বিদারক দৃশ্য ছিল ঘরে ঘরে হত্যা। কেউই আশ্রয় প্রার্থনা করেনি, কোন লোক বন্দী হয়নি। জেনারেল ফিজে এই যুদ্ধের প্রত্যেকটি ঘটনার পিছনে ব্যক্তিগতভাবে নির্দেশ দেন। তাকে দেখা গেল তিনি তরবারী হাতে এই মুহূর্তে এখানে আছেন, পর মুহূর্তে অন্যত্র। অবশেষে বিকাল দুইটার দিকে রুশীরা আশিলতা দখল করে নেয় এবং গ্রামটিতে আগুন লাগিয়ে দেয়। কিন্তু কোন কোন গৃহে সন্ধ্যা পর্যন্ত নৃশংস হত্যা চলতে থাকে। গ্রাম থেকে বিতাড়িত হয়ে গ্রামটির পরে উচ্চ ভূমির উপর তারা জমায়েত হয় এবং পর পর ছয়বার আল্লাহু আকবর ধ্বনিতে উৎসাহিত হয়ে গ্রামটিকে পুনর্দখলের জন্য তারা রুশীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, কিন্তু তাদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। মুজাহিদীন এখন আনদী কৌসউতে আংশিক পশ্চাৎ অপসরণ করে চিনকাতের পুলটি পার হয় এবং পার হওয়ার পর পরই তারা পুলটি জ্বালিয়ে দেয়। তাই তারা তাদের পশ্চাদ্ধাবনকারীদের কোন সুযোগই দিল না। তাদের কেউ কেউ নদীটির দক্ষিণ

দিকে চলে যায় এবং তৃতীয় আর একটি দল আশ্রয় নিল পুরোনো আখুলগোতে। এই যুদ্ধে রুশীদের ২৮ জন লোক মারা যায় এবং আহত হয় ৯ জন অফিসার ও ১০৭ জন সেপাহী। একজন অফিসার এবং ৩৯ জন সেপাই ঘায়েল হয়। ৮৭ জন মুজাহিদীন শাহাদাৎ বরণ করেন। কিন্তু আগুনে পুড়ে ধ্বংস হওয়া ঘরগুলোতে যেসব লাশ পড়েছিল, সেগুলো গণনা করা যায়নি। তবে বলা হয়, বহু মৃত এবং আহতকে বহন করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

আশিলতা পল্লীটি এবং সেই মুহূর্তে গ্রীষ্মের বৈভবে উজ্জ্বল সুন্দর আঙ্গুর ও ফলের বাগানগুলো সম্পূর্ণ ধ্বংস করার পর ফিজে ইচ্ছা করলেন গার্গোবিলে তার অবস্থান গ্রহণ করবেন। কিন্তু তিনি রওয়ানা করার আগেই ইগালীতে সমবেত ১২০০০ মুজাহিদীন রুশীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাদেরকে ঘিরে ফেলার উপক্রম করে। ১৫ তারিখে কয়েকটি আক্রমণ ব্যর্থ করে দিতে তিনি সক্ষম হন। রাত্রিকালে তিনি আরো শক্তিশালী অবস্থানে সরে পড়েন। অবশ্য মুজাহিদীন তখনো তার পশ্চাৎধাবন করছিলো। লড়াইটি এতটা মুখোমুখি হয়ে চলছিল যে, গাদা বন্দুক ব্যবহার অর্থহীন হয়ে পড়লো প্রবল বর্ষণের কারণে। তখন উভয় পক্ষ পরস্পর পাথর ছোঁড়াছুঁড়ি করছিল। কেবল ১৬ তারিখের দুপুরে এই কৌশলপূর্ণ পশ্চাৎগতি সম্পূর্ণ হয় এবং রুশ ফৌজ দীর্ঘ ২৪ ঘন্টা নিরবচ্ছিন্ন লড়াইয়ের পর তার নতুন অবস্থানে সমবেত হয়। তিনটি নতুন রুশ কোম্পানি যারা ঘিমড়ীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা করছিল, কালবিলম্ব না করে তাদেরকে ফেরৎ আনা হয়। তখন মুজাহিদীন ইগালীতে সরে গিয়ে হওয়া হয়ে যায়। এই যুদ্ধে রাশিয়ানরা একজন অফিসার ও ৩২ জন ফৌজকে হারায় এবং ৬ জন অফিসার ও ১২৮ জন সিপাহী আহত হয়।

তিলিতির উপর রুশ আক্রমণ

ফিজে অন্টসকুলে সরে পড়লেন। এখানে তিনি নতুন রসদ পেলেন। তিলিতি পৌঁছলেন ২৬ তারিখে এবং ঈমাম শামিল যেখানে আত্মরক্ষার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিলেন সেখানে রুশ ফৌজের সঙ্গে মিলিত হন। তিলিতি আশিলতার চাইতে কিছুটা বৃহৎ একটি গ্রাম ছিল। তাদের ছিল ৬০০ ঘরবাড়ী এবং বেশ মজবুত ছিল গ্রামটি। এটি নির্মিত ছিল একটি পাথরের প্লাটফর্মের উপর। এর একপার্শ্বে রক্ষিত ছিল একটি খাড়ির দ্বারা। আর বাকী তিনদিক দিয়ে ওখানে পৌঁছানোর জন্য একমাত্র পথ ছিল খাড়া এবং উঁচু শিলারাজি। দাগীস্তানের একটি পল্লীর প্রতিরক্ষার জন্য এর সুযোগ-সুবিধা ছিল অসাধারণ উত্তম। এর কমপক্ষে নয়টি সুরক্ষিত টাওয়ার ছিল। হালকা ফেলকোনেট জাতীয় এর কামানও ছিল। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই রুশীদের উন্নতমানের আর্টিলারী ফায়ারের আঘাতে টাওয়ারগুলো এবং অনেকগুলো ঘরবাড়ী ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় এবং একটি আক্রমণকারী দল ধূম উদগীরণকারী ধ্বংসস্তুপগুলো দখল করে। এতে তাদের একজন অফিসার এবং ২৭

জন সিপাহী নিহত হয় এবং একজন অফিসার ও ৫০ জন সৈন্য আহত হয়। যখন খবর পাওয়া গেল ঈমাম শামিলের রিলিফের জন্য নতুন মুজাহিদীন দল সমবেত হচ্ছে, তখন ৫ই জুলাই ফিজে হুকুম দিলেন সর্বাত্মক আক্রমণের। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণ শুরু হয় এবং সৈন্যরা গ্রামটিতে পৌঁছার পর আশিলতায় যে বীভৎস কান্ড ঘটেছিল- তারই পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল। রুশীরা গ্রামটির উপরের অংশ দখল করে। কিন্তু মুজাহিদীনের দখলে ছিল তখনও গ্রামটির নীচের অংশ। যখন দেখা গেল রুশীদের বিজয় নিশ্চিত, তখন ঈমাম শামিল যুদ্ধ বিরতি প্রার্থনা করে তার প্রতিনিধি পাঠালেন। ফিজে তাদের কঠিন যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত অবস্থান থেকে তার সৈন্যদের প্রত্যাহার করেন এবং তাদের সমাবেশ করেন একটি উঁচু অবস্থানে। ৩ থেকে ৬ই জুলাই পর্যন্ত যে যুদ্ধ চলে তাতে ৫ জন অফিসার এবং ৬০ জন সৈন্য মারা যায়, ২০৩ জন অফিসার এবং ২০৩ জন সৈন্য জখম হয়, আরও কিছু ঘায়েল হয়। দুইদিন ধরে আলাপ-আলোচনা চলে। শেষে ঈমাম শামিল ফিজের জন্য একটি চিঠি পাঠান। কিন্তু রাশিয়ান কমান্ডারের জন্য চিঠির ভাষা সুলিখিত ছিল না। যদিও তিনি তখন পশ্চাৎ অপসরণ করেছিলেন, তবুও তিনি অনুরোধ করে পাঠালেন এই চিঠির বদলে উপযুক্ত ভাষায় লেখা একটি চিঠি পাঠাবেন। শামিল আর একটি চিঠি লিখতে রাজী হলেন। কিন্তু ইত্যবসরে পরিস্থিতি তার নিয়ন্ত্রণে এসে যায়। তাই দ্বিতীয় চিঠিটি বিষয়বস্তু এবং ধরণের দিক দিয়ে পূর্ববর্তী চিঠি থেকে খুব একটা ভিন্ন হলো না। জেনারেল ফিজে কর্তৃক এই চিঠিগুলো গ্রহণ যাতে ঈমাম শামিলের সঙ্গে শান্তিচুক্তির সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ হয়- এ ছিল একটি রাজনৈতিক বিজয়। কেননা এতে করে শত্রু সম্প্রদায়গুলোর কাছে রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় প্রধান হিসেবে তাঁর পদবী স্বীকৃত হয়।

ফিজের নিকট শামিলের চিঠি

॥ ১ ॥

ঈমাম শামিল, তাশোফ হাজী, কীবাত মোহোমা, কারাখীর আব্দুর রহমান, মোহাম্মদ উমর ওগ্‌লি এবং দাগীস্তানের অন্যান্য সম্মানিত ব্যক্তিত্ব ও আলিমদের পক্ষ থেকে। মোহাম্মদ মির্জা খানের নিকট জিম্মি রেখে আমরা রুশ সম্রাটের সঙ্গে একটা শান্তিচুক্তি করেছিলাম। আমরা কেউই তা ভঙ্গ করবো না এই শর্তে যে- দুই পক্ষের কেউ অন্য পক্ষের ক্ষতি করবো না। যদি কোন দল তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে, তা বিশ্বাসঘাতকতা বলে গণ্য হবে এবং ঘাতকরা আল্লাহর কাছে ও তার জাতির কাছে অভিশপ্ত। এই চিঠিটি আমাদের ইচ্ছার পূর্ণ আন্তরিকতা ব্যাখ্যা করে।

॥ ২ ॥

এই চিঠিটি রুশ সম্রাট ও শামিলের মধ্যে শান্তিচুক্তির ব্যাখ্যা করে। এই শান্তিচুক্তিতে দেখা যায়- শামিলের পক্ষ থেকে মির্জা খানের নিকট ঈমাম শামিলের

পক্ষে তার চাচাতো ভাইকে জিম্মি রূপে অর্পণ করা হয়। কীবীত মোহোমার পক্ষে তার চাচাতো ভাইকে জিম্মি রাখা হয় তার ভাগ্নের উপস্থিতির পূর্ব পর্যন্ত এবং কারাখীর আব্দুর রহমানের পক্ষে তার পুত্রকে এই ভরসায় যে- শান্তি যেন স্থায়ী হতে পারে। এই শর্তে যে, দুই পক্ষের কোন পক্ষই একে অন্যের ক্ষতি করবে না কিংবা একে অন্যের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। কারণ বিশ্বাসঘাতকরা আল্লাহ এবং মানুষের কাছে অভিশপ্ত।

রুশ ক্ষয়ক্ষতি

আসলে এই পত্র দু'টি কেবলমাত্র একটি উসিলা হিসেবে ফিজে গ্রহণ করেন। আসলে যুদ্ধ বিরতি করতে তিনি বাধ্য হয়েছিলেন। কারণ তার এক্সপিডিশনারী দলগুলো সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছিল। অফিসার ও সৈন্য-সমান্তরা মারা গেল অনেক এবং অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদের অভাব দেখা দিয়েছিল। অভিযানের শুরু থেকে মারা যায়, আহত হয়, অসুস্থ অবস্থায় এবং রোগে ভুগে মৃত্যুবরণ করেন চারজন স্টাফ, ২৬ জন অন্যান্য অফিসার যাদের মধ্যে ১৪ জন কোম্পানীর কমান্ডার এবং ১০০০ জনের মতো সিপাহী। বিপুল সংখ্যক যুদ্ধের ঘোড়াও মারা যায় এবং যেগুলো বেঁচেছিল সেগুলোও এক পা'র পিছনে আর এক পা টানতে পারছিল না। তাদের ১০টি পার্বত্য কামানের মধ্যে ৫টি অচল হয়ে পড়ে। ওয়াগনসমূহ, স্থানীয় লোকদের থেকে পাহাড়ে ব্যবহারের জন্য সংগৃহীত দুই চাকার গাড়ীগুলো (আর্বাস) প্রায় সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। সিপাহীদের ইউনিফর্ম এবং বোর্ড ছিঁড়ে যায়। তারা ছেঁড়া কাপড় পরতে বাধ্য হয়। গোলাবারুদও কমে গিয়েছিল বিপুলভাবে।

জেনারেল ফিজে ছিলেন এক মহান কলম্বাস। তিনি অভিযানের এমন রিপোর্ট তৈরী করেছিলেন যেন স্বল্পকালের জন্য তিনি প্রচুর খ্যাতির অধিকারী হন। যেন সেন্ট পিটার্সবার্গের কর্তৃপক্ষ তাকে একজন দুর্বার কমান্ডার বলে গণ্য করেন এবং তারা যেন আবার এই কল্পনা করেন যে, মুরিদিজম এখন একটি মৃত শক্তি এবং দাগীস্তানে রুশ প্রভুত্ব এখন সুপ্রতিষ্ঠিত। ক্লুগেনু নিশ্চয়ই গম্ভীর হাসি হেসেছিলেন যখন তিনি সুরায় প্রত্যাবর্তন করে সত্য জানতে পারলেন। তার মনের ভাব অনুমান করা যায়, যখন দেখা যায় ফিজের বিজয়ী অভিযানের পর তাকে আহ্বান করা হয় ঈমাম শামিলকে তিফলিসে রওয়ানা করতে উদ্বুদ্ধ করতে এবং সম্রাটের প্রতি বশ্যতা স্বীকার করতে তাকে বাধ্য করতে।

আশিলতা অভিযানের পরবর্তী ঘটনা

আশিলতার পরাজয়ে রাশিয়ার সম্মান ভয়ানকভাবে বিনষ্ট হয়। তিলিতি থেকে প্রত্যাবর্তন উপযুক্ত মুহূর্তে করা হয় সম্পূর্ণ বিপর্যয় থেকে বাঁচার জন্য। পরবর্তী ঘটনাবলী থেকে যা পরিষ্কারভাবে দেখা যায় এই অভিযান ঈমাম শামিলের প্রভাব

ধ্বংস করতে পারেনি, বরং তা দশগুণ বাড়িয়ে দেয়। রাশিয়ানরা তাদের পশ্চাতে রেখে যায় আশিলতার বিধ্বস্ত বাগ-বাগিচা ও ধুমায়িত ধ্বংসাবশেষের মধ্যে হিংসা ও শত্রুতার এক উত্তরাধিকার। এই দু'টি চিঠির প্রথম চিঠিটি পাবার পর জেনারেল ফিজে তিলিতি থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করেন। তখন গ্রামের অর্ধেক অংশ তার দখলে এবং একটি রাস্তা দিয়ে ঈমাম শামিলের পরামর্শ মতো জেনারেল ফিজে তার সৈন্য সামন্ত নিয়ে সরে পড়েন। এতে স্পষ্ট বুঝা যায় ঈমাম শামিল সুবিধাজনক অবস্থানে ছিলেন এবং রুশ শক্তি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে পড়েছিল। ঈমাম শামিল আশিলতায় ফিরে গেলেন, জনমানব শূন্য দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে তার মনের অবস্থা কি হয়েছিল কল্পনা করা যায় এক সময়ের সমৃদ্ধিশালী গ্রামটি এখন কৃষ্ণবর্ণের ধ্বংসাবশেষ মাত্র। ৫০০ ঘরের একটিও দাঁড়িয়ে ছিল না, এমনকি মসজিদটিও রক্ষা পেল না, যেখানে তিন বছর আগে তিনি ঈমাম ঘোষিত হয়েছিলেন- "আমি দেখলাম, ওহ্, কোন লোকজন নেই এবং আকাশের সব পাখি উড়ে পালিয়েছে এবং এককালের জলজ্যান্ত স্থানটি এখন জনবসতিশূন্য প্রান্তর।" আঙ্গুর লতাগুলো ছিন্নভিন্ন, গাছপালা কেটে বিছিয়ে দেয়া হয়েছিল, রুশীদের পদতলে ভুট্টার ক্ষেত দলিত হয়েছে- যেন শামিলের বর্তমান প্রভাব থেকে যায়। আক্রমণকারীরা যারা তার বিবেচনাই করলো না, আল্লাহর ঘরকে ধূলিস্যাৎ করে দিল। তারা ফলন্ত শস্য ধ্বংস করে ফেললো। তাদের ক্রোধ ছিল জমিনের ফলমূলের উপর এবং তারা বুঝতে পারছিল না এর পরিণাম এখনও দৃশ্যমান নয়। ঈমাম এরপর চলে গেলেন আখুলগোতে এবং অভিজ্ঞতায় শিক্ষিত হয়ে তার প্রকৃতির সমস্ত শক্তি নিয়ে এটিকে একটি দুর্ভেদ্য স্থানে পরিণত করার উদ্দেশ্যে।

নিকোলাসের উপস্থিতি

সেই বছরই শরৎকালে সম্রাট নিকোলাসের ককেশাস পরিদর্শনে আসার কথা। রাশিয়ানরা তাদের সম্মুখে যে বিপদ রয়েছে- তার সামান্যই কল্পনা করতে পেরেছিল। তারা ভেবেছিল সম্রাটের আগমণ তাদের ককেশাস বিজয়ের উৎসব পালনের একটি বিষয় হবে। অবশ্য এই উদ্দেশ্যে ঈমাম শামিলের আত্মসমর্পণ লাভ ছিল আবশ্যক এবং গোপন ও অত্যন্ত জরুরি নির্দেশনামা পাঠান হলো প্রধান সেনাপতি জেনারেল ফিজের নিটক, যেন সম্ভাব্য সব উপায় প্রয়োগ করে ঈমামকে রাস্তার কোন এক বিন্দুতে, ভাল হয় তিফলিসে নিকোলাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে রাজী করানো হয় এবং ঈমাম যেন তখন তার অতীত অপরাধের জন্য মাফ চান– যা সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জুর করা হবে এবং ভবিষ্যতে যেন তিনি সদাচারণের নিশ্চয়তা দেন। ফিজে তখন ছিলেন দক্ষিণ দাগীস্তানে। তিনি এই আপোষ আলোচনার জন্য দায়িত্ব অর্পণ করলেন ক্লুগেনোর উপরে। ক্লুগেনো তার ব্যক্তিগত বীরত্ব এবং

সামরিক দক্ষতার জন্য যেমন বিখ্যাত ছিলেন তেমনি স্থানীয় বাসিন্দাদের সম্পকে তার জ্ঞান ছিল নিবিড়।

ঈমামের সঙ্গে ক্লুগেনোর সাক্ষাৎ

সম্ভবত এ ধরনের একটি নাজুক ও কঠিন উদ্যোগে তার সাফল্য সম্পর্কে ক্লুগেনোর কোন অলীক ধারণা ছিল না। কিন্তু সম্রাটের আদেশ পালন করতে তিনি কারানাইয়ের বেগদের মাধ্যমে একটি চিঠি পাঠালেন- তিনি ঈমাম শামিলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান এবং ঈমাম শামিল সাক্ষাতের সময় ঠিক করলেন দুইদিন পর, একটি বিশেষ নহরের কাছে। আর ১৮ই সেপ্টেম্বরের সকালে ক্লুগেনো কেবলমাত্র ইয়েভদোকিমোফকে সঙ্গে পথ দেখানোর জন্য নিলেন, ডন নদীর তীরবর্তী বাসিন্দা ১৫ জন কোসাক এবং বন্ধু ভাবাপন্ন কারানাইক গ্রাম থেকে ১০ জন স্থানীয় লোক নিয়ে অশ্বপৃষ্ঠে সেই নহরের তীরে পৌছলেন। সেখানে গিয়ে দেখতে পেলেন পুরাপুরি সুসজ্জিত ২০০ ঘোড় সওয়ার নিয়ে ঈমাম সেখানে অপেক্ষা করছেন। রুশ নেতা তার পথপ্রদর্শকদের পিছনে রেখে ছোট একটি উঁচু জায়গায় অবস্থান গ্রহণ করলেন কেবলমাত্র একজন দোভাষী সঙ্গে নিয়ে এবং ঈমামকে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য এগিয়ে আসতে অনুরোধ করলেন। ঈমাম কয়েকজন মুরীদের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু নিকটবর্তী হওয়ার পর মুরীদগণ আর অগ্রসর হলো না। কেবল ঈমাম শামিল অগ্রসর হলেন তার বিশ্বস্ত তিনজন ভক্তকে নিয়ে। মহাশক্তিশালী জারের প্রতিনিধি এবং গেরিলা নেতা নিজ নিজ ঘোড়ায় বসে মুখোমুখি হলেন। তারা ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন, দৃশ্যটি ছিল অদ্ভুত। একদিকে রুশ সিপাহীদের একজন তরুণ এডজুটেন্ট নেতৃত্ব করছিলেন, এই এডজুটেন্টটি মুজাহিদীনের সঙ্গে মোকাবিলায় তার মুখে একটি আঘাত পায়। পক্ষান্তরে দলবদ্ধ মুজাহিদীনের পরণে ছিল সুন্দর বর্ণাঢ্য জোব্বা।

রুশ দূত ঈমাম শামিলকে কনভিন্স করার জন্য তার যুক্তির সমস্ত ক্ষমতা খাটানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু ঈমাম তাকে সোজা ভাষায় বললেন, তিনি তার লোকদের সঙ্গে প্রথম আলোচনা না করে চূড়ান্ত কথা দিতে পারছেন না। তবে একটা বিষয় নিশ্চিত যে, আত্মসমর্পণের কোন প্রশ্নই উঠে না।

একটি অপ্রীতিকর ঘটনা

বিকাল প্রায় তিনটার সময় ঈমাম শামিলকে এই পয়েন্টে অনমনীয় দেখে ক্লুগেনো তার নিজের পায়ের উপর দাঁড়িয়ে গেলেন। ঈমামও তাই করলেন এবং রুশ দূত তার হাত প্রসারিত করলেন বিদায় নেবার জন্য। কিন্তু শামিল তার হাতে রুশ দূতের হাত নেবার আগেই সবচেয়ে নিবেদিত মুরীদদের একজন সুরখাই খান তার বাহুতে ধরে ফেলেন। তিনি চোখে ঝিলিক তুলে বলে উঠেন- মুজাহিদীনের নেতার

পক্ষে শোভন নয় একজন Giaour-এর হাত স্পর্শ করা। ক্লুগেনো তার মিশনের ব্যর্থতায় ইতিমধ্যেই ত্যক্ত বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। তার ফলে যেসব লোকজন দ্রুত ঘেরাও করার জন্য ছুটে আসছিল, তাদেরকে তিনি পিছু হটতে বললেন এবং ক্লুগেনোকে বললেন বিলম্ব না করে সরে পড়তে। ক্লুগেনো রাগে দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে গালাগালি করতে শুরু করলেন। কিন্তু ঈমাম কেবল নিজকেই সংযত করলেন না, তার সঙ্গীদেরও সংযত করলেন। ক্লুগেনোর এডিসি তাকে তার কোটের ঝুল ধরে টানতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত ক্লুগেনোকে সরে পড়তে রাজি করায়। ক্লুগেনো কোন চেষ্টারই বাকী রাখলেন না। তিনি ঈমাম শামিলকে দীর্ঘ একটি চিঠি লিখলেন সম্রাটের ইচ্ছাকে মান্য করার তাগিদ দিয়ে। কিন্তু এবার জবাবটা হলো সংক্ষিপ্ত এবং চূড়ান্ত। "এই পত্রের দরিদ্র লেখক শামিলের তরফ থেকে, যে সমস্ত কিছুই সমর্পণ করেছে আল্লাহর হাতে- ২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮, আপনাকে জানাচ্ছি যে, আমি তিফলিসে যাব না বলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এই আহ্বান প্রত্যাখ্যান করার জন্য আমাকে যদি কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলা হয় তবুও। কারণ আপনাদের বিশ্বাসঘাতকতার অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে বহুবার এবং সকল মানুষ তা জানে।"

ঈমাম শামিল এরপর আর একটি মোকাবেলার জন্য ভেঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে পড়া মুরীদদের ফৌজকে পুনর্গঠনের জন্য তার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করলেন। তিনি জানতেন, এটাই শেষ রাস্তা নয়। ভিন্ন ভিন্ন কাবিলা এবং গোত্রের বন্ধনকে সুদৃঢ় করার জন্য তিনি রাতদিন কাজ করে চললেন। তিনি আখূলগোর খাড়া সুউচ্চ পাহাড়গুলোর উপর তার দুর্গগুলো নির্মাণ করতে শুরু করলেন। এতে করে তিনি এতটা ক্ষমতা ও শক্তি অর্জন করলেন যে, ১৮৩৯ সালে রুশ সরকার এই সিদ্ধান্তে আসে "শেষ পর্যন্ত ঈমাম শামিলের ক্রমবর্ধমান শক্তির বিরুদ্ধে চূড়ান্ত কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। এখন আন্দি এবং গোম্বেতসহ আভারিয়ার চারপাশের সকল স্বাধীন সম্প্রদায় ঈমাম শামিলের কর্তৃত্ব স্বীকার করে নিয়েছে।"

ব্যারোন রজেন এবার জেনারেল গ্লোভিনে কর্তৃক কমান্ডার-ইন-চীফ হলেন। কাউন্ট গ্রাবির অধীনে স্থাপন করা হলো পূর্বপার্শ্বের গোটা সামরিক শক্তি এবং উত্তর দাগীস্তানের সৈন্যদল, পূর্বপার্শ্বে ৬০০০ সৈন্য মে মাসের ১ তারিখের মধ্যে ভিনেজপনাইয়াতে সমবেত হয় আখ্তাস নদীর তীরে। উত্তর দাগীস্তানে ৩০০ সৈন্য সমবেত হলো পক্ষকাল পরে তিখিরখান শরাতে। প্রথমে তারা পরিকল্পনা করে ঈমাম শামিলের বিরুদ্ধে দাগীস্তানে সম্মিলিত অভিযান চালাবে এবং শরৎকালে চেচনিয়া আক্রমণ করবে, কেননা বৃক্ষলতা শূন্য পর্বতগুলোতে গ্রীষ্মকালে বছরের অন্য সময়ের চাইতে অভিযান চালানো অধিকতর সহজ এবং এর বিপরীতটি হচ্ছে সত্য- চেচনিয়ার ক্ষেত্রে। কারণ চেচনিয়া ঘন অরণ্যাদি আচ্ছাদিত পর্বতমালা এবং

উপত্যকায় সমাকীর্ণ। কিন্তু ঈমাম শামিলের ফৌজের সুদক্ষ বিন্যাস রুশ কমান্ডারের সমস্ত প্ল্যান বানচাল করে দেয়।

মুজাহিদীনের প্রতিরক্ষা

তাশফ হাজী, সুরখাই ও আলীবেগের নেতৃত্বে আগত দাগীস্তান মুরীদদের যোগদানে শক্তিশালী হয়ে নিজের জন্য একটি ছোট অথচ মজবুত কাঠের ব্লকের সাহায্যে একটি গৃহ নির্মাণ করেন, মিচকিতের নিকটবর্তী গভীর অরণ্যে, আহমদ কালাতে। এটি ছিল আখছাই নদীর তীরবর্তী একটি পল্লী। তিনি নিকট ও দূরের চেচেনদের সমবেত করে কৌমিক এবং দাগীস্তানের দিকে ধাবিত ভিনেজপনাইয়ার যে কোন ফৌজের পশ্চাৎভাগকে আক্রমণ করতে উদ্যত হলেন। ঈমাম শামিল নিজে গোম্বেতের আর্গূয়ানী নামক একটি সুরক্ষিত স্থানে অবস্থান গ্রহণ করলেন এবং বর্তূনাইর লোকজনকে আশ্বাস দিলেন অগ্রসর হতে এবং স্নাতু নামক স্থানে রুশ ফৌজের মোকাবেলা করতে। এই অবস্থায় রুশ ফৌজের অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর ছিল না, উত্তরের সঙ্গে সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা না করে এবং কৌমিক প্রান্তরের নিরাপত্তার ব্যবস্থা প্রথমে না করে। এ জন্য হাজী তাশোফের সুরক্ষিত অবস্থানে তাদের আক্রমণ করতে হয়। ঈমাম নির্দেশ দিলেন কঠিন প্রতিরোধ না করতে। এই কারণে তার ফৌজ অক্ষুণ্ন রয়ে গেল। পক্ষান্তরে পশ্চাৎ অপসরণ করতে গিয়ে রাশিয়ানদের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়।

তিলিতি এবং দাগীস্তানের আরো বহু পল্লীর মতই আর্গূয়ানী ছিল একটি মজবুত সুরক্ষিত স্থান- কেবলমাত্র প্রচুর রক্তের বিনিময়েই তা দখল করা যেত। দুঃসাহসী পার্বত্যবাসীদের জন্য রাশিয়ানদের মানুষ হিসেবে দয়া ও মহানুভবতা ছিল সামান্যই এবং আর্গূয়ানীতেই ককেশাসের ইতিহাসের সবচাইতে রক্তাক্ত সংগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়।

সকাল নয়টায় গ্রামটির অধিকাংশ স্থান রুশ ফৌজ ইতিমধ্যে দখল করে নিয়েছে। এমন কি বাড়ীঘরগুলোর যে সমতল ছাদে অবস্থান করে মুরীদরা তখনও আত্মরক্ষার সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিল সেখানে রক্তপাত চলল সমস্ত দিন। সন্ধ্যা পর্যন্ত সাকালিয়া থেকে মুরীদদের তাড়াবার একমাত্র উপায় ছিল ছাদ ভেঙ্গে ছিদ্র তৈরী করা এবং সেই ছিদ্র পথে জ্বলন্ত আগুন নিক্ষেপ করা, যাতে করে ঘরের কড়িকাঠগুলোতে আগুন ধরে যায়। তা সত্ত্বেও বহু ঘন্টা ধরে তারা অবস্থান করে তাদের গৃহে। যদিও মাঝে মাঝে তারা ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ার উপায় উদ্ভাবন করে এবং সেই ভাঙ্গা পথ দিয়ে চুপি চুপি তারা এক বসতি থেকে আরেক বসতিতে চলে যা। কিন্তু বহু লাশ পাওয়া গেল আগুনে সম্পূর্ণ দগ্ধীভূত। তাদের অবস্থানগত সুবিধা সত্ত্বেও তারা রুশ ফৌজের বিপুল ক্ষতি করে চলে। তাদের মধ্যে যারা সবচেয়ে সাহসী

তারা কয়েকটি কাফেলাকে ধ্বংস করতে পারলেই খুশী হতো। তারা তাদের তরবারী এবং কিঞ্জাল নিয়ে মুখোমুখি লড়াই করে এবং যতক্ষণ না রুশ বেয়নেট তাদের জীবন প্রদীপ নির্বাপিত করে দেয় কেউ কেউ কোন অস্ত্র ছাড়াই এক ডজন রুশ ফৌজের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কেবলমাত্র ১৫ জন লোক যারা একটি সাকালিয়াতে ধূঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে মারা যাচ্ছিল, কারণ রুশরা হাতবোমা নিক্ষেপ করেছিল, ঐ সাকালিয়ায় কেবলমাত্র ১৫ জনই আত্মসমর্পণ করে; এইসব ঘরে ঢুকবার চেষ্টা করে বহু রুশ সৈন্য মারা যায়। কিন্তু ক্ষয়ক্ষতি হলো অনেক বেশি। রাস্তাগুলো ব্লক করে দেয় শহীদেরা, যারা রুশ বেয়নেটের ছায়ায় বেঁচে থাকার চাইতে মৃত্যুবরণ করাকে অধিকতর সম্মানজনক মনে করেছিল।

যখন রাত এলো, তখনও গ্রামের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল মুজাহিদীনের হাতে, বিশেষ করে একটি টাওয়ার, যা পল্লীটির পূর্ব প্রান্তে বহুতলা দালান থেকে উঁচু ছিল, তা রুশ ফৌজদের বহু বিপত্তির কারণ ঘটায়। তাদের পদাতিক বাহিনীর সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হয় এবং যখন সন্ধ্যা হল, তারা ভয়াবহ কষ্টের সঙ্গে দুটি পার্বত্য ও কসাক কামান টেনে উপরে তুলতে সক্ষম হয় এবং সেগুলো নিকটবর্তী গৃহগুলোর সমতল ছাদের উপর বসায়, একটি পথ উন্মুক্ত করার জন্য। এমনকি তবুও মুজাহিদীন আত্মসমর্পণ করলো না। রাত্রিবেলা পল্লী থেকে, বিশেষ করে তখন পর্যন্ত মুজাহিদীনের দখলে বিদ্যমান গৃহগুলো থেকে পালাবার সকল পথ বন্ধ করার জন্য রুশ ফৌজ রাত্রিকালে কঠিন ব্যবস্থা অবলম্বন করে। আসলে তারা রাত্রিরই প্রতীক্ষা করছিল। অন্ধকার নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে ক্যাম্পগুলোতে যখন নীরবতা নেমে এল, তখন তারা গোপন পথ দিয়ে বেরিয়ে আসে এবং বিভিন্ন দিকে পালিয়ে যায়।

তাই আর্গূয়ানীর যুদ্ধ ৩০শে মে বিকাল ৪টা থেকে ১লা জুনের সূর্যোদয় পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে। রুশীরা মারা যায় ১৪৬ জন ৬ জন অফিসারসহ এবং আহত হয় ৫০০ জন- যাদের মধ্যে ৩০০ জন ছিল অফিসার। অন্যদিকে মুজাহিদীন একটি ভয়ানক পরাজয়ের সম্মুখীন হয়। ৫০০০ লাশ রয়ে গেল রুশ ফৌজের হাতে। তার মধ্যে ৩০০ জনই একটি গলিতে, যেখানে রুশ অশ্বারোহী বাহিনী তাদের আক্রমণ করেছিল। নিহত ও আহত সংখ্যা মুজাহিদীনের ছিল মোটমাট ২০০০, কোন কোন গ্রাম থেকে একজন লোকও ফিরে এলো না। সমস্ত গ্রামটিকে পুড়িয়ে ভষ্মীভূত করে দেয়া হয় এবং নিষ্ঠুর রুশ ফৌজ ঘরবাড়ীগুলোকে ধ্বংস করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়।

জুন মাসের ২০ তারিখে লাবীন্তসেফের নেতৃত্বে, যিনি পুল্লোর সঙ্গে মেজর জেনারেল র‍্যাংকে উন্নীত হয়েছিলেন, একটি দ্রুতগামী কলাম আশিলতার বিপরীত

দিকে চিন্‌কাতে প্রবেশ করে দেখতে পায় স্থানটি পরিত্যক্ত। কিন্তু আন্দিকৌশুর উপর পুলটি অধিবাসীরা পুড়িয়ে দিয়েছিল এবং গ্রাবির ফৌজের অবস্থা বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। কারণ ভিনেজাপনাইয়াতে তার মূল অবস্থান থেকে এর যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। অন্যদিকে নতুন কেন্দ্র শোরার সঙ্গে সংবাদ আবাদপ্রদান করতে সক্ষম ছিল না এবং ইত্যবসরে রসদ প্রায় সম্পূর্ণ শেষ হয়ে আসে এবং চতুর্দিকের সারা অঞ্চলই হয়ে ওঠে সম্পূর্ণ শত্রুভাবাপন্ন।

রাশিয়ানরা উত্তরপ্রান্তে তোহিরকেইর ভিতর দিয়ে শূরার সঙ্গে সংবাদ আদান-প্রদানের একটি উপায় খুঁজে বের করার জন্য চেষ্টা করে। কিন্তু ঐ পল্লীটির লোকজন যারা ঈমামের সমর্থক ছিল, রাশিয়ানদের সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ করে দেয়। এই জরুরি অবস্থায় দুটি ব্যাটালিয়ন ও সমস্ত ঘোড়সওয়ার বাহিনীসহ কর্ণেল ক্যাটেনাইনকে ৬ তারিখ সকাল বেলা প্রেরণ করা হয়, সাগরিতলের পুলটি দখল করার জন্য, যা ছিল ইগালী থেকে ৫ মাইল নিকটবর্তী, কিন্তু সেখানে পৌঁছানোর পথ ছিল অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল। তিনি বিকাল তিনটায় সেখানে পৌঁছে দেখতে পান মুজাহিদগণ তা ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে। নিকটেই কয়েকটি ঘরবাড়ী ছিল, সেখান থেকে ঘরের ভীমগুলো টেনে বের করে পুলটি আবার মেরামত করে পারাপারের উপযোগী করা হয়। রাত্রির মধ্যে নদীর দুই তীরই চলে গেল রাশিয়ানদের দখলে এবং পরদিন ক্যাটেনাইন কুচকাওয়াজ করে রওয়ানা হলেন আশিলতা। ১০ তারিখে কয়েক বস্তা বিস্কুট নদীর উপর রশিতে ঝুলিয়ে দেয়া হয় বাম তীরের ক্ষুধার্ত সিপাইদের জন্য। ১১ তারিখ সন্ধ্যার ভিতরে চিনকাতের পুলটি পুনঃনির্মিত হয় বাড়ীর ভীমগুলো খুলে নিয়ে এবং পেরেকের অভাবে সেগুলোকে লতা দিয়ে বেঁধে গ্রাবি তার কমান্ডের বৃহত্তম অংশটিকে নিয়ে নদী পার হলেন এবং আশিলতার চত্বরগুলো দখল করলেন। বাকী সৈন্যরা আখুলগোর বিপরীতে নদীর তীরে অবস্থান গ্রহণ করলো। ব্রীজ পাহারা দেবার জন্য যাদেরকে রাখা হয়েছিল, তারা বাদে সকলেই এভাবে এই যুদ্ধে সবচাইতে বিখ্যাত অবরোধের মুখোমুখি হয়।

আখুলগো দখল

ঈমাম শামিল নারী-শিশুসহ ৪০০০ লোকের বসতি, আখুলগোতে বেষ্টিত হয়ে পড়লেন। সম্পূর্ণভাবে কিংবা আংশিকভাবে মৃত্তিকার নীচে তৈরী গৃহে, এমনকি গুহার ভিতরে তাদেরকে রাখা হয়েছিল এবং যোদ্ধা পুরুষদের সংখ্যা এক-চতুর্থাংশের বেশী ছিল না। এখানেই ঈমাম শামিলের প্রধান দুর্বলতা। কারণ সবাইকেই খাবার যোগন দিতে হতো। অবরোধ চলার এক পর্যায়ে রসদের অভাব ঘটলো। এদিকে শুরু থেকেই পানি আনতে হতো টিলার অধোভাগে অবস্থিত নদী থেকে। সেখানে পৌঁছান যেতো কেবল খাড়ির নীচে দুর্গম পথ দিয়ে কয়েকশত

ফিট গভীরে। অবস্থাটি পরিস্কার বুঝা যাবে এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা ও বিভিন্ন সেকশনের আলোকে। দেখা যাবে- আন্দিকৌসো এখানে এসে একটি বাঁক সৃষ্টি করেছে এবং এ বাঁক মোটামুটি একটি বর্গক্ষেত্রের তিনটি দিক বেষ্টন করেছে। এই বর্গক্ষেত্রটিতে অনিয়মিতভাবে ছেদ করেছে আশিলতা নদী, বিটলের সঙ্গে মিলিত হবার পর। এই বর্গক্ষেত্রটির দক্ষিন অর্ধাংশ বা মধ্যাংশটির চাইতে উঁচু- দক্ষিণ অর্ধাংশটির নাম নতুন আখুলগো এবং দ্বিতীয় অর্ধাংশটির নাম পুরানো আখুলগো। কিন্তু দুটি আন্দিকৌসো থেকে কয়েকশ' ফিট উপরে অবস্থিত। আন্দিকৌসো নদীটি খাড়া, অধোভাগে বর্গক্ষেত্রটির তিনপার্শ্ব স্পর্শ করে অগ্রসর হয়েছে, স্থানে স্থানে সোজা এমন কি ঝুলন্ত ক্লিফের নীচে। নতুন আখুলগোতে প্রবেশ পথ বাধাগ্রস্থ এবং সমগ্র উচ্চভূমিটি পাহারা দিচ্ছিল সুরখাইয়ের টাওয়ার। আশিলতা থেকে পুরনো আখুলগোতে পৌঁছানো যেত ছুরির মতো ধারালো একটি পথ দিয়ে অথবা নুতন আখুলগোতে পৌঁছান যেত একটি গভীর সংকীর্ণ খাত দিয়ে, ডাবল সমতল ভূমির নীচে কিছুটা দূরে যেখানে এই সরু পথটি দুইদিক থেকে এসে মিলিত হয়েছে। সুরখাইয়ের টাওয়ার, যাকে বলা যায় টিলার উপর কতগুলো মজবুত গৃহের সমষ্টি- যেখান থেকে টিলাটির উপর নজর রাখা যায়। এই টাওয়ারটি ছিল আলীবেগের দায়িত্বে। আলীবেগ ছিলেন ঈমাম শামিলের সবচেয়ে দুঃসাহসী লেফটেন্যান্টদের অন্যতম। তার অধীনে ছিল ১০০০ মুজাহিদের একটি গ্যারিসন, যারা অতুলনীয় সাহস এবং তাদের দায়িত্ব পালনের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞার জন্য পরিচিত ছিলেন- এই সব বীর পুরষদের কয়েকজন প্রত্যেকদিন রাত্রিকালে আশিলতার একেবারে কিনারে অবতরণ করতেন এবং রুশ শার্প শুটারদের গুলির মুখে তাদের কমরেডদের জন্য পানি নিয়ে আসতেন। সুরখাই তখন ছিলেন ইগালিতে। তিনি ঈমাম শামিলের প্রতি সেই গুরুত্বপূর্ণ পল্লীর বাসিন্দাদের আনুগত্য অবিচল রাখতে চেষ্টা করছিলেন। একইরূপে দায়িত্ব নিয়ে আখওয়ারদি মহুমা ছিলেন বগুলিয়ান জেলায় এবং ক্যালবেটস আন্দিতে, কেননা রাশিয়ানদের সাফল্যে এইসব লোকের অনেকেই ইতিমধ্যে ভয়ে কম্পমান হয়ে উঠেছিল- তাদেরকে ব্রিজের উপর ছেড়ে দিলে তারা হয়ত আত্মসমর্পণ করে বসতো।

রুশ ফৌজ

শোরাহ থেকে রশদ, বন্দুক, কামান পাহারা দেবার জন্য কনভয় প্রেরিত হবার পর গ্রাবির কমান্ডে এখন ফৌজের সংখ্যা দাঁড়াল ৯ ব্যাটালিয়ন। কিন্তু যুদ্ধবিগ্রহ এবং রোগব্যাধিতে এমন ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হলো যে, যুদ্ধ করার মতো ৬০০০ পরিখা খননের জন্য এক কোম্পানী সৈন্যসহ এর বেশি লোক ছিল না এবং মিলিশিয়ার সংখ্যা দাঁড়ালো ৩৬০০ তে। রুশ কমান্ডার শীঘ্রই বুঝতে পারলেন যে, এই ফৌজ নিয়ে সবদিক থেকে অবরোধ বজায় রাখার আশা তিনি করতে পারেন না।

অধিকন্তু আন্দিকৈশোর নদীর বাম তীরে তিন ব্যাটালিয়ন ফৌজসমূহ বিপদের সম্মুখীন হয়ে পড়েছে- এর মধ্যে একটি ব্যাটালিয়ন চীন্‌কাতের ব্রীজের নিকটে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এবং অন্য দুটি ব্যাটালিয়ন তখন অবস্থান করছিল, আখুলগোর বিপরীতে নদীর ভাটিতে। তাই ১৪ তারিখে তিনি তাদের প্রত্যাহার করেন নদীর দক্ষিণ তীরে এবং কিছু সময়ের জন্য কেবলমাত্র সেই দিকেই অবরোধ করে চললেন। এতে করে ঈমাম শামিলের অবস্থা অনেকটা উন্নত হয়, কারণ একস্থানে কৈসো নদী এতটা সংকীণ ছিল যে, তিনি মাত্র কয়েকটা তক্তা দিয়ে তার উপর একটি ব্রীজ তৈরি করতে পারতেন। অবরোধের প্রথম এবং তৃতীয় মেয়াদকালে তার পক্ষে সম্ভব হলো তার রসদ পুনরায় সংগ্রহ করা এবং লোকজনের যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা পূরণ করা এবং আখ্‌ওয়ারদি মোহুমা, সুরখাই ও তার দূরবর্তী কমরেডদের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা চালু রাখতে।

এই অবস্থায় গ্রাবি গলোভিনের কাছে নতুন ফৌজ সরবরাহ ও রসদ প্রেরণের জন্য আবেদন করেন। সামোর অভিযান ইতিমধ্যেই সমাপ্ত হয়েছে। এখন রুশ কমান্ডার-ইন-চীফ আখুলগোতে ৪টি কামান এবং প্রচুর গোলাবারুদসহ ৩টি নতুন ব্যাটালিয়ন পাঠাতে সক্ষম হলেন। অবরোধকারী সৈন্যদের সঙ্গে এরা যোগাযোগের পর মোট ফৌজের সংখ্যা দাঁড়ালো ১২,০০০ জনে। ১২ই জুলাই এই নতুন ফৌজ যোগ দেয়।

এর মধ্যে আখওয়ারদি মোহুমা, সুরখাই এবং ক্যালবাত ঈমামকে সাহায্য করার জন্য একটি বিশাল ফৌজ গড়ে তুলতে সক্ষম হলেন। ১৮ ও ১৯শে জুনের মধ্যবর্তী রাত্রিতে আখওয়ারদি মোহুমা কোন সাড়া শব্দ না করে আশিলতার ব্রীজটি দখল করে ফেলেন এবং সেখানেই কায়েম হয়ে বসার ব্যবস্থা করলেন। এই দিকে বেখবর রুশ হেডকোয়ার্টারের স্টাফ তখন ঈমাম শামিলের দৃঢ় অবস্থানের মোকাবেলায় শত্রুর অবস্থান জানার জন্য তথ্যানুসন্ধানের অভিযানে ব্যস্ত ছিল। তাদের জন্য বিপদ ছিল ভয়াবহ। আখ্‌ওয়ারদি মোহুমা যদি এই সুযোগ গ্রহণ করতেন, তাহলে যুদ্ধক্ষেত্রে সমস্ত পরিকল্পনাই একটি ভিন্ন মোড় নিত। দুর্ভাগ্যক্রমে আখওয়ারদি মোহুমা এই সুবিধাজনক অবস্থানটি কাজে লাগাতে পারলেন না।

মুজাহিদীনের আক্রমণ

২০ তারিখের সকালে মুরীদরা যখন আক্রমণের জন্য তৈরী হলো, তারা তা শুরু করলো কোরআনুল কারীম থেকে উচ্চকণ্ঠে তেলাওয়াতের মাধ্যমে এবং তারা অগ্রসর হবার সঙ্গে সঙ্গেই গোলগুলি ছুটতে লাগলো। এতে রাশিয়ানরা সতর্ক হয়ে যথাসময়ে নিজেদের জমায়েত করতে সক্ষম হয়। গ্রাবি তার ফৌজের একটি অংশ নিয়েই আক্রমণ শুরু করলেন। ঢালু এলাকাটির উপর হামলা চালানো হল। ফলে

মুজাহিদীন সেখান থেকে সরে সার্গিতল এবং ইগালিতে চলে যেতে বাধ্য হয়। এখন রুশ কমান্ডার ঈমাম শামিলকে অবরুদ্ধ করে রাখার জন্য জেনারেল গেলাফিয়েফকে রেখে নিজে ৪ ব্যাটালিয়ন ফৌজ ও ৪টি কামান নিয়ে সার্গিতল ও ইগালির দিকে ধাবিত হলেন। এই দু'টি স্থানে মুরীদরা পুরো অবরোধকালে নজর রাখার জন্য কিছু ফৌজকে রেখেছিল। যে রকমটি আশা করা গিয়েছিল, তেমনিভাবে ঈমাম শামিল হামলা চালানোর জন্য অবরোধকারী সৈন্যদের একটি অংশের অনুপস্থিতির কারণে লাভবান হন। কিন্তু তা সফল হয়নি। অবরোধ ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে থাকে। ৬টি ব্যাটারী দাঁড় করানো হয়। তাছাড়া এই পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন গ্রামগুলোর মধ্যে একটি পথ বিদ্যমান ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিককালে, আতারকুইশো যেখানে গুপ্ত ক্লিফের নীচ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে, সেখানে রাস্তাটি ধ্বংস হয়ে যায়। গ্রাবি এক কোম্পানী পদাতিক ফৌজ পাঠালেন, রাস্তাটি মেরামত ও প্রশস্ত করার জন্য। কিন্তু অসুবিধা এতই বেশী ছিল যে, কাজটি সম্পন্ন করতে ২৭শে জুন থেকে ২১শে আগস্ট পর্যন্ত সময় লেগে যায়। ঈমাম শামিলের জীবনের এই সঙ্কটকালে ঘিমড়ীর লোকরা তাকে সামান্যই সাহায্য করে। আন্দিকৈসো নদীর বাম তীর দিয়ে যতক্ষণ যোগাযোগ ব্যবস্থা মুক্ত ছিল, তারা তাঁকে উৎসাহিত করে এবং তাদের কেউ কেউ তাঁর ফৌজে যোগদান করে। কিন্তু অধিকাংশ বাসিন্দাই প্রত্যক্ষ মোকাবেলা থেকে বিরত থাকে- শেষ পর্যন্ত যখন উলুবেগকে তাদের উপর সম্পূর্ণ ক্ষমতাসহ Prestatf নিযুক্ত করলেন, তখন তারা তার কর্তৃত্বের নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং শুরার সঙ্গে অবাধ ও নিরবিচ্ছিন্ন যোগাযোগের সুযোগ করে দেয়। কুফার লোকদের মতই তাদের অন্তর ছিল ঈমাম শামিলের পক্ষে, কিন্তু তাদের তরবারী তারা ব্যবহার করেছে রুশদের পক্ষে।

সুরখাইয়ের টাওয়ার

এখন সুরখাইয়ের টিলার সঙ্গে নতুন আখুলগোর সংযোগ স্থাপিত হলো দুটি অংশের মধ্যবর্তী একটি সংকীর্ণ, উঁচু রাস্তার দ্বারা– যা এতই সংকীর্ণ যে, একবারে কেবলমাত্র একজন মানুষ পার হতে পারে। এই দিকে অবরোধ অভিযান ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত এক রাত্রিতে অন্ধকারের আবরণে একটি কোম্পানী এই পথটির শেষ প্রান্তে অবস্থিত একটি সুরক্ষিত স্থান দখল করে নিতে সক্ষম হয়। এরপর টিলাটিকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলা হয়। কিন্তু দুঃসাহসী আত্মরক্ষার যুদ্ধে বেপরোয়া মুজাহিদীন প্রত্যেক রাতে নীচে অবতরণ করতো পানির জন্য বিটলে। যতদিন এই টাওয়ারটি মুজাহিদীনদের হাতে ছিল, রাশিয়ানরা ততদিন এই গ্রামটি দখল করতে পারেনি। তখন গ্রাবি আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিলেন। জুন মাসের ভোরবেলা সুরখাইয়ের টাওয়ারের উপর রুশ ব্যাটারী গোলাবর্ষণ শুরু করে সকাল ৯.০০টার সময়। কৌরিন রেজিমেন্টের দুটি ব্যাটারী টিলার ভূমিতলের

দিকে ধাবিত হয়। রুশ সেচ্ছাসেবকরা টিলার খাড়া পাশ দিয়ে সম্মুখ দিকে ধাবিত হয়, তাদের উপর অনবরত পাথর এবং কড়ি-কাঠ নিক্ষেপ করা হলেও তারা দ্রুত আরোহণ করতে সক্ষম হয়। কিন্তু টিলার শীর্ষভাগে ছিল কয়েকটি উঁচু ঝুলন্ত ভারী শিলাখন্ড। অবশ্য রুশ ফৌজ সেখানেও থামলো না। পর্যায়ক্রমে একে অন্যের ঘাড়ে চড়ে তারা শীর্ষদেশে পৌঁছানোর চেষ্টা করলো। কিন্তু কিনারায়, উপরে দূর্গের প্রাচীরের ঠিক নীচে আত্মরক্ষাকারী মুরীদদের নজরে যে সৈন্যই পড়লো, সে প্রত্যুত্তরে পাথর ছুঁড়ে মারতে মারতে সরে পড়লো।

রুশ ফৌজের কাজকে একটু হালকা করার আশায় ব্যাটারীগুলো থেমে থেমে গোলাবর্ষণ করে। প্রত্যেক আক্রমণের পরই নীচে এসে পড়লো বিপুল পরিমাণ ভাঙ্গা টুকরা এবং পাথর কড়ি-কাঠ বর্ষিত হলো আক্রমণকারীদের উপর। কিন্তু ধুলাবালির যে কলাম উঠলো- তা কেবলমাত্র কিছুক্ষণের জন্যই দুঃসাহসী মুরীদদের অবয়বকে আবৃত করে রাখে। যে মুহূর্তে রুশ স্বেচ্ছাসেবকরা একটি খাড়া পার্শ দিয়ে আবার উপরে উঠতে ধাবিত হলো, সেই মুহূর্তে মুজাহেদীন দুর্গের ভিতর থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে পড়ে পাথর এবং কড়ি-কাঠ ছুঁড়ে মারে ওদের উপর। এই মরণপণ যুদ্ধ ইতিমধ্যে কয়েক ঘন্টা ধরে চলেছে। এক কোম্পানীর পরে এল অন্য কোম্পানী। বিকাল ৪.০০টার দিকে কাবারদার দুটি রেজিমেন্ট প্রেরিত হয় আক্রমণের জন্য। কিন্তু সমস্ত রুশ চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যায়। কেবল রাত এলে রুশ কমান্ডারের নির্দেশে রুশ ফৌজ রক্তাক্ত টিলা থেকে সরে পড়ে। সারাদিনব্যাপী যে যুদ্ধ চললো, তা ব্যর্থ হলো এবং তাতে রুশ ক্ষয়ক্ষতি হলো ৩০০ জন। এর মধ্যে ২ জন অফিসার এবং ৩৪ জন সেপাই নিহত হয়।

আক্রমণ ব্যর্থ হলো বটে, কিন্তু ঈমাম শামিলের তাতে প্রভূত ক্ষতি হলো। কারণ বীর পুরুষ আলীবেগ তার ১০০ বীর যোদ্ধাদের অনেকের সঙ্গেই নিহত হলেন।

রাশিয়ানারা আরো গোলন্দাজ বাহিনী গঠন করে এবং সম্প্রতি যেসব নতুন ফিল্ডগান এসেছে, সেগুলো আসার পর তারা আবার আক্রমণ শুরু করে। ৪ঠা জুলাই দুর্গটির উপর আবার বোমাবর্ষণ করা হয় এবং কামানগুলো সুবিধাজনক স্থানে স্থাপন করার পর সেগুলোর পাল্লা ছিল অনেক। অল্প সময়ের মধ্যেই দুর্গটি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়– যাতে বীর ডিফেন্ডারগণ আক্ষরিক অর্থেই সমাধিস্থ হয়েছে মনে হলো। কিন্তু যখনই আক্রমণকারীরা শীর্ষে পৌঁছানোর জন্য চেষ্টা করলো, নির্ভীক মুরীদরা আবার লাফিয়ে পড়ে প্রাচীরের ভগ্নাংশের উপর এবং আবার পাথর ও কড়ি কাঠ নিক্ষেপ করে তাদের উপর। রাশিয়ানরা বুঝতে পারলো নতুন কৌশল অবলম্বন না করে সাফল্যের সঙ্গে স্থানটিকে কাবু করা যাবে না। তখন তারা সমগ্র ফৌজ থেকে স্বেচ্ছাসেবীর জন্য আহ্বান করে। এই ২০০ সৈন্যকে রাত্রির অন্ধকারের আবরণে আনা হয় এবং তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয় রাত্রিকালে অপেক্ষা করতে।

এদিকে এ সময়ের মধ্যে গোলন্দাজরা তাদের ধ্বংসলীলা চালিয়ে যায়, যতক্ষণ না আত্মরক্ষাকারীদের বেশীরভাগ অংশ মৃত্যুবরণ করলো বা ধ্বংসাশেষের নীচে সমাধিস্থ হলো। যে অল্পসংখ্যক লোক বেঁচেছিল, তারা বুঝতে পারলো নতুন কোন চেষ্টা অর্থহীন এবং রাত্রির অন্ধকার আবরণে তারা নতুন আখুলগোতে পৌঁছতে চেষ্টা করলো। আক্রমণকারীরা অবশেষে দুর্গের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ঢুকতে পারলো এবং সেখানে তারা মাত্র কয়েকজন আহত মুজাহিদকে দেখতে পেল। এবারে রাশিয়ানদের ক্ষয়ক্ষতি হলো ১২ জন নিহত। একজন অফিসারসহ এক ডজন আহত। এখন অবরোধকারীদের কাজ সহজতর হয়ে পড়লো। কারণ দুর্গ থেকে তাদের উপর আর গোলাগুলি বর্ষণ করা হচ্ছে না। তারা বিভিন্ন দিকে তাদের কাজ নিয়ে এগিয়ে গেল। নতুন নতুন গোলন্দাজ বাহিনী গঠন করা হলো- যেখান থেকে শত্রুর দুর্গের উপর পার্বত্য কামানও ব্যবহার করা যেত। সুরখাইয়ের টিলার সম্মুখে ব্রীজগুলোর উপরিভাগ একটা পুরো ব্যাটালিয়ন দখল করে রাখে দুটি বন্দুকসহ। দুটি নতুন ব্যাটারীসহ আর একটি ব্যাটালিয়ন পূর্বদিকে কৈসূর দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয় এবং বিটল ও আশিলতার মধ্যবর্তী শৈলান্তরিপের উপর দুটি ব্যাটালিয়ন পূর্বদিকে কৈসূর প্রবাহের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয় এবং বিটল ও আশিলতার মধ্যবর্তী শৈলান্তরিপের উপর দুটি ব্যাটালিয়নকে মোতায়েন করা হয় একটি নতুন চার কামানের গোলন্দাজসহ। নতুন অবস্থানে বিশেষ করে টিলার সম্মুখবর্তী রীজে পৌঁছানোর পথে অগ্রসর হতে গিয়ে রুশ ফৌজ ভীষণ অসুবিধার সম্মুখীন হলো। দুই স্থানে মই ব্যবহার করা হয় এবং অন্যস্থানে যেখানে ছিল ১৪০ ফিটের একটি খাত সেখানে কপিকলের সাহায্যে কামানগুলো নীচে নামান হলো এবং লোকজনকে নামানো হলো বাসকেটের মধ্যে করে, এই সময়টাতে অন্ধকারের আবরণে মুজাহিদগণ অবিরাম অবরোধকারী সৈন্যদের উপর আক্রমণ চালায়। এতে বাধা দেয়ার জন্য সারারাত গোলন্দাজদের গুলি বর্ষণ চলতে থাকে। ১২ তারিখে দক্ষিণ দাগীস্তান থেকে নতুন ফৌজ এসে যোগ দিল এবং তাদের লং মার্চের পর তিনদিনের বিশ্রাম দিয়ে গ্রাবি চিন্তাভাবনা করে দেখলেন যে, অবরোধ এমন এক পর্যায়ে এসেছে, যখন আখুলগো সহজেই আক্রমণ করা যায়। তিনি এই মর্মে তার ফৌজকে ১৬ই জুলাই নির্দেশ দিলেন, গুপ্তচররা গ্যারিসনের যে চিত্র বর্ণনা করলো, তা চরম হতাশাজনক। ওরা এখন সংখ্যায় খুব কমে গেছে। এই বৃক্ষলতা শূন্য শিলাভূমির উপর গ্রীষ্মের রোদ্রে পুড়ে ওরা দুর্বল হয়ে পড়েছে। তাদের সঙ্গে গরু-ছাগল নাই। কারণ গরু-ছাগলের ঘাস নেই, তারা লাকড়ির অভাবে তাদের খাদ্য তৈরী করতে পারছে না। অনবরত গোলাবর্ষণ দ্বারা তাড়িত হয়ে তারা গুহার গহ্বরে আত্মগোপন করেছে। ক্লান্তি এবং অনাহারে ওরা জরাজীর্ণ। তারা বিপদের পর বিপদের সম্মুখীন এবং তারা শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করছে পঁচনশীল লাশের গন্ধে

দূষিত আবহাওয়ায়। এই অবস্থায় বলা যেতে পারে আখুলগোর অধিবাসীরা বড় রকমের কোন প্রতিরোধ গড়ে তুলতে আর সক্ষম হয়। তারা এও বললো যে, ঈমাম শামিল নিজেই পলায়নের কথা ভাবছেন। কিন্তু ঘটনায় প্রমাণিত হয় যে, স্থানীয় গুপ্তচরবৃন্দ এবং রুশ কমান্ডার তাদের শত্রুর সাহস ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞার অবমূল্যায়ন করেছে।

তিনটি কলামের সাহায্যে আক্রমণ পরিচালিত হয়। তার মধ্যে সবচাইতে শক্তিশালী কলামটি ব্যারন র‍্যাংগেলের সেনাপতিত্বে তিনটি ব্যাটালিয়ন নিয়ে আখুলগোর বিরুদ্ধে নতুনভাবে আক্রমণ করার জন্য নির্দেশিত হয়। দ্বিতীয় লাইনটি এক ব্যাটালিয়ন ফৌজ নিয়ে কর্ণেল প্রপোভের নেতৃত্বে পুরানো আখুলগোর দিকে ধাবিত হয়। তৃতীয় কলামটি, যার নেতৃত্বে ছিলেন তারাস্‌বিচ্‌, তাতে ছিল দেড় ব্যাটালিয়ন ফৌজ, তারা আশিলতার গিরিখাত দিয়ে নেমে শৈলান্তরীপের দুটি অংশের মধ্যবর্তী ফাক দিয়ে প্রবেশ করবে এবং সেখান থেকে মুজাহিদীন ফৌজের মিলিত হওয়া বন্ধ করবার চেষ্টা করবে এবং অন্যান্য কলামগুলো সফল হলে তারা সম্ভব হলে খাড়া পাহাড়গুলোর গা' বেয়ে উপরে উঠবে এবং বাকি অবস্থানগুলো দখল করতে সাহায্য করবে। ভোর থেকে বিকাল ২.০০টা পর্যন্ত গোলন্দাজ বাহিনীর প্রস্তুতি চলে। এরপর ফৌজকে অবস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু তখন বিকাল ৫টা। আক্রমণের জন্য র‍্যাংগেলের সংকেত দেওয়ার আগেই ৫টা অতিক্রান্ত হয়েছে। কলাম তৎক্ষণাৎ একজন একজন করে সংকীর্ণ রীজ দিয়ে নিম্নে ধাবিত হয় এবং রীজের গা বেয়ে ঝুলানো মই দিয়ে উঠে প্লাটফর্মটি আক্রমণ করে, যা মুজাহিদীন দখল করে রেখেছিল। কিন্তু এখানে একটি অপ্রত্যাশিত বাধার সম্মুখীন হয় তারা। রীজ বরাবর দ্বিতীয় একটি গভীর ক্ষুদিত স্থানে পৌঁছলে দুটি গোপন ব্লক গৃহ থেকে ক্রস ফায়ার ছুটে আসে। মুহূর্তের মধ্যে কলামটির অবস্থান সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। একটি ক্ষুদ্র সমতল স্থানে ৬০০ সৈন্য এখন অবিরাম আগুনের সম্মুখীন হয়। তাদের সামনেই একটি অনতিক্রম্য খাত, দুই পার্শ্বে প্রপাত বা খাড়াপিঠ এবং পশ্চাতে নির্গমণের একটি পথ, যা এত সংকীর্ণ যে কেবল একজন মানুষ একসঙ্গে একবারে তা অতিক্রম করতে পারে এবং তাও এরই মধ্যেই আহত লোকজনের দ্বারা প্রায় অবরুদ্ধ, তারা সামনে এগুতে পারছিল না এবং পশ্চাতে সরতেও পারছিল না। অল্প সময়ের মধ্যে তাদের একজন অফিসারও বেঁচে রইল না। প্রত্যেকে নিহত বা আহত হয়েছে কিংবা শিলার উপর থেকে পড়ে গেছে। রাশিয়ানদের সৌভাগ্য বলতে হবে যে, দিনের অন্তিমকাল আগত হওয়ায় শীঘ্রই অন্ধকার নেমে আসে। তা না হলে একজন মানুষও বেঁচে থাকতে পারতো না।

বাকী কলামগুলো, যেগুলোর লক্ষ্য ছিল মুজাহিদীনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং হামলা চালানো হয়, তারা বলতে গেলে কিছুই করেনি। তারাসেবিসের

সেনাপতিত্বে খাতের ভিতরে নীচে প্রবেশ করার পর বামদিকে পুরনো আখুলগো থেকে আক্রমণের সম্মুখীন হয় এবং দক্ষিণ দিকের ক্লিফ থেকে শিলা ও পাথর বর্ষণ শুরু হয়। এই অবস্থায় যখন দেখা গেল মেইন কলামটি ব্যর্থ হয়েছে, ইহা পিছু হটে গেল, তৃতীয় কলামটি পুরনো আখুলগোর উপর মারাত্মক কোন আক্রমণ করলো না। রাত্রির অন্ধকারে তিনটি কলাম তাদের যাত্রাপথের শুরুতে আবার ফিরে আসে। এই আক্রমণ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। রাশিয়ানদের ক্ষয়ক্ষতি হয় বিপুল। তাদের মোট ১৫৬ জন লোক মারা যায়। তার মধ্যে অফিসার ছিল ৭ জন। ৪৫ জন অফিসারসহ ৭১৯ জন জখম হয়। তুলনামূলকভাবে ডিফেন্ডারদের ক্ষয়ক্ষতি হয় কম। মোটামাট ১৫০ জন শাহাদাতবরণ করেন। এদের মধ্যে তাদের সবচাইতে সাহসী বীর পুরুষদের কয়েকজন ছিলেন। মুজাহিদীন বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। কয়েকজন মহিলা পুরুষের পোশাক পরে সম্মুখবর্তী স্থানে সাহসের সঙ্গে লড়াই করেন। রুশ কমান্ডার বহু বিপর্যয় এবং বিপুল প্রাণহানির সম্মুখীন হন, তবু তিনি বেপরোয়াভাবে তার অবস্থানে টিকে থাকলেন। কখন তিনি তার ফৌজকে সরিয়ে নিতে এবং অবরোধকারীদের নিজ দায়িত্বে ছেড়ে দিতে পারবেন তা চিন্তা করলেন না। তার অহংকার ধূলিস্যাৎ হলেও তিনি তখনও পরাজয় স্বীকার করতে রাজী ছিলেন না। তার অহমিকা তাকে অবরোধ চালিয়ে যেতে বাধ্য করতে পারতো, কিন্তু গুরুতর রাজনৈতিক এবং সামরিক সংকট তাতে জড়িত ছিল। ঈমাম শামিলকে তার নিজের উপর ছেড়ে দিলে রুশ মর্যাদা সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যেত এবং আর কখনও ককেশাসে তাদের সৈন্য প্রেরণের সাহস থাকতো না। তাছাড়া ধনজনের সকল ক্ষতি একেবারেই অপচয় হতো এবং মুরিদীনদের পতাকা দাগীস্তানে এবং চেচনিয়ার সর্বত্র উচ্চে উড্ডীন হতো।

জেনারেল গ্রাবির নতুন পরিকল্পনা

রুশ কমান্ডার মারাত্মকভাবে পরাজিত হন। পরাজয়ের কারণ সম্পর্কে চিন্তা করতে গিয়ে গ্রাবি দেখতে পেলেন, গ্যারিসন যতদিন বহির্বিশ্বের সঙ্গে তার যোগাযোগ খোলা রাখতে পারবে, ততদিন রুশ বিজয়ের আশা নেই। গুপ্তচরেরা সংবাদ আনলো যে, আক্রমণের পরদিনই তাহিরকেই এবং বিভিন্ন গ্রামের প্রান্ত থেকে আরও ১০০ জন লোক ঈমাম শামিলের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। গ্রাবি নিজে দেখতে পেলেন নতুন করে বারুদ এবং রসদের সরবরাহ রোজই আসছে এবং গ্যারিসনের জন্য একই রকম গুরুত্বপূর্ণ ছিল অসুস্থ এবং আহত লোকদেরকে কৈসুর উপর দিয়ে বয়ে নিয়ে যাওয়া। অন্যদিকে সাম্প্রতিক ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও রুশ ফৌজ উল্লেখযোগ্যভাবে নতুন সৈন্যের আগমণে শক্তিশালী হয়েছে। তাদের আক্রমণ আরও মজবুত করা হয়েছে এবং আরও উন্নত হয়েছে। সুরখাইয়ের দুর্গের আর

অস্তিত্বই ছিল না। তিনি স্থির করলেন আবার নদী পার হয়ে আক্রমণ করবেন। কিন্তু তা করা এক সহজ বিষয় ছিল না। কারণ চিনকাতের পুলটি ধ্বংস করে ফেলা হয়েছিল। এবং সাগ্‌রিতলের পুলটি এখন শত্রুদের হাতে।

খোঁজ-খবর ও তথ্যানুসন্ধান করে কয়েকদিন কেটে গেল। এটি ছিল একটি ভান যে, তারা পুরাতন আখুলগোর উপর একটি নতুন সেতু তৈরী করতে যাচ্ছে। এতে শত্রুর মনোযোগ তাদের উপর থেকে তথা তাদের আসল উদ্দেশ্য থেকে দূরে সরে পড়ে। ৩রা আগস্টের সন্ধ্যায় চিনকাত বরাবর তিন কোম্পানী ফৌজ মোতায়েন করা হয়। পুরনো সেতুর স্তম্ভগুলো সরানো হলো না এবং শীঘ্রই নদীটি মোটামুটি প্রস্তুত সেতুর দ্বারা দুই পাড়ের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা হলো তাদের আসল উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। সেতুটি ছিল বেশ মজবুত। ৪ তারিখে আভর এবং মেখটুলি মিলিশিয়াদের নিয়ে দুই ব্যাটালিয়ন ফৌজ বাম তীর পার হয়ে মুরীদদের বিতাড়ন করে এবং আখুলগোর বিপরীতে উঁচু স্থানে অবস্থান গ্রহণ করে; এই প্রথমবার আখুলগো সম্পূর্ণ বেষ্টিত হয়ে পড়লো। পরিণামে এখন দৃশ্যমান হয়ে উঠল। যদিও এখনও অনেক দূরবর্তী নীচুতে নতুন আখুলগোর সম্মুখে নিকটবর্তী শৈলশিরাটির উপর রয়েছে দু'টি পাহাড়ী কামান, যেগুলো স্থাপিত ছিল অনেক উঁচু জায়গায়, যে কারণে সেগুলো সামান্যই ক্ষতি করতে পারতো। এখন সেগুলোকে সেখানে ইতিমধ্যেই বিদ্যমান চারটি মর্টারের সঙ্গে যোগ করা হয়, সামান্য বামদিকে একটি নতুন ব্যাটারী তৈরী হয়। তাতে ছিল চারটি ফিল্ডগান। কিন্তু সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ কাজ ছিল এবং এ জন্য চূড়ান্ত কষ্ট হলেও, নতুন একটি আচ্ছাদিত গ্যালারী তৈরী করা নীচের ব্রীজ থেকে আখুলগোর কাউন্টারস্কাপ পর্যন্ত। এর দুটি উদ্দেশ্য ছিল ঃ পার হতে গিয়ে যে ক্ষতি হবে তা কমানো, কারণ পার হবার সময় অবস্থানটি দৃষ্টিগোচর হয়ে উঠবে। আর একটি উদ্দেশ্য ছিল- নতুন আক্রমণের সময় আক্রমণকারীকে কাউন্টার স্ক্রাপের নীচে আকস্মিকভাবে গোপনে সমবেত হওয়ার সুযোগ দেওয়া। এই গ্যালারীটি পরিকল্পনা করে দু'জন নতুন ইঞ্জিনিয়ার এবং চরম অসুবিধার মধ্যে তা নির্মাণ করে। যুদ্ধের কলা-কৌশল ছিল একটি নতুন ব্যতিক্রম এবং সম্ভবত তা অনন্যই থেকে যায়। এটি নির্মিত হয় এক সারি কাঠের তক্তা দিয়ে, আটসাঁট করে বাধা প্রায় সম্পূর্ণ খাড়া একটি খাদের কিনার থেকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ঝুলিয়ে দেয়া হয়। এখানে সেখানে নির্মিত হয় একেকটি তাক এটিকে ধরে রাখার জন্য; যথেষ্ট স্থান রাখা হল কাজটি চলাকালে পাহারা দেবার জন্য প্রহরীরা যাতে চলাফেরা করতে পারে। জুলাই মাসের ২০ তারিখে পার্বত্য যোদ্ধারা একটি দুঃসাহসিক অভিযানে এই গ্যালারীটি অংশত চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়। অতঃপর দড়ির বদলে চেইন দিয়ে তক্তাগুলোকে বাঁধা হয়। এভাবে প্রায় একটি মাস কেটে গেল- ১৫ই জুলাই থেকে ১৫ই আগস্ট পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে ১০০ জনের বেশী লোক

নিহত বা আহত হয়নি। স্যানিটারী অবস্থা ছিল খুব খারাপ এবং আগস্ট মাসের মাঝামাঝি ফৌজের সৈন্য সংখ্যা কমে ৬০০০-এর সামান্য উপরে উপনীত হয়। ব্যাটালিয়নগুলোর গড়ে ছিল ৪৫০ বেয়নেট। ইত্যবসরে ঈমাম শামিলের অবস্থা সংকটাপন্ন হয়ে উঠে। কারও জন্যই শৈলান্তরীপটির কোথাও স্থান ছিল না, কেবল গুহা ছাড়া, সেখানে কিছুসংখ্যক রমণী এবং শিশু আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। পানি কেবল আনা যেত অনেক নীচু দিয়ে প্রবাহিত নদী থেকে- রুশ বন্দুকধারীদের গুলির মুখে। রসদ ছিল নিকৃষ্ট এবং স্বল্প, লাকড়ি বলতে গেলে ছিলই না এবং বাতাস দূষিত হয়ে পড়েছিল নিহতদের বা রোগে যারা মৃত্যুবরণ করেছে তাদের লাশের দুর্গন্ধে। আগস্টের প্রচন্ড রোদ বৃক্ষলতা শূন্য শিলাভূমির উপর পড়ছিল এবং দিবারাত্রি রুশ ব্যাটারীগুলো থেকে বর্ষিত হচ্ছিল লৌহ নির্মিত গুলিগোলা, এখন আর কোন দিক থেকেই সাহায্যের আশা ছিল না।

তাই বিস্ময়ের কিছু নেই যে, এমন কি ঈমাম শামিল পর্যন্ত সন্ধি করতে স্থির করলেন। দাজামালা, সিরকেইর স্তারছিনা অনেক আগেই একজন মধ্যস্থতাকারী হিসেবে নিজেকে অর্পণ করেছিলেন। কিন্তু গ্রাবি তাকে জানিয়ে দেন- তিনি কিছুই শুনবেন না, যতক্ষণ না রুশ সরকারের কাছে শামিল আত্মসমর্পণ করছেন এবং তার আন্তরিকতার প্রমাণ হিসেবে তার পুত্র জামাল উদ্দিনকে জামিন হিসেবে অর্পণ করেছেন। আলাপ-আলোচনা শুরু হয় ২৭শে জুলাই এবং কয়েক ঘন্টা গোলাগুলি বন্ধ থাকে। আগস্টের প্রথম দিকে তিলিতলের বিখ্যাত কাজী কীবীত মোহুমা প্রস্তাব করলেন যে, তিনি মধ্যস্থতা করবেন। কিন্তু গ্রাবি তা প্রত্যাখ্যান করেন। ১২ই আগস্ট ঈমাম শামিল নিজে রুশ হেড কোয়ার্টারে একজন দূত পাঠান এবং পুনরায় কয়েক ঘন্টার জন্য গোলাগুলি বন্ধ থাকে। আসলে তার অবস্থানস্থলে মেরামতের জন্য কিছু সময় নিতে চেয়েছিলেন। ১৬ই আগস্ট তার কাছে এই মর্মে আলটিমেটাম পাঠানো হয় যে, যদি রাত্রির মধ্যে তার পুত্রকে অর্পণ করা না হয়, পরদিন সকালেই আখুলগোর উপর আক্রমণ শুরু করা হবে। যে কলামগুলো আক্রমণ করবে, তারা প্রস্তুত হয়ে পড়লো এবং যখন দেখা গেল জামাল উদ্দিন আসেননি, ১৭ তারিখের সকালে অবরোধের মধ্যে দ্বিতীয়বারের মতো গ্রাবি সর্বাত্মক আক্রমণের জন্য নির্দেশ দিলেন। আগের মতোই আখুলগোর আত্মরক্ষাকারীদের বিরুদ্ধে ছিল তিন কলাম ফৌজ এবং তার ফল হল কিছুটা কম বিপর্যয়কর। কারণ যদিও ঝুলন্ত গ্যালারীর সাহায্যে ডান দিকের ফৌজ প্রথম রক্ষাব্যূহে পৌঁছতে পারলো- সেখানে তারা আটকা পড়ে গেল। সেখানে দ্বিতীয় রক্ষাব্যূহে পৌঁছতে চেষ্টা করতে গিয়ে তারা আগের মতই মারাত্মক গোলাগুলির সম্মুখীন হয়, তবে তাদের ক্ষয়ক্ষতি ততটা ভয়াবহ বা মারাত্মক ছিল না। কারণ গ্যালারীর বদৌলতে তারা নিজেদের রক্ষার কিছু ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়।

ইতিমধ্যে ১০২ জন রুশ ফৌজ নিহত হয়েছে, মন্মধ্যে ২ জন অফিসার। আহত হয়েছে ৪৫৫ জন ৬ জন অফিসারসহ। বাকী ফৌজ অভিযানের কষ্টে হতবিহ্বল হয়ে পড়ে এবং ঈমামের গোটা অবস্থানই বলতে গেলে অক্ষত থেকে যায়। আবারও একটি ব্যর্থতা রুশ ফৌজের ভাগ্যে জুটলো।

সুরখাইয়ের শাহাদাতবরণ

চারদিকে গোলাবর্ষণের সম্মুখীন হয়ে ঈমামের ফৌজ প্রথম আক্রমণের চাইতে এই গুলিবর্ষণে এবার অনেক বেশী ক্ষতিগস্ত হওয়ায় দুর্বল হয়ে পড়ে। ঈমাম শামিল এখন আবার তার সবচাইতে দুঃসাহসী এবং সবচেয়ে অনুরাগী সঙ্গীদের হারালেন। তাদের মধ্যে ছিলেন সুরখাই, যিনি প্রথম থেকেই সকল সামরিক ব্যাপারে ছিলেন ঈমামের দক্ষিণ হস্ত। তিনি সেই মুজাহিদ, যিনি তিনি ঈমামের হাত সরিয়ে নিয়েছিলেন- যখন তিনি জেনারেল ক্লুগেনোর সঙ্গে হাত মেলাতে চেয়েছিলেন। মৃতের লাশে শিলাগুলি চাপা পড়ে গেল। মৃত এবং আহত লোকজনের দ্বারা ঢেকে গেল শিলারাজি। যারা বেঁচে রইল তাদের উপর চাপল অর্ধবুভুক্ষ নারী এবং শিশুদের এক বিপন্ন দল। এমনকি সাহসী পার্বত্য যোদ্ধাদের পক্ষেও আরও যুদ্ধ একটা নৈরাজ্যজনক ব্যাপার হয়ে উঠল। ঈমাম শামিল বিবেচনা করে দেখলেন নতুন কোন প্রতিরোধ হবে আত্মহননের শামিল। বুভুক্ষু শিশু এবং মেয়েদের বাঁচানোর চেষ্টায় তিনি সাদা পতাকা উত্তোলন করলেন এবং তার ১২ বছরের পুত্র জামাল উদ্দিনকে পাঠালেন রুশদের কাছে জামিন হিসেবে। আসলে তিনি তার অনুসরণকারীদের বাঁচানোর জন্য নিজের পুত্রকে উৎসর্গ করেছিলেন। বহু বছর বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার পর জামাল উদ্দিন প্রত্যাবর্তন করতে পেরেছিলেন। কিন্তু ততদিনে তিনি ঈমাম এবং তার লোকজনের কাছে অপরিচিত হয়ে গেলেন- যার মধ্যে ছিল এক মহান মুজাহিদের সম্ভাবনা- তিনি জারের ফৌজে কেবল একজন জীর্ণ লেফটেন্যান্ট বেশে ফিরে এলেন। দীর্ঘদিন ধরে ঈমাম তার পুত্রের আগমনের জন্য উৎকণ্ঠার সঙ্গে অপেক্ষা করেছেন। তিনি ছিলেন নবী ইয়াকুবের মতো, যিনি তার পুত্র ইউসুফের সঙ্গে মিলিত হবেন বলে প্রতীক্ষায় ছিলেন।

আপোস আলোচনা

গ্রাবি এখন আপোস আলোচনায় রাজী হলেন। ১৮ তারিখে জেনারেল পুলো ক্ষুদ্র একটি সঙ্গী দল নিয়ে পাহাড়ে প্রবেশের অধিকার পেলেন। তিনি ঈমাম শামিলের সঙ্গে একটি সাক্ষাতকারের সুযোগ পেলেন। তবে তিনি তার দেশের, পার্বত্য এলাকায় বাস করতে পারবেন এবং জামালউদ্দিনকে রাখতে হবে চিরকেইতে জামালার হেফাজতে- এই দুটি শর্ত গৃহীত হলো না। পুলো ফিরে গেলেন। কিন্তু আপোস আলোচনা আরও তিনদিন চললো এবং এ সময়ের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠলো

যে, ঈমাম শামিল তার মত পরিবর্তন করেছেন এবং আত্মসমর্পণ করবেন না বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। ২১ তারিখে আবার নতুন করে হামলা শুরু হয়। তৃতীয়বারের মতো রাশিয়ানরা নতুন আখুলগোতে তাদের সহজ প্রবেশের জন্য প্রয়াস পায়। মুরীদরা বরাবরের মতোই বীর্যবর্ত্তার সঙ্গে প্রতিরোধ চালিয়ে যায় এবং রাত্রি আসার সাথে সাথে দেখা গেল তাদের অবস্থান এখনও অক্ষুণ্ন রয়েছে। পরদিন সকালবেলা (২২শে আগস্ট) যখন নতুন করে আক্রমণ শুরু হল, সিপাহীরা বিস্মিত হয়ে দেখতে পায় কোন প্রতিরোধই নেই এবং যে বেষ্টনীকে এতক্ষণ বীরত্বের সঙ্গে রক্ষা করা হচ্ছিল- তা শূন্য এবং তারা ঝাকে ঝাকে তাতে এবং তার বাইরে প্রবেশ করে অল্প সময়ের মধ্যেই নতুন আখুলগোর বৃহত্তর অংশ দখল করে নেয়। গ্রামে মাত্র কয়েকজন অধিবাসীকে তারা দেখতে পেল- তারা এখনও সেখানে অবস্থান করছে। কিন্তু অবশিষ্ট সকলে ফাক দিয়ে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করছে।

মরণপণ প্রতিরক্ষার চেষ্টা

এবার একটা মরণপণ যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। এমন কি মহিলারাও নিরস্ত্র অবস্থায় সারি সারি বেয়নেটের মুখে নিজেদেরকে রক্ষা করার চেষ্টা করতে লাগলো। ইত্যবসের রাশিয়ানরা নিয়ে এলো দুটি পার্বত্য কামান এবং পুরনো আখুলগোর উপর গুলি বর্ষণ করতে শুরু করলো। সেখানে বিপুল সংখ্যক পলাতকেরা তখনও পৌঁছেনি। দেখা গেল তারা দলে দলে বিপরীত দিকের ক্লিফে আরোহণ করছে, অথবা এখনও সেতুর পার্শ্বদেশে তারা অবতরণ করছে সংকীর্ণ এবং বিপজ্জনক পথ দিয়ে। এই খাড়ির অনেক নীচে পানির স্রোতের ৭০ ফুট উপরে ফাটলটির দুই পাড় সংযুক্ত করা হয়েছে। উপরে মালভূমিতে অবস্থিত রুশ ফৌজ ধাওয়া করে চলেছে। অন্যদিকে একই সময়ে তারাসেবিসের বাহিনী- যারা ফাটলের মধ্যদিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল, টিলায় আরোহণ করে এবং সেতুটি দখলে নিয়ে নেয়। এরপর তারা পুরনো আখুলগোর সমতলে পৌঁছায় ঈমাম শামিলের গ্যারিসনটি এই কলামটির অস্তিত্ব সম্পর্কে অবহিত হবার আগেই। দুইদিনের যুদ্ধে ১৫২ জন রুশী মারা যায় এবং ৪৯৫ জন আহত হয়। মৃতদের মধ্যে ৬ জন অফিসার এবং আহতদের মধ্যে ১৫ জন। অবশেষে তারা আখুলগো দখল করে নিল এবং যুদ্ধ প্রায় সপ্তাহকাল ধরে চললো। এই যুদ্ধে তারা প্রায়ই ককেশিয়ান যুদ্ধের স্বাভাবিক বিপদের সম্মুখীন হয়- "প্রতিটি পাথর, বলা যায় প্রতিটি গুহা দখল করতে হয়েছিল অস্ত্রের জোরে, পার্বত্য যোদ্ধারা সকলেই আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করলো এবং নিজেদেরকে মরিয়া হয়ে রক্ষার জন্য চেষ্টা করলো... নারী এবং শিশুরা হাতে পাথর এবং কিঞ্জাল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো বেয়নেটের উপর। এ ভয়াবহ যুদ্ধের সকল দৃশ্যপট কল্পনা করাও কঠিন। মায়েরা নিজের হাতে তাদের সন্তানদের হত্যা করলো কেবলমাত্র এই লক্ষ্যে যে, তারা যেন শত্রুদের হাতে না পড়ে। এদিকে পরিবারের পর পরিবার

নিঃশেষ হয়ে গেল তাদের জ্বলন্ত সাকালিয়ার ধ্বংসাবশেষের নীচে। কিছু কিছু মুরীদ জখমের কারণে দুর্বল হয়ে পড়লো, তারা চেষ্টা করলো তাদের জীবনকে মহামূল্যের বিনিময়ে বিসর্জন দিতে। তারা অস্ত্র সমর্পণের ভান করে যারা তাদের কাছ থেকে অস্ত্র গ্রহণ করতে এল, তাদেরকে হত্যা করলো। এভাবে তারাসিবেন মারা গেল, যোদ্ধাদের কৈসূর-এর উপর ঝুলন্ত খাড়ির গহ্বর থেকে বিতাড়িত করতে গিয়ে ভয়ানক অসুবিধার সম্মুখীন হয়। সেখানে তাদের সৈন্যদেরকে নামানো হয়েছিল রশির সাহায্যে, তাদের জন্য অসংখ্য লাশের দুর্গন্ধে বাতাস ভারাতুর হয়ে উঠেছিল। তা সহ্য করা তাদের জন্য কম পরীক্ষা ছিল না, ১০০০-এর বেশী লাশ গণনা করা হয়। বিপুল সংখ্যক নদীর স্রোত বহন করে নিয়ে যায়। ৯০০ জনকে বন্দী করা হয়। তাদের বেশীরভাগই ছিল স্ত্রীলোক, শিশু এবং বৃদ্ধ। তাদের জখম এবং কাহিল অবস্থা সত্ত্বেও তারা অতি মরণপণ সংগ্রাম থেকে পশ্চাৎপদ হয়নি। কেউ কেউ তাদের হারানো শক্তি সংগ্রহ করে তাদের গার্ডদের হাত থেকে বেয়নেট ছিনিয়ে নিয়ে তাদের আক্রমণ করে। অমর্যাদাকর বন্ধুত্ব থেকে মৃত্যুকে তারা শ্রেয় মনে করেছিল। শিশুদের কান্না ও মাতম, পীড়িতদের এবং আহতদের দৈহিক কষ্ট এই বেদনাদায়ক দৃশ্যকে সম্পূর্ণতা দান করে। ২৯শে আগস্টের ভিতরে আখুলগোতে আর একজন পার্বত্য যোদ্ধাও বর্তমান ছিল না । জারের ফৌজ এভাবে সম্মানের সঙ্গে তাদের মিশন পূর্ণ এবং জার ও ক্রুশের প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করলো। অবরোধ চলছিল ৮০ দিন, যাতে ২৫ জন রাশিয়ান অফিসার এবং ৪৮৭ জন যোদ্ধা নিহত হয়। আহত হয় ১২৪ জন যোদ্ধা এবং ২২৯১ জন সেপাহী। এভাবে সর্বমোট ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৩০০০ জন। তার সঙ্গে রয়েছে রোগব্যাধির কারণে বিপুল ক্ষয়ক্ষতির হিসাব।

একটি রহস্য

একটি প্রশ্ন অমীমাংসিত রয়ে গেল। ঈমামের কি হলো? তাকে কোথাও দেখা যাচ্ছিল না। রুশ ফৌজ বার বার অনুসন্ধার করে প্রত্যেকটি গর্ত এবং গহ্বর, প্রত্যেকটি কোণ পরীক্ষা করলো। কিন্তু জীবিত বা মৃত- কোন অবস্থাতেই তাকে পাওয়া গেল না। যারা বেঁচেছিল, তাদের কাছ থেকেও কোন খবর পাওয়া গেল না- যা তার অন্তর্ধানের উপর আলো ফেলতে পারে। তিনি কি খাড়ির উপর থেকে তার বোন ফাতেমা এবং অন্য অনেকের মতো লাফ দিয়ে পড়েছেন? অথবা যা অবিশ্বাস্য মনে হয়- তিনি কি সাত বছর আগে ঘিমড়ী থেকে যে রহস্যজনকভাবে আত্মরক্ষা করেছিলেন– তার চাইতে আরও রহস্যজনকভাবে আত্মরক্ষা করেছিলেন। কয়েকদিন পর সত্যটি জানা গেল এবং তখনও কিছু দিন লোকে তাও বিশ্বাস করতে চাইলো না।

২১শের রাতে দেখা যায়- ঈমাম শামিল বুঝতে পারলেন তার আর কিছু করার

নেই। তিনি শিশুসহ একজন স্ত্রী এবং অন্য আরেকজন স্ত্রীকে নিয়ে অবরোধের মধ্যেই গয়েব হয়ে গেলেন। তার সঙ্গে ছিলেন কয়েকজন বিশ্বস্ত সৈন্য। তিনি কৈশুর উজানে অবস্থিত খাড়িগুলোর একটিতে আশ্রয় নিলেন এবং গাছের গুড়ি দিয়ে একটি ভেলা তৈরি করে তাকে স্রোতের ভাটিতে ভাসিয়ে দিলেন। তা বোঝাই করা হল ডামি দিয়ে- রুশ প্রহরীদের মনোযোগ ভিন্ন পথে চালিত করার জন্য। এই ছলনাটি সফল হল। সৌভাগ্যক্রমে শত্রুপক্ষ ভেলাটি দেখতে পায় এবং সেটি লক্ষ্য করে বহু বুলেট নিক্ষেপ করে। ইত্যবসরে পুরো দলটি নীচে প্রবহমান নহরের তীর বরাবর খুব সতর্কতার সঙ্গে আরোহণ করে এবং শেষ পর্যন্ত তারা গিয়ে পৌঁছায় একটি গভীর সংকীর্ণ উপত্যকায়। এখানে এসে তারা স্থলভূমির দিকে ঘুরে দাঁড়ায়। কিন্তু সেখানে তারা একদল প্রহরীর সামনে পড়ে যায় এবং যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধে ঈমাম শামিল নিজে তার স্ত্রীর পিঠে বাঁধা ছোট ছেলে শিশুপুত্রসহ আহত হন এবং রুশ ফৌজের কমান্ডার রুশ লেফটেন্যান্ট নিহত হয়। কিন্তু প্রতিরোধ বহর ভেঙ্গে যায় এবং যতদ্রুত সম্ভব তারা তাড়াতাড়ি উজানের উপত্যকায় পৌঁছায়। কল্পনা করা যেতে পারে- কি মরণপণ চেষ্টায় তারা গিরিপথটি অতিক্রম করে এবং পর্বতের পার্শ্ব দিয়ে নীচে রওয়ানা করে। তারা পুনরায় নদীর তীরে আভর কৈসূর সঙ্গে আন্দি যেখানে মিলিত হয়েছে, সেখানে একটি বিন্দুতে তারা পৌঁছায়। এ হচ্ছে আশিলতার সেতুর নিকটে- যার কথা ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। এখানে উভয় দিক থেকে বৃক্ষলতা শূন্য বেলে পাথর বৃহৎ আকারে বেরিয়ে আসে। নীচ দিয়ে প্রবাহিত ফেন-শীর্ষ পানির উপর কেবল সেগুলো পরস্পর যুক্ত হওয়া ছিল বাকী। পলাতকরা মধ্যবর্তী স্থানটুকু একটা তক্তা দিয়ে দ্রুত সেতুবন্ধনে এনে পার হয়ে বাম তীরে পৌঁছায় এবং পাহাড়ের দিকটিতে আরোহণ করার প্রয়াস পায়। তারা বেশীদূর যায়নি। যখন এই পুলটি পাহারা দেবার জন্য ঘিমড়ী থেকে প্রেরিত একটি দলের নজরে পড়ে যায় তারা, তাদের উপর কয়েকবার গুলি বর্ষণ করা হয়। কিন্তু তাতে কোন ফল হলো না। এই লোকগুলো কারা, তীব্র আক্রোশের সঙ্গে তিনি তাদের থেকে ঘুরে দাঁড়ালেন এবং ক্রোধের সঙ্গে তার গ্রামবাসী ও বেওফা লোকদের দিকে তাকিয়ে তিনি তাদের দিকে ঘুষি দেখিয়ে গর্জন করে উঠলেন- ঘিমড়ীর লোকেরা, আবার আমাদের দেখা হবে। তারপর পাহাড়ের উপর তার সঙ্গীরা তাঁর অনুসরণ করে এবং নজর থেকে তারা গায়েব হয়ে যায়।

রাশিয়ানদের ভুল বোঝাবুঝি

আবার একবার রাশিয়ানরা বিজয়ী হলো। আবার সেন্ট পিটার্স বুর্গের সরকার শামিলের প্রভাব ধ্বংস এবং মুরিদীজমের নিশ্চিহ্ন করে নিজেই নিজেকে অভিনন্দন জানায়। আবার মেডেল বা পদকগুলো অলংকৃত হলো। নাচের আসরে আলো জ্বলে এবং সঙ্গীতের মধুর রাগিনীর সঙ্গে টোস্ট্ জ্ঞাপন করা হয়। মুরিদীজম

মৃত্যুবরণ করেছে এবং রুশ সীমান্তে ওঁৎ পেতে থাকা বিপদ আর রইল না। আমরা জানি যে, সীমান্তে যে সর্বশেষ মেঘটি অন্তর্ধান করেছে তাতে ছিল বহু ঝড়ের সম্ভাবনা। রাশিয়ার নির্বোধ শাসকচক্র কখনও জানতে পারেনি যে, তাদের সীমান্তের বিপদ কাটিয়ে উঠার জন্য আরও বহু জেনারেলকে রক্তস্নানের মধ্যদিয়ে যেতে হবে; অভিজাত শ্রেণীর বহু বিখ্যাত এবং সাহসী সন্তানকে মুজাহিদীনের মারাত্মক আঘাতের পরিণামে মৃত্যুবরণ করতে হবে এবং বহু সেপাহী ঈমাম শামিলের ফৌজকে পদানত করার চেষ্টায় কোন প্রশংসার সঙ্গীত না শুনেই মৃত্যুবরণ করবে। রাশিয়ানরা মনে করেছিল, জীবিত থাকলেও ঈমাম হবেন কেবল একজন পলাতক, রাশিয়ানদের কবল থেকে রক্ষা পাবার জন্য জঙ্গলে এবং পর্বতে লুকিয়ে লুকিয়ে।

এক বছরের মধ্যেই ঈমাম শামিল হয়ে উঠলেন সশস্ত্র এক জাতির নেতা। তিন বছরের মধ্যে তিনি তার বিজেতাদের উপর আরও একবার রক্তাক্ত পরাজয়ের কালিমা লেপে দিলেন এবং পুরো উত্তর দাগীস্তান বিজিত হলো। প্রত্যেকটি রাশিয়ান গ্যারিসন ধ্বংস করে ফেলা হলো এবং স্যামোর থেকে তেরেক পর্যন্ত, কাওকাজ থেকে কাস্পিয়ান পর্যন্ত সকল জঙ্গলে এবং পাহাড়ে মুরিদীজম হলো বিজয়ী।

অধ্যায় ঃ পাঁচ

ঈমামের নতুন কৌশল (১৮৩৯-১৮৪২)



ঈমাম শামিল

কাউন্ট গ্রাবি তার তাৎক্ষণিক সাফল্য নিয়ে এতটাই খুশী ছিলেন যে, তিনি ঈমাম শামিলের পলায়ন সম্পর্কে সামান্যই চিন্তা করেছিলেন। আসলে তিনি পলাতকের মুন্ডু এনে দেবার জন্য যে মূল্য ধার্য করেছিলেন, তা ৯০০* টাকা (৩০ পাউন্ড) এর বেশী ছিল না। কিন্তু সম্রাট নিকোলাস যিনি ককেশাসের ঘটনাবলী নিবিড়ভাবে অনুসরণ করেছিলেন এবং কখনো কখনো তার মন্ত্রী কিংবা জেনারেলের চাইতেও দূরে তার দৃষ্টি প্রসারিত করেছিলেন তিনি কিন্ত দুশ্চিন্তামুক্ত ছিলেন না। আখুলগো দখল করার পর গ্রাবি যে রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন, নিকোলাস তার মার্জিনে নিজ হাতে লিখেছিলেন, "খুব চমৎকার, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, শামিল প্রায় পালিয়ে গেলেন এবং আমি স্বীকার করছি যে, তার পক্ষ থেকে নতুন ষড়যন্ত্রের ভয় আমার রয়েছে, যদিও নিঃসন্দেহে তিনি তার উপায়, উপকরণ ও প্রভাবের বৃহত্তর অংশই হারিয়েছেন। আমাদের অবশ্য দেখতে হবে, এর পরে কি ঘটছে।" ১৮৩৮-এর নভেম্বরে জেনারেল গোলোভিনে, কর্নেল পুলোর নিকট একটি চিঠি লিখেন যাতে ছিল– "এই ভয়ংকর ব্যক্তিটি আমাদের বিপুল ক্ষয়ক্ষতির জন্য দায়ী এবং আমাদেরকে সম্ভাব্য সকল উপায়ে তাকে হত্যা করার জন্য চেষ্টা করতে হবে। আমাদের বহু সাহসী যোদ্ধা আমাদের পরিকল্পনাটি গ্রহণের জন্য প্রস্তুত রয়েছেন, আমাদের বিশ্বস্ত কিছু লোকের জন্য ৩০০০ রুবেল পুরস্কারের ঘোষণা দিন। সাফল্য অর্জিত হবার সঙ্গে সঙ্গে অর্থ পরিশোধ করা হবে"। এতে বুঝা যায়, রাশিয়ানরা তাদের ভুল বুঝতে পেরেছিল এবং ইমাম শামিলের মাথা কেটে আনার জন্য আরও বড় অংকের পুরস্কারের ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছিলে।

অবশ্য ১৮৩৯-৪০ সালের শীত মাসগুলোতে চেচনিয়ার পরিস্থিতি গ্রাবির আশাবাদকে অনেকটা যুক্তিসিদ্ধ প্রমাণ করে। তার আদেশে জেনারেল পুলো প্রথমে ডিসেম্বরে, পরে আবার জানুয়ারীতে নিম্ন চেচেনিয়ার বেশিরভাগ অঞ্চলে মার্চ করে

* *সেই সময়কার অর্থমূল্য*

অগ্রসর হন। গ্রাবি বললেন, আখুলগোতে তার সাফল্যই এই চমৎকার পরিবর্তনের জন্য দায়ী এবং তিনি গলোভিনে এবং সেন্টপিটার্সবুর্গে অবস্থিত যুদ্ধ মন্ত্রীকে জানালেন যে, সারাদেশে পরিপূর্ণ শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। "যদিও আমরা শামিলকে বন্দী করতে সক্ষম হইনি, তবুও তার সমস্ত অনুসারীর মৃত্যু অথবা বন্দীত্ব এবং তার সমর্থক সকল গোত্রের ভয়ংকর কষ্ট যন্ত্রণা তাকে তার সমস্ত প্রভাব থেকে বঞ্চিত করেছে এবং তাকে এমন অবস্থায় উপনীত করেছে যে, একাকী পাহাড়ে পাহাড়ে বিচরণ করতে করতে এখন কেবল তার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও বেঁচে থাকার উপায় সম্পর্কে তার চিন্তা করতে হবে। মুরিদ মাজহাবের পতন ঘটেছে, এর সঙ্গে তার সকল ভক্তের"। ১৮৪০-এর অপারেশন পরিকল্পনা সম্পর্কে লিখতে গিয়ে আরও বলেন, "দাগিস্তান এবং চেচনিয়ার বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করে একথা জোর করে বলা যায় যে, আমাদের অভিযানকারী ফৌজেরা কোন প্রতিরোধের সম্মুখীন হবে না এবং চিরকেইতে দুর্গ নিমাণ সমাপ্ত হবে যুদ্ধ করার প্রয়োজন ছাড়াই। চেচেনিয়াতে উল্লেখযোগ্য কোন অস্থিরতা নেই এবং সাধারণ কোন অভ্যুত্থানের অনুমান করাও ঠিক হবে না। উদ্দেশ্য ছিল কেবলমাত্র দু'টি দূর্গ তৈরী করা, ডাশা বার্যোইতে সবচাইতে ভাটি অঞ্চলে আর্গূন নদীর মুখেএবং এভাবে ভেলিননোফের তৃতীয় সমান্তরাল তথাকথিত চেচেন অগ্রবর্তী লাইনের নির্মাণ আরম্ভ করা। কিন্তু দেখা গেল শেষ পর্যন্ত গার্জেল পল্লীতে একটিমাত্র দুর্গ নির্মিত হয়েছে।

চেচনিয়াতে স্বাধীনতা আন্দোলন

বসন্তকাল শুরু হতে না হতেই সমগ্র চেচনিয়া আবার অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে গেল। আসলে রাশিয়ানরা ঈমামের কৌশলে এমনভাবে আটকা পড়ে যে, ঈমাম নিজেও তা সামান্যই অনুমান করতে পেরেছিলেন। পুলো ছিলেন একজন সাহসী ও দক্ষ অফিসার, কিন্তু জেনারেল গেলাফিয়েফ এবং গ্রাবির মতোই তিনি ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষ। ককেশাসে এর অর্থ কি দাঁড়িয়েছিল সহজেই অনুমান করা যায়। অধিকন্তু তিনি ছিলেন চরম অবিবেচক। চেচেনরা তাকে ভয় এবং ঘৃণা করতো। প্রিষ্টাফের পদটি পূরণ করার জন্য স্থানীয় ভাষার সঙ্গে যথেষ্ট পরিচিত রাশিয়ান না পেয়ে তিনি প্রো-রাশিয়ান স্থানীয় লোকদের নিয়োগ করতে অগ্রসর হন– যারা অধীনস্তদের প্রতি নির্দয় ও অন্যায় আচরণ করে। ফলে তাদের ধৈর্য্য নিঃশেষ হয়ে যায়, জনতা অসন্তুষ্ট হয়ে পড়লো। যখন গুজব ছড়িয়ে পড়ল, স্থানীয় লোকেরাই গুজবের জন্মদাতা হয়ে যায়; জনতা অসন্তুষ্ট হয়ে পড়ে। যখন গুজব ছড়িয়ে পড়ল, গুজবের জন্মদাতা অসন্তুষ্ট স্থানীয় জনগণই হোক কিংবা প্রিষ্টাফগণ কর্তৃক তাদের নিজেদের উদ্দেশ্যেই উদ্ভাবিত হোক– গুজব ছড়িয়ে গেল যে, চেচেনদের নিরস্ত্র করতে হবে। তাদেরকে রুশ চাষীদের মতো চাষীতে পরিণত করতে হবে এবং তাদেরকে জোর করে ফৌজে রিক্রুট করতে হবে। এই গুজবের

ফলে সমগ্র দেশকে প্রজ্জ্বলিত করার জন্য কেবল একটি স্ফুলিঙ্গ প্রয়োজন ছিল। গোটা জনগোষ্ঠী বিদ্রোহের জন্য তৈরী হয়ে গেল। তাদের প্রয়োজন ছিল কেবল একজন নেতার; এবং ঈমাম ইতিমধ্যেই সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন এই পর্বতবাসীদেরকে নিষ্ঠুর রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে নেতৃত্বদানের জন্য। আখুলগো থেকে সরে পড়ার পর ছয় মাস চলে গেছে। এই সময়ের মধ্যে ঈমাম শামিল তাঁর প্রভাব প্রচুর পরিমাণে অর্জন করেছেন। তার নায়েব শুয়েব মাওলা এবং জওয়াদ খান তাকে দুই বাহু মেলে সংবর্ধনা জানান। ঈমাম শামিল নীরবে একটি ক্ষুদ্র চেচেন সম্প্রদায়ের মধ্যে বসতি গাড়লেন, যেখানে অচিরেই তার প্রভাব হয়ে উঠল ব্যাপক। তাঁর জ্ঞান-গরিমা ও সচ্চরিত্রের খ্যাতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। তিনি দাগিস্তানে আখওয়ারদি মোহুমার কাছে লোক পাঠালেন এবং এই ছোট্ট চেচনিয়ার বিষয়াবলী পরিচালনা করতে রাজি হলেন এই শর্তে যে, তারা তাঁরা আদেশ-নির্দেশের প্রতি পূর্ণ আনুগত্যশীল হবে। তিনি ঘোড়ায় চড়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে শরিয়ত প্রচার করে বেড়াতে লাগলেন। মার্চ মাসের মাঝামাঝি (১৮৪০) অধিবাসীরা অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে গেল, জেনারেল পুলো আতংকিত হয়ে পড়লেন। গ্রোজনী থেকে অদূরে সাউনজাতে একটি বিদ্রোহ শুরু হয়ে গেছে তার নিজের ফৌজ এবং ঈমাম শামিলের মুরীদদের মধ্যে। চেচেনরা পরাজিত হয়, কিন্তু সিদ্ধান্ত এরই মধ্যে হয়ে গেছে। রুশ শাসনের এক কিংবা দুই মাসেই ধৈর্য্যের সীমা ছাড়িয়ে যাবার জন্য যথেষ্ট প্রমাণিত হলো, কৃষ্ণসাগরে তাদের শত্রুদের বিপর্যয়ের খবরে এবং বিদেশী হস্তক্ষেপের লাগাম ছাড়া গুজবে উৎসাহিত হয়ে চেচেনরা আবার খাপ থেকে তরবারী বের করে দাঁড়িয়ে যায়। ১৮৪০-এর শেষ পর্যন্ত সীমাহীন জীঘাংসার সঙ্গে যুদ্ধ চলতে থাকে। তারপরই এবং শীঘ্রই তা ছড়িয়ে পড়ল সমগ্র চেচনিয়াতে এবং দাগিস্তানের একটি বৃহৎ অংশেও।

গেরিলা যুদ্ধ

ঈমাম শামিল, যিনি বৃক্ষলতা শূন্য পার্বত্য অঞ্চলে তার প্রথম দিকের খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, এখন তিনি জঙ্গলে গেরিলা যুদ্ধে তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত করলেন। জঙ্গলে গেরিলা যুদ্ধের তিক্ত অভিজ্ঞতা ইতিমধ্যেই হয়েছিল রুশদের,– যখনই সম্ভব জারের সুশৃঙ্খল ফৌজের সম্মুখ যুদ্ধের বিপদ পরিহার করে তিনি বিস্ময়কর গতিতে অগ্রসর হতে লাগলেন।

এইসব যুদ্ধে ঈমাম যে বিশাল সামরিক প্রতিভা চিত্রিত করলেন তা প্রথম মুসলিম গেরিলা নেতা হিসাবে তাঁর খেতাবের যৌক্তিকতা ষোলআনা প্রমাণ করে। তাকে আজ হয়তো কোন একটি বিশেষ স্থানে দেখা গেল, কিন্তু একদিন পরেই দেখা গেল তাকে সে স্থান থেকে বহু দূরে কোন জায়গায়। তিনি ছিলেন বিদ্যুতের মতো ক্ষীপ্র গতি, শত্রুকে নিধন করার মুহূর্ত পরেই আবার গায়েব হয়ে যাচ্ছেন জঙ্গলে,

ইতিহাসের শীতল পাতায় আজকের দিনেও যা দেখা যায় তাতে রাশিয়ানদের কাছে পুরো ব্যাপারটিই মনে হয় অসম্ভব, একটা দুর্বোধ্য রহস্য। তার অনুপম কৌশল এবং দাগিস্তানে গেরিলা যুদ্ধ চালাতে তার অতুলনীয় শ্রেষ্ঠত্ব আজ পর্যন্ত কেউ অতিক্রম করতে পারেনি। এখনও তা বিস্ময়কর বলে মনে হয়।

ঈমাম কখনও তার স্মৃতিকথা লিখেননি, এমনকি তা লিখে থাকলেও কখনও সংরক্ষিত হয়নি। বস্তুত গেরিলা যুদ্ধে তার অনুসৃত নীতি ও কৌশলের কোন উন্নতিই সম্ভবপর ছিল না। চেগুয়েভারা তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'গরিলা ওয়ারফেয়ার'-এ যা লিখে থাকুন ঈমাম শামিল তার যুদ্ধ প্রণালীতে প্রায় ১৫০ বছর আগেই তার প্রত্যেকটি উদ্ভাবন ও প্রয়োগ করেছিলেন।

চেগুয়েভারা লিখেছিলেন, "শত্রুকে একটি প্রবল আঘাত হেনে গেরিলা যোদ্ধার উচিত প্রতীক্ষা করা। হঠাৎ জঙ্গল থেকে বেরিয়ে অতর্কিতে আক্রমণ করা, আঘাত হানা এবং আবার সরে পড়া। ঘন ঘন, বার বার তা করতে হবে, শত্রুর পশ্চাৎধাবন করতে হবে অবিশ্রান্তভাবে।"[১]

"প্রতিনিয়ত শত্রুর পিছনে ধাওয়া করতে হবে। তাকে যুদ্ধের ময়দানে ঘুমাতে দেওয়া হবে না, তার সকল লুকাবার স্থান ধ্বংস করে ফেলতে হবে, তার মধ্যে এ বিশ্বাস জন্মাতে হবে যে, তাকে সকল দিক থেকে বেষ্টন করে ফেলা হয়েছে, শত্রুর বিরুদ্ধে এসব কর্মকান্ড জঙ্গলের ভিতরে এবং পর্বতসংকুল সমতল অঞ্চলে অব্যাহত রাখতে হবে"।[২]

বলিভিয়া এবং কিউবার জঙ্গলে ও পাহাড়ে চেগুয়েভারা যে নীতি উদ্ভাবন করেছেন, তা অভিনব ছিল না। দীর্ঘদিন আগে দাগিস্তানের পর্বতে ঈমাম শামিল এই নীতিগুলো উদ্ভাবন করেছিলেন। তিনি কোন মিলিটারী একাডেমীতে শিক্ষা লাভ করেন নি, তিনি যুদ্ধের ময়দানে এই শিক্ষা লাভ করেছিলেন এবং গেরিলা যুদ্ধে সকলকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। তাকে যথার্থভাবেই গেরিলা যুদ্ধের ক্ষেত্রে অগ্রনায়ক বলা যেতে পারে।

তিনি কসাকদের বসতিগুলোর উপর হামলা চালান এবং যেসব স্থানীয় অধিবাসী জেহাদে অংশগ্রহণ করতে তৈরী হলো না, তাদেরকে শাস্তি দেন। তিনি যখন সত্তর-আশি মাইল দূরে অবস্থান করতেন, তখনও চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তাদের উপর হামলার ঘোষণা করেন, যখন তার লেফটেন্যান্টরা পূর্বদিকে দাগিস্তানের সীমান্তে পশ্চিমে ভ্লাদিকাওকাজের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে একই কৌশল অনুসরণ করে চলতো। এভাবে তিনি শত্রুকে সতর্ক রাখতেন এবং এইভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে চরম হয়রানির মাধ্যমে তাদেরকে ক্লান্ত হতবল করে ফেলতেন। গ্রাবি প্রথমে স্বীকার করতে

1. The Guvera Guerrilla Warfare, London Penguin 1986, P. 18.
2. The Guvera Guerrilla Warfare. London Penguin 1986, P. 21.

চাইলেন না যে, তার ভবিষ্যদ্বাণীগুলো সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রমাণিত হবে। তিনি অনেক দূরে রইলেন ষ্টাবারপোলে, পিছনে রেখে গেলেন পুলোকে, প্রধানত তার নিজেরই নিষ্ঠুরতা-নির্বুদ্ধিতার ফলে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, তার মোকাবেলা করার জন্য। পরে তিনি চলে যান পিয়তিগোরাকে এবং জেনারেল গেলোফিয়াফকে পাঠালেন পুলোর স্থান গ্রহণের জন্য। কিন্তু অচিরেই পূর্বপার্শ্বের ফৌজ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে এবং এবং সেই ফৌজদের প্রধান ময়দানে নিজেই কমান্ড গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন।

১৮৪০ সালের প্রথমদিকে চেচনিয়াতে তার চমৎকার সাফল্যের পর ইমাম শামিল তার যুদ্ধ দাগিস্তান পর্যন্ত প্রসারিত করেন– যেখানে হাজার হাজার মুসলিম তাঁর পতাকা তলে সমবেত হয়। জুলাইয়ের ১০ তারিখে ঈমাম শামিল তার পুরনো শত্রু ক্লুগেনুর মুখোমুখি হন। ক্লুগেনো সুরাহ থেকে প্রেরিত বিপুল সংখ্যক ফৌজে শক্তিশালী হয়ে মোজাহেদীনের মধ্য দিয়ে রাস্তা করে এগিয়ে আসেন। ঈমাম শামিল কৌশলগত কারণে সোলাক বরাবর নিজেকে গুটিয়ে নেন। সৌরাক এবং উত্তর দাগিস্তানের সমগ্রটাই তখন তার করুণার উপর নির্ভর করছিল। ১৪ই সেপ্টেম্বর ক্লুগেনু তার ফৌজকে একটি বিপজ্জনক রাস্তা ধরে ৫০০০ ফুট নীচে পৌঁছেন এবং মশহুর পানির স্রোতটি পেরিয়ে তিনি পৌঁছুলেন ঘিমড়ি এবং প্রথম ও তৃতীয় ঈমামের সেই জন্মস্থানটিকে হঠাৎ আক্রমণ করে দমন করেন। কিন্তু এমন একটি ঘটনা ঘটল যার ফল পরিণামে ঈমামের ক্ষতি পূরণ করে দেয়।

হাজী মুরাদ

হাজী মুরাদ, যিনি পরবর্তীকালে ঈমামের প্রধান লেফটেন্যান্টদের অন্যতম হয়ে উঠেছিলেন, তিনি সে সময় ছিলেন রাশিয়ানদের অনুগত। এদিকে আহমদ খান এবং হাজী মুরাদের মধ্যে ছিল এক দ্বন্দ্ব। আহমদ খান রাশিয়ানদের সম্মুখে হাজী মুরাদকে অপবাদ দেন এবং তাকে ঈমামের একজন মিত্র বলে নির্দেশ করেন। আহমদ খানের এই কাহিনীকে ক্লুগেনু বিশ্বাস করেন এবং মেজর লেজারফ থেকে একই সংবাদ পেয়ে ক্লুগেনু নির্দেশ দিলেন হাজী মুরাদকে একদল প্রহরীসহ শূরায় পাঠিয়ে দিতে এবং তিনি পথে পালিয়ে যাওয়ার কোন চেষ্টা করলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে হত্যা করতে। এই নির্দেশ মোতাবেক ১০ই নভেম্বর হাজী মুরাদ, যাকে ১০ দিন শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল একটি কামানের সঙ্গে, তাকে খুঞ্জাক থেকে পাঠান হলো, আপশেরণ রেজিমেন্ট্রর একজন অফিসার ও ৪৫ জন সেপাহীর প্রহরায়। তখন পর্বতের উপর পড়েছিল গভীর তুষার এবং যখন খবর পাওয়া গেল প্রধান রাস্তাটি পথ চলার যোগ্য নয়, তখণ একটি ঘুরতি পথ ধরা হয় এবং একটি খাদের পার্শ্বে বৌতস্রো পল্লীর নিকটে রাস্তাটি এতো সংকীর্ণ ছিল যে, হাজী মুরাদ এবং তার প্রহরীগণ একজন একজন করে অতিক্রম করতে পারতেন। তার সামনের

চল্লিশ জন সশস্ত্র প্রহরী থাকায় তার পক্ষে পলায়নের কোন সম্ভাবনা থাকল না। কিন্তু আরও বেশি নিরাপত্তার জন্য তার কোমরে বাঁধা হলো রশি, সে রশির দু'প্রান্ত তার সবচাইতে নিকটবর্তী দুইজন সিপাহীর হাতে ছিল। সবচেয়ে সংকীর্ণতম জায়গাটিতে এসে তিনি তার দুই হাত দিয়ে রশিটি ছিনিয়ে নেন এবং নিজেকে নীচে গভীর খাদে নিক্ষেপ করেন। অন্য যে কোন ঋতুতে তার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হতো। কিন্তু ঘটলো অন্যরকম, যা কেউই ভাবেনি যে তিনি বেঁচে যেতে পারেন। এভাবে পতনের পর অবশ্য হাজী মুরাদ বরফে আটকা পড়ে যান। তা অর্থহীন ছিল না, তার একটি পা ভেঙ্গে গেলেও অন্য কোন জখম হয়নি। তিনি হামাগুড়ি দিয়ে নিকটবর্তী এক ভেড়া খামারে পৌঁছেন এবং বেঁচে থেকে তিনি হয়ে দাঁড়ালেন পূর্ব ককেশাসের আতঙ্ক এবং ঈমাম শামিলের সবচাইতে দুঃসাহসী ও সফল নায়ক। রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে ঈমাম শামিলের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করার অভিযোগ আনা হয়। তিনি প্রমাণ করেন যে, অভিযোগটি সত্য এবং ঈমামকে এমন বিপুলভাবে সাহায্য করেন যে, পূর্ব ককেশাসে তার নাম শুনে রাশিয়ানরা ভয়ে কম্পমান হয়ে উঠতো।

ঈমাম শামিল তার লোকজনদের ছড়িয়ে দিলেন, রুশ ফৌজ ফিরে গেল তাদের শীতকালীন আশ্রয়ে। সময়ে সময়ে এখনো যুদ্ধ চলতে থাকলেও বছরটি শেষ হলো শান্তিপূর্ণভাবে। কিন্তু অভিযানের ফল সম্পর্কে সংশয় উঠতে পারে না। রুশরা মোটামুটিভাবে ময়দানে সফল হলো, কিন্তু জমিনের উপর তাদের কর্তৃত্ব রইল না। ঈমাম শামিল ১২ মাস আগে যিনি ঢুকেছিলেন মাত্র ৭ জন সঙ্গী নিয়ে– তিনি এখন হয়ে উঠলেন গোটা জাতির প্রধান এবং একটা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলো দাগিস্তানের সীমান্ত থেকে ভ্লাদিকাওকাজের দৃশ্যপটের নিকট পর্যন্ত।

সম্রাট কর্তৃক অনুমোদিত ১৮৪১ সালের জন্য গোলোভিনের অভিযান পরিকল্পনায় ছিল চিলকেই গ্রামের বিপরীতে শৌলাকে একটি দুর্গ নির্মাণ। উদ্দেশ্য, ঈমামের পক্ষ অবলম্বন করার জন্য চিরকেইর অধিবাসীদের কঠিন শাস্তি দান। শৌরার প্রতিরক্ষা মজবুত করার জন্য নীজোভোতে একটি নতুন দুর্গ নির্মাণ, খুনজাকের প্রাচীন দুর্গটি পুনঃনির্মাণ করতে হবে। ১২০০০ সৈন্যের একটি রুশ বাহিনী এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে। চেচনিয়াতে এর চাইতে কিছুটা কম সংখ্যক ফৌজ সামনে-পশ্চাতে মার্চ করবে। যারা "দেশটিকে আগুন এবং তরবারীর সাহায্যে ধ্বংস করবে"। আরগুন গিরিসংকটের নিকটে একটি দুর্গ তৈরী করতে হবে। উত্তর ককেশাশে ফৌজ আরো শক্তিশালী করা হলো– চতুর্দশ পদাতিক ডিভিশনের সাহায্যে। এই ডিভিশনে ছিল ১৬ ব্যাটালিয়ন ফৌজ। আখুলগোর পর সম্রাটের আশংকা দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হয়েছিল; তিনি তাই এই আদেশের মাধ্যমে এই প্রত্যাশাই ব্যক্ত করেছিলেন যে, জেনারেল গোলোভিনের নেতৃত্বে যে সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছে "তার দ্বারা উপযুক্ত ফল অর্জন সম্ভব হবে"; অবশ্য

নিকোলাসের বাকি জীবনের জন্য এইসব সৈন্য মোতায়েন ও দুর্গ তৈরী তার অনেকটা হতাশারই কারণ হয়েছিল এবং চেচনিয়া বিধ্বস্ত হয়েছিল। অবশ্য চিরকেই বিজিত হয়েছিল, পরিকল্পিত দুর্গগুলো নির্মিত হয়েছিল এবং চেচনিয়া বিধ্বস্ত হয়েছিল। কিন্তু ৮ মাস অনিয়মিত যুদ্ধের পর এই ফৌজ আবার শীতকালীন নিবাসে চলে যায় এবং ঈমাম শামিলের অবস্থান হলো পূর্বের চাইতে আরও দৃঢ়তর; রুশ পরিস্থিতি ক্রমবর্ধমানভাবে বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। বিশেষ করে এই অবস্থা দাঁড়িয়েছিল দাগিস্তানের ক্ষেত্রে, যেখানে ঈমামের সঙ্গে হাজী মুরাদের মৈত্রীর ফলে মুরিদ ফৌজ হয়ে উঠেছিল প্রচন্ড শক্তিশালী। হাজী মুরাদ তার পতনের প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্ত হবার পর পরই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন তিসেলমেশে, খোন্‌জাকের অদূরে। ঈমাম কর্তৃক নায়েব নিযুক্ত হয়ে তিনি তার সমস্ত শক্তি এবং প্রভাব নিয়োগ করলেন আভারে তাঁর দেশবাসীদের মধ্যে, মুরীদিজমের লক্ষ্যকে সম্প্রসারিত করতে।

ইতিপূর্বে ১৮৪১ সালের জানুয়ারীতে হাজী মুরাদকে আবার আনুগত্যে আনার জন্য বার বার চেষ্টার পর ক্লুগেনু নিশ্চিত হলেন যে, তার বিরুদ্ধে সিরিয়াস ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। প্রায় ২০০০ সৈন্য নিয়ে গঠিত একটি ফৌজ, যার অর্ধেকই ছিল স্বাধীন মিলিশিয়া (অনিয়মিত ঘোড়সওয়ার), রওয়ানা করে তিসেলমেশের উদ্দেশ্যে, খোনজাক থেকে, যার সেনাপতিত্ব করেন জেনারেল বাকুনিন। তিনি ছিলেন ইম্পেরিয়াল রুশ গোলন্দাজ বাহিনীর কমান্ডেন্ট। তিনি ইতিপূর্বে ককেশাসে ছিলেন একটি পরিদর্শন টুরে। তিনি ভাবলেন তার অভিজ্ঞতা অভিযানকারী ফৌজের জন্য ফায়দাজনক হবে। এই বিশ্বাসের বশে তিনি কমান্ড গ্রহণ করেন। পাসেক ৬ই ফেব্রুয়ারীতে পল্লীটি আক্রমণ করলে কেবল একটি বাদে আর সকল দুর্গই বিজিত হলো। কিন্তু সেই দুর্গটি সাহসের সঙ্গে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে এবং এর ফলে যে যুদ্ধ চললো, বাকুলিন তাতে নিহত হলেন। স্থানীয় মিলিশিয়া নীরবে দাঁড়িয়ে রইল এবং রাশিয়ানরা তাদের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সৈন্য হারাল। অবশ্য পাসেক সময়মতো পশ্চাৎ অপসরণ করে খুনজাকে পৌঁছুতে পেরেছিলেন। হাজী মুরাদের পিতা ও তার দুই ভাইও শাহাদাত বরণ করেন এবং তিনি নিজেও আহত হন। চেচনিয়ায় আবার যুদ্ধ শুরু হয় ৩০শে মে– যখন গ্রাবি গারজেল পল্লী থেকে ১০,০০০-এর বেশী সৈন্যের এক ফৌজ নিয়ে ২৪টি কামানসহ রওয়ানা করেন। জেনারেল গোলোভিনে, যিনি তখন পর্যন্ত ছিলেন ককেশাসে কমান্ডার-ইন-চীফ, নিম্ন বর্ণিত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন ঃ

দারগো অভিযান

গ্রাবির লক্ষ্য ছিল দ্রুত দারগোতে পৌঁছান এবং ত্বরিৎগতিতে সেই পল্লীটি ধ্বংস করে উত্তর দাগিস্তান থেকে চেচেনিয়াকে যে পর্বতমালাটি বিভক্ত করেছে, তা

অতিক্রম করা এবং গোম্বেত ও আন্দিকে পদানত করা।

সেই সময়ে এই যুদ্ধের জন্য তিনি যে সৈন্য সংগ্রহ করেছিলেন তার বিশালতাই তার দক্ষতার জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তিনি তার সঙ্গে নিয়েছিলেন তার সামরিক রসদ ও রেশন, বহু সংখ্যক ঠেলাগাড়ী এবং প্রায় ৩০০০ ঘোড়া। রাস্তার দুর্গম প্রকৃতির কারণে এই মালপত্র ও রসদসহ অগ্রসরমান দলটি কয়েক মাইল ব্যবধান অতিক্রম করে এবং এটিকে রক্ষা করার জন্য সৈন্যদের একটি হালকা লাইনের জন্যও কলামের প্রায় অর্ধাংশের প্রয়োজন হয়। দু'টি ব্যাটালিয়ান পিছন দিকে এবং অবশিষ্ট কলাম ভেঙে পাহারা লাইন তৈরীর জন্য উভয়পার্শ্বে দাঁড়িয়ে যায় অভিযাত্রীদের সাহায্য করার জন্য। এতে সমগ্র ফৌজটি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে, কারণ বিভিন্ন ইউনিটকে সাহায্য করার জন্য কোন মানুষই পাওয়া যাচ্ছিল না। এছাড়াও একে অতিক্রম করতে হয়েছিল অত্যন্ত বড় রকমের সব অসুবিধা, কেবল প্রাকৃতিক অসুবিধাই নয়, বরং মুজাহেদীনের কর্মকান্ডও ছিল এর জন্য দায়ী। যারা ঠিকই বুঝতে পেরেছিল ইচকেরিয়ার গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে মার্চ করাতেই রয়েছে তাদের জন্য সাফল্যের একটি পথ এবং কঠিন দুর্গম উঁচু-নীচু পথ থেকে কলামটি সমতল অঞ্চলে এসে পৌঁছুলে ওরা আর মুজাহেদদের ক্ষতি করতে পারবে না। ৩০শে মে কলামটি মাত্র ৫ মাইল অতিক্রম করলো, তারা কোন বাধা পেল না, সারারাতই মুষলধারে বৃষ্টি হলো, এতে রাস্তা আরও খারাপ হয়ে যায় এবং অগ্রগতি এতটাই বিলম্বিত হলো যে, তারা ১৫ মাইল মার্চ করে পথে যুদ্ধ করতে করতে ৩১ তারিখে সন্ধ্যা পর্যন্ত মাত্র ৮ মাইল অগ্রসর হয় এবং রাত্রিকালের জন্য একটি পানিশূন্য প্রান্তরে অবস্থান করতে বাধ্য হয়।

পরদিন মুজাহেদীনের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পায়। যদিও বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ অনুযায়ী এর সংখ্যা ২০০০ এর বেশী ছিল না, কম ছিল। কেন না তাদের মূল ফৌজগুলো ছিল কোয়েমে ঈমাম শামিলের সঙ্গে, রাস্তাটি ছিল আরও দুর্গম, ঘন ঘন ব্যারিকেড্ তৈরী হয়েছিল রাস্তায় এবং দ্বিতীয় দিনে রুশ ফৌজের জন্য কোথাও পানি ছিল না, তারা সংখ্যায় ছিল কয়েকশত এবং ঘন্টায় ঘন্টায় বিভ্রান্তি বাড়তে থাকলো। এভাবে রুশ ফৌজ তিন দিনে মাত্র ২১ মাইল অতিক্রম করলো এবং জেনারেল গ্রাবি দেখতে পেলেন আর অগ্রসর হওয়া ইতিমধ্যেই অসম্ভব হয়ে পড়েছে। ১লা জুনের রাত্রিতে এই অভিযান পরিত্যাগ করে তিনি নির্দেশ দিলেন প্রত্যাবর্তন করতে। তাদের অগ্রগতি ছিল দুর্ভাগ্যজনক এবং প্রত্যাবর্তন ছিল অপরিমেয়ভাবে আরও বিপজ্জনক।

রুশ ফৌজ যখন দেখতে পেল অগ্রাভিযানের পথে সমস্ত বাধা অতিক্রমের পরও তারা ব্যর্থ হয়েছে এবং যেহেতু তারা ব্যর্থতার সঙ্গে অভ্যস্ত ছিল না, তাই তারা মনোবল হারিয়ে ফেলে, বিভ্রান্তি এবং নিয়ন্ত্রণের অভাব হয়ে পড়লো চূড়ান্ত। কেউই যথাযথ বিন্যাস করেনি এবং কলামটিকে একত্র রাখার জন্য কেউই কোন কষ্ট

করলো না। পশ্চাৎ অপসারণের জন্য যুদ্ধাভিযান ত্যাগ করা হয়ে পড়লো অপরিহার্য। অথবা যখন অবকাশ পাওয়া গেল তখন যা কিছু গতিপথে বাধা হতে পারতো সেগুলো দূর করা। কেবল আহতদের রক্ষার জন্য কামান বন্দুক এবং পথের কিছু বাধা অপসরণের প্রয়াস তাদের কাছে প্রতীয়মান হলো সম্পূর্ণ বিপর্যয় হিসেবে এবং রুশ ব্যাটালিয়নগুলো কুকুরের একটি চিৎকার শুনেও যুদ্ধ আরম্ভ করে দিতো। এই অবস্থায় ক্ষয়ক্ষতি অনিবার্যভাবেই হয়ে পড়েছিল বিপুল।

এই বিবরণে আতিশয্য ছিল না। আসলে পরিস্থিতি এতো খারাপ হয়ে পড়েছিল যে, এর চাইতে আর খারাপ হতে পারতো না। মুজাহেদীন যে গেরিলা অনুসরণ করে তা রাশিয়ানদের মনোবল ধ্বংস করে দেয় এবং তাদের হতাশা হয়ে পড়ে চূড়ান্ত। শোয়েব মোল্লা মোজাহেদীনের আদেশ দিলেন চেচনিয়ার উজান অঞ্চলে পশ্চাৎদিকে সুদৃঢ় বৃক্ষরাজি ঘেষে দুর্জয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে। এই বৃক্ষগুলো এতো বৃহৎ ছিল যে, তার আড়ালে ৩০-৪০ জন বন্দুকধারী দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে পারতো। ককেশাসে যে গেরিলা যুদ্ধ চলছিল তার জন্য এ গাছগুলো ছিল সম্পূর্ণ উপযুক্ত। এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এতো মজবুত ছিল যে, রুশ ব্যাটালিয়নগুলো পর্যন্ত তা ধ্বংস করতে সক্ষম হলো না।

অবশেষে জুন মাসের ৪ তারিখে চেচেন কলাম ফিরে গেল ঘারজেল পল্লীতে। যুদ্ধে নিহত, আহত এবং হারানো মিলে ক্ষয়ক্ষতি ছিল ৬৬ জন অফিসার এবং ১৭০০০ জন সেপাই। তাছাড়া হারাল একটি ফিল্ডগান এবং রেশন ও যন্ত্রপাতির ভান্ডারের প্রায় সমস্ত কিছু।

এই শিক্ষায় সন্তুষ্ট না হয়ে কিছুদিন পরেই গ্রাবি এবার দাগিস্তানে দ্বিতীয় অভিযান শুরু করেন। সাতানিক এর পথে ধাবিত হয়ে তারা অশীলতার অদূরে ইগালি দখল করে নেয়। কিন্তু মুরীদেরা তা পুড়িয়ে ভষ্মিভূত করে দিয়েছিল। ২৮শে জুনের রাতে 'জেনারেল গ্রাবি প্রত্যাবর্তন করেন সাতানিকে, ১১ জন অফিসার এবং ২৭৫ জন সৈন্য হারিয়ে। ইগালি থেকে রাত্রিকালীন এই পশ্চাৎ অপসারণে একই বিশৃঙ্খলা এবং ক্ষয়ক্ষতি হলো– ইচ্‌কেরিয়ার জঙ্গলের মধ্য দিয়ে প্রত্যাবর্তনের মতো, যখন মুজাহেদীনের সংখ্যা এই সময়ে ৩০০০ যোদ্ধার বেশী ছিল না।"

১৮৩৯-১৮৪২ সাল পর্যন্ত চার বছরে রাশিয়ানদের প্রায় সব ক'টি অভিযানই গ্রাবির প্রত্যক্ষ কমান্ডে পরিচালিত, এই অভিযানগুলোতে রাশিয়ানরা হারায় ৬৪ জন অফিসার এবং ১৭৫৬ জন সেপাই এবং আহত হয় ৩৭২ জন অফিসার এবং ৬২০৪ জন সৈনিক। অথবা হারানো সমেত একুনে ক্ষয়ক্ষতি ৪৩৬ জন অফিসার এবং ৭৯৬০ জন সৈনিক। অথচ তারা সফল হয়েছিল অতি সামান্যই, কিংবা বলতে গেলে কোনো সাফল্যই অর্জন করেনি। ঊনিশ ও একুশ রেজিমেন্ট্রের একজন কমান্ডিং অফিসারও জীবন্ত পালাতে পারেনি। ১৮৪২ সালের দিকে রেজিমেন্টগুলো তাদের যুদ্ধশক্তির অর্ধেকেরও বেশী হারিয়ে ফেলে।

অধ্যায় ঃ ছয়

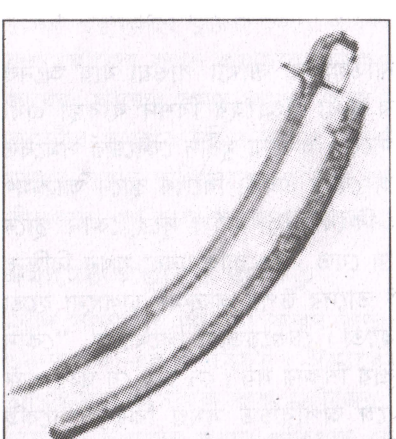
ঈমাম শামিলের সফল অভিযানসমূহ

১৮৪৩ সালের শরৎকালের মধ্যে ঈমাম শামিল একটি চূড়ান্ত অভিযানের জন্য তার প্রস্তুতি সম্পন্ন করেন। একটি স্থায়ী সেনাবাহিনীর নিউক্লিয়াস সৃষ্টির জন্য এবং অবশিষ্ট বাসিন্দাদের উপর একই সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ অক্ষুণ্ন রাখার জন্য তিনি মুর্তাজেক নামে এক সহস্র ঘোড়সওয়ার বাহিনী গড়ে তোলেন। এ বাহিনী গড়ে তোলার জন্য তিনি প্রত্যেক ১০টি বাড়ী থেকে একজনকে বাছাই করলেন– যার দায়িত্ব ছিল যে কোন আদেশের জন্য মুহূর্তের মধ্যে তৈরী থাকা, যার বদলে গ্রামবাসীরা তাদের খোরপোশের ব্যবস্থা করে। তারা মুর্তাজেকদের ঘোড়াগুলোকে খাওয়াবে। গ্রামবাসীদের জমি চাষ করবে এবং তাদের ফসল তুলবে। উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এর চাইতে অধিকতর ও চমৎকার ব্যবস্থার কল্পনা করা যায় না। ঈমাম শামিল প্রত্যেকটি পল্লীতে তার উক্ত অনুসারীদের একটি নিবাচিত দলের সংগঠন গড়ে তোলেন। যাদের দায়িত্ব ও অধিকার ছিল তাদের অভিরুচি মতো সমান। মুর্তাজেক্‌দের ১০ জন, ১০০ জন এবং ৫০০০ জনের দলে ভাগ করা হলো এবং প্রত্যেকের নেতা নির্বাচিত হন দলের উপযুক্ত এবং গুরুত্ব অনুসারে একজন নেতার নীচে। তাদের জন্য ইউনিফর্মের ব্যবস্থা হলো। সেপাইরা পরত হলুদ এবং অফিসারগণ কালো রঙের (Tcherknesses) এবং উভয়ই পরতো সবুজ পাগড়ি। ১০০ জন ও ৫০০ জনের নেতারা, যারা ছিলেন সাধারণভাবে নায়েব, তারা তাদের বুকে পদক ধারণ করতেন, যাতে খোদাই করে লেখা থাকতো **আল্লাহর সাহায্যের চাইতে প্রবল সাহায্য আর কোথাও নেই**। অন্যেরা যারা সাহস এবং সদাচরণের জন্য বিশেষভাবে চিহ্নিত ছিলেন, তাদের জন্য তাদের পরিচিতি জ্ঞাপক মেডেল তৈরী হয়েছিল। বিখ্যাত আখওয়ার্দি মোহুমা– যিনি ছিলেন নায়েবদের মধ্যে সর্বপ্রধান, তিনি একটি তরবারী বহন করতেন যাতে খুদিত ছিল "এর চেয়ে সাহসের যোদ্ধা নেই, ধারালো তরবারী নেই। প্রয়োজনের মুহূর্তে মুর্তাজেকদের মধ্যে প্রতিগৃহ থেকে আরও একজন করে নেয়া হতো, যারা থাকতো অস্থায়ী নেতাদের নেতৃত্বে এবং একইভাবে ছিল তাদের বিভাগ এবং ভীষণ জরুরী অবস্থায় প্রতিটি পল্লী বা জেলায় অস্ত্র বহনে সক্ষম প্রতিটি ব্যক্তিকে আহবান করা হতো যারা বীর পুরুষের কাজ করতো। তারা তার কাছে পেতো প্রতি মাসে দুই ব্যাগ আটা এবং সীমান্তে যুদ্ধরত বীরেরা পেতো তাদের ভেড়ার চামড়ার হ্যাটের উপর একটি বর্গাকৃতি সবুজ কাপড়। যারা যুদ্ধে কাপুরুষতা দেখাতো, তাদেরকে শাস্তি দেয়া

হতো তাদের পিঠে একটি ধাতব টিকেট সেঁটে দিয়ে। অবশ্য যদিও তারা অঙ্গহানি বা মৃত্যু থেকে রেহাই পেতো। দাগিস্তানে কাপুরুষতা ছিল অত্যন্ত বিরল একটি বস্তু। কচিৎ কখনো তার প্রমাণ মিলতো। ঈমাম কখনো নীতির প্রশ্নে আপোষ করেননি এবং তিনি তার বিশ্বাসে ছিলেন অবিচল। শরীয়তের আইনের বিরুদ্ধে যারা কাজ করতো, তাদের কাউকেই ক্ষমা করতেন না। ওমরের (রাঃ) মতো তিনিহাতে একটি লাঠি রাখতেন প্রত্যেকটি দুষ্কৃতিকারীকে শাস্তি দেবার জন্য। ঈমামের এই কঠোরতা না থাকলে এতো অল্প সময়ে জাহিলিয়ার কুসংস্কার ও অনৈতিক কাজকর্মের মূল উচ্ছেদ করা কিছুতেই সম্ভব হতো না। ঈমামের পলিসি বিরাট সাফল্য অর্জন করে এবং অল্পকালের মধ্যেই শরীয়ত প্রচলের ক্ষেত্রে বিপুল অগ্রগতি সাধিত হয়।

ককেশাসে রুশ ফৌজ চরম দুর্দশার সম্মুখীন হয়। তাদের স্বাভাবিক সামরিক প্রশিক্ষণ ছাড়াও তাদেরকে দূর্গ এবং ব্যারাক তৈরী করতে হতো, জঙ্গল কাটতে হতো এবং ঘোড়া ও জীবজন্তুর ঘাস আনতে হতো। আবহাওয়া খুব খারাপ হলে তাদেরকে যে খাদ্য আনতে হতো তা ছিল খুব নিম্নমানের এবং তারা ক্ষুধা ও শীতে জর্জরিত হতো। তাদের বাড়ী-ঘর থেকে অনেক দূরে তাদের প্রিয়জনের সঙ্গ থেকে নির্বাসিত হয়ে, তাদেরকে শত্রুর করুণার উপর নির্ভর করতে হতো বলে অনেক সময় সৈন্যরা বিপুল সংখ্যায় দল ত্যাগ করে পালিয়ে যেতো। এ সব অভিযানে আমরা বার বার দলত্যাগীদের কথা শুনতে পাই। এই পরিস্থিতির ফল হলো এই যে, হামজাদবেগের দেহরক্ষীদের পুরো দলটি গঠিত হয়েছিল রুশ দলত্যাগীদের নিয়ে।

ঈমামের গেরিলা দলসমূহ



ঈমাম শামিলের তরবারি

ঈমাম শামিলের সামরিক পদ্ধতির একটি বড় রকমের সুবিধা ছিল। এর বদৌলতে তিনি তার ফৌজকে তার ইচ্ছামতো এবং অবিশ্বাস্য রকমের অল্প সময়ের মধ্যে জমায়েত করতে বা ছত্রভঙ্গ করে দিতে পারতেন। তিনি যে যুগে তার কৌশল ও গেরিলা পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলেন তার বিবেচনায় এগুলো ছিলো অতুলনীয় এবং চরম উৎকর্ষের পরিচায়ক। দিলীম-এ তার কেন্দ্রীয় অবস্থান থেকে তার উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণের শত্রুদের জন্য তিনি আতংকের কারণ হয়ে দাঁড়ালেন, তিনি অবিরাম তার যাত্রাপথে তার গেরিলা দলগুলোকে ভেঙ্গে

তাদের বাড়ী-ঘরে পাঠালেন, যেন যাদুবলেই তিনি আবার তাদেরকে একত্রিত করলেন অশ্বারোহী ফৌজদের অসাধারণ দ্রুতগিতে– যাদের কোনো ব্যাগেজের দরকার হতো না। প্রত্যেক সেপাই তার সঙ্গে যা বহন করতো তাছাড়া আর কোন আসবাব বা রসদের দরকার হতো না। তিনি রুশদেরকে বার বার আক্রমণ করতেন– যেখানে রুশরা শত্রুর আক্রমণের আশংকাও করতো না। গেরিলা শব্দটি উদ্দেশ্যমূলকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ এ কেবল তার নায়েবদের পরিচালিত ফৌজের ক্ষেত্রেই সঠিকভাবে প্রযুক্ত নয়, ঈমাম শামিলের সমস্ত যুদ্ধ পদ্ধতির ক্ষেত্রেও তা প্রযুজ্য। চেগুয়েভারা অথবা মাও সেতুং-এর অনেক আগেই তিনি গেরিলা যুদ্ধের নীতি উদ্ভাবন করেছিলেন, যার ফলে তার স্থান গেরিলা যুদ্ধ প্রবর্তনে অগ্রবর্তীদের মধ্যে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। বর্তমান ঘটনায় তিনি দাগিস্তানে শত্রুর অবস্থানের দুর্বলতা সম্পূর্ণ বুঝতে পারলেন। তিনি এই দুর্বলতাকে সম্পূর্ণভাবে তার কাজে লাগালেন। ময়দানে একজন উত্তম কমান্ডারের মতো তিনি তার শত্রুর দুর্বল পয়েন্টগুলো বুঝতে পেরেছিলেন এবং এর সবচাইতে উপযুক্ত সুযোগ তিনি নিয়েছিলেন। তার পরিকল্পনা কার্যকর করা হলো চমৎকারভাবে এবং সেগুলো বিপুল সাফল্য লাভ করলো। ঈমামের পুরনো শত্রু রুশ জেনারেল ক্লুগেনু ঈমামের প্রতিভা ও বুদ্ধিমত্তার কাছে কিছুই না। ১৬ই আগস্ট তিনি খবর পাঠালেন যে, মুরীদ জমাত ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে এবং এখন সবই শান্ত ও নীরব। তবু ২৭ তারিখে ঈমাম শামিল একটি ফৌজের প্রধান হিসাবে দিলীম থেকে রওয়ানা করলেন এবং ২৪ ঘণ্টার কম সময়ে তাকে দেখা গেল ৫০ মাইল দূরে অন্টসকূলে। এখানে একই দিনে তিলিতল থেকে কীবীত এবং আভারিয়া থেকে হাজী মুরাদ প্রত্যেকে বিশাল দল নিয়ে ঈমামের সঙ্গে যোগ দিলেন, সম্মিলিত ফৌজ সংখ্যায় ১০০০০ জনে দাঁড়ালো।

মুরীদ যুদ্ধগুলোর ইতিহাসে উপরে উদ্ধৃত নীতিমালার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় অনেক বিক্ষিপ্ত ঘটনায়। রুশ কমান্ডারেরা তাদের তথ্য সংগ্রহের বিশদ ব্যবস্থা এবং গুপ্তচক্রের মাধ্যমে সংবাদ সংগ্রহের ব্যবস্থা সত্ত্বেও কখনো মুরীদ ফৌজের সমবেত হবার স্থান খুঁজে পেতো না এবং যখন তারা কোন একটা বিশেষ স্থানে আক্রমণ প্রত্যাশা করতো, মুরীদ ফৌজ তখন ৭০ কিংবা ৮০ মাইল দূরে কোন স্থানে আক্রমণ করতো এবং ঐ রাত্রেই গায়েব হয়ে যেত এবং রাশিয়ানরা যখন বিভিন্ন কলাম নিয়ে অগ্রসর হতো সাধারণত তখনই তাদের উপর আক্রমণ চালানো হতো এবং তাদের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি সাধন করা হতো। চেগুয়েভারা লিখেছেন, "কোন স্থানে বেষ্টিত শত্রু কখনো গেরিলা যোদ্ধার প্রিয় শিকার নয়। সে চায় যে তার শত্রু চলমান থাকবে ভীত অবস্থায়– ঘাটির সঙ্গে অপরিচিত সমস্ত কিছু সম্পর্কেই আতংকিত হয়ে এবং প্রতিরক্ষার কোন প্রাকৃতিক সুযোগ না থাকায়"।[২]

২। *চেগুয়েভারা প্রাগোক্ত, পৃষ্ঠা-৫৪।*

একজন সফল কমান্ডার হিসাবে ঈমাম শামিল

সকল অভিজ্ঞ সামরিক নেতার মতই ঈমাম শত্রু অবস্থানসমূহের সকল দুর্বলতার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তিনি যে রুশ ফৌজের প্রচন্ড শক্তি ছিন্নভিন্ন করে দেন, এর কারণ তিনি শত্রু ফৌজের সমস্ত দুর্বল দিকগুলো সম্পর্কে সতর্ক ছিলেন। ছোট ইউনিটে বিভক্ত হয়ে রুশ ফৌজ সমস্ত দাগিস্তানে ছড়িয়ে ছিল। এই নিরাপত্তাহীন দুর্বল ফৌজগুলো একে অপর থেকে ছিল বিচ্ছিন্ন। যে কারণে এরা ঈমামের গেরিলা দলের সহজ শিকারে পরিণত হয়েছিল। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, এইভাবে শত্রুর মোকাবিলা করা সম্ভব।

তিনি তার অভিযানগুলো সংগঠন এবং পরিকল্পনা এমন চমৎকারভাবে করেন যে, তিনি শত্রু ফৌজের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সকল তথ্য দক্ষতা ও পরিপূর্ণতার সঙ্গে সংগ্রহ করেন যা অনেক স্টাফ অফিসারের সাহায্য নিয়েও কোন চীফ-অব-স্টাফের পক্ষে করা সম্ভব ছিল না। কমান্ডার ইন চীফ এবং চীফ অব স্টাফের পরিচালনায় অফিসারদের একটি টিম যুদ্ধ পরিকল্পনা তৈরী করতে ব্যস্ত ছিল এবং এই অভিজ্ঞ অফিসারগণ ছিল পেশাগতভাবে দক্ষ। তাদের বুকের উপর ছিল কয়েক সারি ফিতা, যাদের নেতৃত্বের অধীনে ছিল গোলন্দাজ, সশস্ত্র বাহিনী ও পদাতিক বাহিনীর সকল সম্পদ। অর্ধ শতাব্দি ধরে দাগিস্তানে নগর দুর্গের বিরুদ্ধে যারা মাথা ঠুকে মরছে এদের বিরুদ্ধে মোকাবিলায় দন্ডায়মান ছিল দাগিস্তানের সম্পদ ও রসদহীন মোজাহেদীন, যাদের কামান বন্দুক বা অন্য অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ছিল না, যাদেরকে কোন যুদ্ধ একাডেমীতে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়নি, যারা কখনো অপারেশন কক্ষে মানচিত্রের সাহায্য নিয়ে যুদ্ধের পরিকল্পনা করেনিএবং জারের ফৌজের মতো বহু যুদ্ধের সম্মুখভাবে যুদ্ধের কোন অভিজ্ঞতা যাদের ছিল না, তবুও দীর্ঘকালের জন্য রুশ ফৌজের সকল প্রয়াসকে তারা ভোতা করে দেয়। রাশিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে জারের ফৌজের সমস্ত ক্ষমতা ধ্বংস হয়ে যায়। তারা এই সাহসী পর্বতবাসীদের দুর্দমনীয় আত্মাকে দমিত করতে পারেনি। বড় বড় মহান অভিজাত পরিবারের বহু মশহুর সন্তান দাগিস্তানের পার্বত্য অঞ্চলে ঢলে পড়ে এবং শিলারাশির মধ্যকার ফাঁকগুলো পূর্ণ হলো বহু রুশ মৃতদেহের স্তূপে, কিন্তু তাদের কোন লাভই হয়নি।

ঈমামের অত্যুন্নত ব্যক্তিত্ব

মুরীদ সাফল্যের অন্যান্য কারণ ছাড়াও ঈমামের অত্যুন্নত ব্যক্তিত্ব ছিল অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। ঈমামের দূরদৃষ্টি এবং তার সামরিক ধীশক্তি দাগিস্তানবাসীদেরকে রুশ ফৌজের বিরুদ্ধে বিশাল সাফল্য অর্জনের সহায়ক হয়েছে। ঈমামের প্রধান প্রতিপক্ষ জেনারেল ক্লুগেনু ঈমামের সামরিক প্রতিভার কোন ধারণাই কখনো করতে পারেননি। তিনি ঈমামের বিরুদ্ধে বহু যুদ্ধ পরিচালনা

করেন, তবু ঈমামের মৌলিকতা, দক্ষতা এবং তার ফৌজের সঠিক পরিমাপ করতে পারেননি।

এখানে একটি চিত্তাকর্ষক ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৮৪৩ সালের ১৬ই আগস্ট ক্লুগেনু রুশ হেড কোয়ার্টারে জানান যে, মুরীদ ফৌজেরা ধ্বংস হয়ে গেছে এবং পুনরায় আইন ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়েছে। এই রিপোর্টের মাত্র ১১ দিন পরে ঈমাম শামিল এক বিশাল ফৌজ নিয়ে ভেলীম থেকে অগ্রসর হন এবং ২৪ ঘন্টার মধ্যেই পৌঁছেন অন্টসকুলে– যেখানে তিলিতল থেকে কীবীত মোহুমা এবং আভারিয়া থেকে হাজী মুরাদ তাদের কলামগুলো নিয়ে মিলিত হন ঈমামের সঙ্গে এবং মোট সৈন্য সংখ্যা দাঁড়ায় ১০,০০০ জনে। এই দীর্ঘ পথে পর্বতমালাগুলো অতিক্রম করা এবং একই সময়ে সেখানে পৌঁছুনো ঈমামের অতুলনীয় সামর্থই প্রমাণ করে। এখানে বলা যেতে পারে যে, এ সমস্তই ঘটেছিল ক্লুগেনুর একেবারে নাকের নীচে এবং ক্লুগেনু যে ঈমামের এইসব অগ্রগতির কিছুই প্রতিহত করতে পারেননি, তা ঈমামের প্রতিভারই বিপুল সাক্ষ্য বহন করে। **তাকে পৃথিবীর সামরিক ইতিহাসে অনায়াসেই প্রথম সারির কমান্ডারদের মধ্যে গণ্য করা যেতে পারে। উঁচু দরের গেরিলা নেতা-জাতীয় খেতাব দ্বারা তার পূর্ণ বিবরণ সম্ভব নয়। এ কথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, তার প্রতিভাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে– ইতিহাস তেমন একজন কমান্ডারেরও দৃষ্টান্ত পেশ করতে সক্ষম নয়।**

রুশ ফৌজের সাহস বা বীরত্ব এবং তাদের অফিসারদের চমৎকারিত্ব সম্পর্কে কেউই সংশয় প্রকাশ করতে পারে না। ওরা বেপরোয়াভাবে যুদ্ধ করেছিল। তাদের জেনারেলরা অপারেশন রুমে মানচিত্র অধ্যয়ন করেননি। অনেকেই যুদ্ধক্ষেত্রে মারা যান। তাদের চরিত্র এবং বীর্যবত্তার উপর কেউ কোন মন্তব্য করতে পারবে না। সন্দেহ নেই যে তারা ছিলেন জারের ফৌজের সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা। তবুও ঈমামের প্রতিভার সঙ্গে তুলনা করলে তাদেরকে বামনের মতো মনে হয়। উপর্যুপরি প্রায় এক ডজন জেনারেল ঈমামের বিরুদ্ধে লড়াই করেন। পেশাগত দক্ষতাসহ তারা ঈমামের ফৌজের মোকাবিলা করেন এবং প্রত্যেকেই পরাজিত হন। অনেক সময় ঈমামের বেঁচে থাকার কোন সম্ভাবনাই ছিল না, তার কমরেডরা সবাই শাহাদাত বরণ করেন এবং রাশিয়ানদের বর্ণনা মতে ঈমামের আন্দোলনকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়া হয়েছে– তরবারী ও আগুনের সাহায্যে সমগ্র দাগিস্তানকে ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে। **রুশ বর্বরতার মর্মন্তুদ কাহিনীগুলো জনতার হৃদয়ে সৃষ্টি করেছিল ব্যাপক আতংক।**

তবুও রুশ গোলন্দাজদের একবার মাত্রও গোলাবর্ষণে ভীত হয়ে যে লোকগুলো পলায়ন করেছিল তারা এই অল্প সময়ের মধ্যে রুশ গোলন্দাজ বাহিনীর প্রধানকে হত্যা করে এবং সপ্তাহের পর সপ্তাহ অবিশ্রান্ত গোলাগুলির পরও তারা পরাজয়

স্বীকার করতে রাজী ছিল না। এই লোকগুলো রুশ হামলার বিরুদ্ধে যে বীর্যবত্তার সঙ্গে লড়াই করে টিকে থাকতে এবং তাদের প্রত্যেকটি আক্রমণকে ভোতা করে দিতে সক্ষম হয়– ইতিহাসের আলোকে এইসব ঘটনার ব্যাখ্যা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। কেউই এসব ব্যাপারে বুঝতে পারে না। ঈমাম শামিল ছিলেন একটি প্রজ্জ্বলিত অগ্নিস্বরূপ যা জারের সৈন্যদের হাজারে হাজারে গ্রাস করে ফেলে। প্রত্যেক জেনারেলকে নতুন পরাজয়ের সম্মুখীন হতে হয় এবং প্রত্যেক কমান্ডারই তাদের হিসাব-নিকাস সংশোধন করতে বাধ্য হন।

অন্টসকুলের আত্মসমর্পণ

অন্টসকুলের অধিবাসীরা ঈমামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তারা এক বছর পূর্বে ঈমামের ৭৮ জন মুরীদকে রুশ কমান্ডারের হাতে সমর্পণ করে এবং রাশিয়ানদেরকে তাদের গ্রামে একটি তাঁবু স্থাপন ও একটি সেনানিবাস বা সেনা ছাউনি নির্মাণ করতে দেয়। এই বিশ্বাস ভঙ্গকারী লোকগুলো যাতে উচিত শিক্ষা পায়, যেন ভবিষ্যতে তারা ঈমামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে ও শান্তিপূর্ণভাবে সহজে বসবাস করতে না পারে, এ জন্য এই বিশ্বাস ভঙ্গকারী লোকদেরকে উচিত শিক্ষাদানের প্রয়োজন ছিল। ঈমাম এইসব বিদ্রোহীদেরকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করার জন্য এবং সেনা ছাউনি ধ্বংসের জন্য পরিকল্পনা করেনএবং তাদের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তাদেরকে দন্ডিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর পুরো পরিকল্পনাটি খুটিনাটিসহ সম্পাদন করেন।

ঘিমড়িতে কর্নেল ভেসেলীটস্কী যখন শুনতে পেলেন ঈমামের আগমনের কথা তিনি নির্দেশের কোন অপেক্ষা না করেই দ্রুত বেরিয়ে পড়লেন অন্টসকুল রক্ষা করার উদ্দেশ্যে। পথে তার সঙ্গে মিলিত হলেন মেজর গ্রাবোভস্কি, যিনি একইভাবে একই উদ্দেশ্যে কোন কর্তৃত্ব ছাড়াই তার সঙ্গে এনেছিলেন সাতানিখের গ্যারিসনের একটি অংশকে। এখন তারা আরও দু'টি কোম্পানী সংগ্রহ করলেন খারাতচীতে এবং এই সম্মিলিত ফৌজ যার সৈন্য সংখ্যা ৫০০-এর বেশী ছিল না– ২টি কামানসহ ভেসেলীটস্কী এদের নিয়ে অন্টসকুলের দিকে মার্চ করেন। ২৯ তারিখের সকালে তার কামানগুলো পল্লীর উপরে একটি উঁচু জায়াগায় রেখে তিনি বাগানগুলোতে অবতরণ করেন এবং সেগুলো দখল করার চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রচুর ক্ষয়ক্ষতিসহ তাকে বিতাড়িত করা হয়। ইত্যবসরে তার শত্রুরা তাকে ঘিরে ফেলে উঁচু এলাকাগুলোর উপর হামলা চালায় এবং কামানগুলো দখল করে নেয়। অবশিষ্ট হতভাগ্য রুশ ফৌজদেরকে তৎক্ষণাৎ ঘিরে ফেলা হয় এবং বিশৃঙ্খলভাবে তাদেরকে নদীর তীরে বিতাড়িত করা হয়। ইত্যবসরে তার শত্রুরা তাকে ঘিরে ফেলে উঁচু এলাকাগুলোর উপর হামলা চালায় এবং কামানগুলো দখল করে নেয়।

অবশিষ্ট হতভাগ্য রুশ ফৌজদেরকে তৎক্ষণাৎ ঘিরে ফেলা হয় এবং বিশৃঙ্খলভঅবে তাদেরকে নদীর তীরে বিতাড়িত করা হয়। ভেসেলীটস্কীকে বন্দী করা হয়। গ্রাবোভস্কী, শূল্ট্জসহ ৯ জন অফিসার এবং ৪৭৭ জন সিপাহী নিহত হয়। সমস্ত ফৌজের মধ্যে মাত্র কয়েকজন লোক সাঁতার কেটে কৌসু নদী পার হয়ে আত্মরক্ষা করে। যেভ্দোকীমোফকে ক্লুগেনু তাড়াহুড়া করে পাঠিয়েছিলেন সাতানিখে। তিনি পূর্বোল্লিখিত অফিসারদের উন্মত্ত গতিবিধির কারণে বাধাপ্রাপ্ত হন এবং কোন কিছু সাহায্য করতে না পেরে দূর থেকে তাদের প্রত্যক্ষ করেন। দুইদিন পরে রুশ দুর্গের গ্যারিসন ঈমাম শামিলের কাছে আত্মসমর্পণ করে। তিনি রুশ দূর্গের বীরোচিত প্রতিরক্ষায় খুবই মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং বীরত্বের সঙ্গে দুর্গটি রক্ষা করার সংগ্রাম চালানোর জন্য লেফটেন্যান্ট আনসোফকে তাঁর তরবারীটি ফেরত দেন। ইমাম গ্রামটি আক্রমণ করে দখল করে নন।

ক্লুগেনুর উদ্ধার

ইত্যবসরে ক্লুগেনু চাতনিখ পৌঁছেছিলেন। সেখানে তিনি ১০০০ সৈন্যের এক ফৌজ সংগ্রহ করেন। খারাত্চীর গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানটি রক্ষা করার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল মেজর কসোভিচের উপর, যার অধীনে ছিল ২১০ জন নিয়মিত সৈন্য এবং স্থানীয় কিছু মিলিশিয়া। তার উপর নির্দেশ ছিল কোন অবস্থাতেই যেন খারাত্চী পরিত্যাগ না করেন। তবুও ঈমাম শামিলের আগমন সংবাদে তিনি এতোটা ভীত হয়ে পড়েছিলেন যে, আক্রান্ত হবার অপেক্ষা না করেই তিনি তার অবস্থান পরিত্যাগ করেন এবং বালাখানিতে ফিরে যান। খারাত্চি পুনঃর্দখলের প্রয়াসটি ছিল প্রথম একটা সাহসী অথচ ব্যর্থ চেষ্টা। এই চেষ্টায় তাদের নেতা মেজর যাইত্সেফ্ ৫ জন অফিসার ও ১১০ জন সৈন্যসহ মারা যান। আহত হন ৩ জন অফিসার এবং ৬৮ জন যোদ্ধা। শৌরার সঙ্গে ক্লুগেনুর যোগাযোগ ব্যবস্থা এখন সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে পড়লো। তিনি উভয় সংকটে পড়লেন। তিনি কি তাদেরকে রক্ষা করার জন্য বালাখানীতে ফিরে যাবেন, অথবা আভারিয়ার গ্যারিসনকে রক্ষা করার জন্য তিনি আভারিয়াতে ফিরে যাবেন? তিনি আভারিয়ার গ্যারিসন রক্ষা করার জন্য তার অবস্থান ছেড়ে খুনজাখের দিকে রওয়ানা করলেন। এখানে তিনি ঈমাম শামিল কর্তৃক বেষ্টিত হয়ে পড়লেন, যতক্ষণ না ১৪ই সেপ্টেম্বর মেজর জেনারেল প্রিন্স আর্গোটিনিস্কী দোলগোকোফ দক্ষিণ দাগিস্তান থেকে যুদ্ধ করতে করতে অগ্রসর হন, তাঁর উর্ধ্বতন অফিসারের বিপন্ন অবস্থার খবর পেয়ে। এখন খুনযাকে সম্মিলিত ফৌজের সংখ্যা দাঁড়ালো ৬০০০-এর উপর। কিন্তু তারা ঈমামের ফৌজের কোন ক্ষতি করতে পারলো না।

রুশ দুর্গের আত্মসমর্পণ

ইত্যবসরে অন্টসকুলে তার হঠাৎ আবির্ভাবের ২৫ দিনের মধ্যে (২৭শে আগস্ট থেকে ২১শে সেপ্টেম্বর) ঈমাম শামিল রাজধানী বাদে আভারিয়ার সকল সুরক্ষিত দুর্গ দখল করেন। ১৪টি কামান তার হস্তগত হয়। এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে তাদের মৃত, আহত এবং যুদ্ধবন্দী অফিসার ও ফৌজের সংখ্যা ১৯৯৯ জনে দাঁড়ায়। অত্যন্ত কাপুরুষোচিতভাবে আখালচি্ ছেড়ে দেয়া হয়...কমান্ডিং অফিসার কর্তৃক একটিমাত্র গুলিও না ছুঁড়ে খাড়াতসী পরিত্যক্ত হলো। অবশ্য অন্য দু'টি স্থানে মুরীদ ফৌজের বিরুদ্ধে রুশ ফৌজ মরিয়া হয়ে লড়াই করে।

ঈমাম শামিল খোন্জাকে রুশদের উপর আক্রমণ করলেন না, যদিও হাজী মুরাদ তাকে রুশদের উপর আক্রমণের জন্য তাগিদ দিয়েছিলেন। এ ধরনের কোন ঝুঁকির মধ্যে না গিয়েই অন্য উপায়ে আভারিয়া থেকে রুশ ফৌজের প্রত্যাহার অর্জন সম্ভব ছিল, বিপুল অভিজ্ঞতার অধিকারী ঈমাম শামিলের তা না জানার কথা নয়। তিনি চিনকাতে ফিরে গেলেন এবং সেখান থেকে দীলিমে। তারপর ৩০শে সেপ্টেম্বর আক্রমণ করেন আন্দ্রেয়েভো এবং নিকটবর্তী দুর্গ ভিনেজপানাইয়া। কিন্তু এই অভিযান রুশ কমান্ডার কর্নেল কোজলো ভোস্কির বীরত্ব ও দ্রুত বুদ্ধিমত্তার জন্য ব্যর্থ হয়। ঈমাম শামিল তখন লোকজনদেরকে ফৌজ ভেঙ্গে নিজ নিজ ঘর-বাড়ীতে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু দিলীমে তার আবার আবির্ভাবের কারণে রাশিয়ানদের পক্ষে আভারিয়াতে তাদের ফৌজের বেশিরভাগকে আটকে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই ক্লুগেনু ২৮শে সেপ্টেম্বর শোরা পৌঁছান। গ্যারিশনের পিছনে রেখে গেলেন পাসেককে। খোন্জাকে ৪টি ব্যাটালিয়ানসহ তিনি আর্গোতিনসকিকে রেখে গেলেন বালাখানিতে– আরো ৪টি অতিরিক্ত ব্যাটালিয়নসহ তিনি তার স্থানীয় দাগিস্তানে চলে যান। পেছনে রেখে যান দৃশ্যত মাত্র দেড় ব্যাটালিয়ন সৈন্য, বালাখানি এবং জিরীয়ানীতে। এখন উত্তর দাগিস্তান এলো লেঃ জেনারেল গোরকোর অধীনে, যিনি সুপ্রীম কমান্ড গ্রহণ করেছিলেন জামায়েত ১৭ ব্যাটালিয়ন সৈন্যের। এর মধ্যে বেয়োনেটধারী ৯০০০ ঘোড়সওয়ার যোদ্ধাসহ। কিন্তু রাশিয়ানরা দু'টি মারাত্মক ভুল করে ফেলে, যা ঈমামের ঈগলচক্ষু এড়িয়ে যেতে পারেনি। ঘারঘেবিলের গুরুত্বপূর্ণ ফৌজটি রক্ষিত ছিল কেবল ৩০৬ জন তীফলিস রেজিমেন্টের যোদ্ধার দ্বারা। মাত্র কয়েকজন ছিল গোলন্দাজ এবং ইরগানাই গিরিসংকট এবং শুরার মধ্যবর্তী রোন্দৌককালের পাহারা দুর্গটিতে ছিল হাতে গোনা কয়েকজন লোক– এদের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিল রাশিয়ানরা। তবুও এই দু'পয়েন্টের শুরু এবং আভারিয়ার মধ্যবর্তী একমাত্র পথটি পাহারা দিতো এবং একবার তা দখল হয়ে গেলেই পাসেকের ফৌজ এবং বালাকানি ও জিরিয়ানীর গ্যারিশনকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন

করে দেয়া সম্ভব ছিল।

১৮৪৪ সালের অক্টোবরের মাঝামাঝিতে ঈমাম শামিল হুকুম দিলেন, প্রত্যেক ব্যক্তি– যার একটি গাভী এবং একজোড়া বলদ আছে, অর্থাৎ খুবই দরিদ্র ব্যক্তি ছাড়া প্রত্যেককেই একটি ঘোড়া সংগ্রহ করতে হবে। এতে কৌমিক প্রান্তর এবং তেরেক উপত্যকায় অবরোধের একটি সংকেত ছিল। একই সঙ্গে কীবীত মোহুমা এবং হাজী মুরাদকে নির্দেশ দেয়া হয়, তাদের গেরিলা ফৌজকে তিলিতল এবং কারাতায় সমবেত করার জন্য। এভাবে দেখা যায়, সকল পয়েন্টের উপর আক্রমণ আসন্ন। গুর্কো ভয়ানক আতংকিত হয়ে পড়লেন। শেষ পর্যন্ত তিনি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছুলেন যে, উত্তর অঞ্চলে বিপদ বেশী। তাই তিনি ২২শে অক্টোবর শুরা ছেড়ে দিলেন এবং ফ্রিতাগের সঙ্গে সুসমন্বিত অভিযানের মাধ্যমে, যিনি ছিলেন বা-পার্শ্বদেশের কমান্ডে, তিনি তা দখল করে নিলেন। ঈমাম শামিল, কেবল বিরাট কোন ঝুঁকি না নিয়েই আক্রমণ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি গোরকোকে শোরা থেকে সরিয়ে দিতে পেরেই সন্তুষ্ট ছিলেন এবং এটা করে ঘারগেভিল এবং পরিণামে খুনজাখ দখল নিশ্চিত করলেন।

যে শত্রু সব পয়েন্টে নিজেকে রক্ষা করার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী নয়, তার বিরুদ্ধে ভিতর থেকে আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, কোথাও কোথাও তিনি সাফল্যের সঙ্গে আঘাত করতে পারবেন। পুনর্বার তার কৌশল কর্মক্ষেত্রে যৌক্তিক প্রমাণিত হলো। ৩০শে অক্টোবর উত্তর অঞ্চলের বিপদ এড়ানো গেছে, এতে সন্তুষ্ট হয়ে গোরকো শুরায় ফিরে গেলেন। কিন্তু পথেই তিনি খবর পেলেন যে, দু'দিন আগে কীবীত মোহুমা ঘারগেবিল অবরোধ করেছেন। তিনি তার সম্ভাব্য সকল ফৌজ সমবেত করলেন। তার মধ্যে ১৬০০ জন ছিলো বেয়োনেটধারী। তারা ঘারগেবিল পুনরুদ্ধারের জন্য রওয়ানা করলেন। কিন্তু ৬ই নভেম্বর যখন তিনি কাউন্সিল অব ওয়ারের কমান্ডার হিসাবে নিম্নে তাকিয়ে দুর্গটি দেখতে পেলেন, তখন তিনি বুঝতে পারলেন, এর উদ্ধার অসম্ভব। তাই তিনি গ্যারিসনটিকে নিজের ভাগ্যের উপর ছেড়ে দিয়ে শুরায় ফিরে গেলেন। সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার এই যে, দুর্গের ভিতরে রাশিয়ানদের পরিত্যাগ করা হলো, যখন বাইরের সাহায্য ছিল নিশ্চিত দুর্গ রক্ষাকারীরা চরম হতাশায় ভুগলেও মেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই করে।

ঘারগেবিল পতনের সঙ্গে সঙ্গে গৌর্কো পাসেককে নির্দেশ দেন খোনজাখ থেকে সরে আসতে। কিন্তু খবরটি তিনি পেলেন মাত্র ১১ তারিখে এবং তখন এই হুকুম পালন করা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছিল– কেননা ট্যানোস এবং ইরগানাই মুজাহেদীন ফৌজ কর্তৃক ইতিমধ্যেই দখল হয়ে পড়েছিল। ১৬ তারিখে গৌর্কো যখন দেখলেন, হাজী মুরাদ ঈমাম শামিলের সঙ্গে যোগদানের জন্য চলে গেছেন,

তখন তিনি দ্রুততার সঙ্গে চূড়ান্ত গোপনতার মধ্যে তার প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন এবং রুগ্ন ও আহতদেরসহ গোলা-বারুদ নিয়ে নিরাপদে জিরিয়ানীতে পৌঁছলেন। এখানে তিনি সঙ্গে সঙ্গে বেষ্টিত হয়ে পড়লেন এবং মুজাহিদীনের হাতে পুরো একটি মাস নানা যন্ত্রণা ভোগ করলেন। ইত্যবসরে ১৮৪৪ সালের ৯ই নভেম্বর মুজাহিদীন টার্কোর নিকটবর্তী ১৫ জন প্রহরীর একটি দলকে ধ্বংস করে শোরার নিকট অঞ্চলে আবির্ভূত হয়। পর দিন ঘিমড়ীর গ্যারিশনকে খালি করে চলে যায় রাশিয়ানরা। ১১ তারিখে ঈমাম শামিল কাযানীশচীতে, শোরা থেকে ১০ মাইল দূরে সশরীরে আবির্ভূত হন এবং গ্রামটিকে চারদিক থেকে দখল করে গোরকোকে তার রাজধানীতে ঘেরাও করে ফেললেন। নীযেভোর আটদিনের অবরোধ ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে এবং দুর্গ ইউফেনিভস্কোও ঘেরাও হয়ে পড়লো। ফলে জিরীয়ানীতে ১৭ তারিখে খোনজাখ ফৌজ যখন আটকা পড়ে গেল, তখন উত্তর দাগিস্তানে প্রতিটি রুশ সৈন্য এই চারটি স্থানের কোন না কোন জায়গায় অবরুদ্ধ হয়ে পড়লো। এ ছিল ঈমামের একটি চমৎকার পদক্ষেপ। এতে তার অত্যুচ্চ সামরিক প্রতিভার পরিচয় মেলে। জেনারেল ফ্রিতাগের সৈন্যদল যোগদান না করলে কোন একজন রুশ সৈন্যেরও বেঁচে থাকার আশা ছিল না। তাহলেও রাশিয়ানরা ২৭শে আগস্ট থেকে হারায় ২৯ জন অফিসার এবং ২৫৩৮ জন সৈন্য, ১২টি সুরক্ষিত স্থান এবং ২৭টি কামান।

আখওয়ার্দা মোহুমার শাহাদাত বরণ

এ বছর ঈমাম শামিল অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জণ করেন। কিন্তু এর মধ্যে একটি বিষাদপূর্ণ ঘটনা ঘটে। হাজী মুরাদের চাইতে অতি সামান্য কম বীর্যবান, ছোট্ট চেচনিয়ার নায়েব, ঈমামের প্রিয় লেফটেন্যান্ট আখওয়ার্দা মোহুমা শাহাদাত বরণ করেন। কয়েক হাজার সৈন্যের একটি ফৌজের সেনাপতি হিসাবে আখওয়ার্দা শাতিলের বিরুদ্ধে অভিযান করেন– চান্তি আর্গুনের উজানে খেওসৌর দুর্গের বিরুদ্ধে। স্থানটি রক্ষা করার জন্য রাশিয়ানরা বীরত্বপূর্ণভাবে সংগ্রাম করে এবং অবরোধের তৃতীয় দিবসে মহান মুরীদ নেতা শাহাদাত বরণ করেন– যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি সমগ্র জীবন বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে লড়াই করেছেন। তিনি ছিলেন ঈমামের নিকটতম এবং পরম উৎসাহী সঙ্গীদের একজন। তাঁর শাহাদাৎ বরণ আন্দোলনের জন্যও ছিল এক অপূরণীয় ক্ষতি।

বিস্ময়কর ঘটনা

আল্লাহ্‌র প্রতি যাদের বিশ্বাস ছিল না জিহাদের পরীক্ষায় তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এদের মধ্যে কয়েকজন রুশ সরকারের কাছে আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত করে বসে।

অবশ্য তারা জানতো যে, ঈমামের অনুমতি ছাড়া এ ধরনের কোন আপোস তাদের জন্য মারাত্মক পরিণাম বহন করে আনবে। তারা ঈমাম শামিলের আম্মাকে বুঝিয়ে স্বমতে আনতে চেষ্টা করে। ঈমামের আম্মা ছিলেন একজন সম্মানিত বৃদ্ধা মহিলা, নেক চরিত্র ও হৃদয়ের মহত্বের জন্য সুবিখ্যাত। কোমল হৃদয় সেই মহিলা রুশ অত্যাচারের কাহিনীতে বিচলিত হয়ে স্থির করেন তিনি তার পুত্রের কাছ থেকে এই অনুগ্রহ প্রার্থনা করবেন।

সেই সন্ধ্যায় বৃদ্ধা মহিলা ঈমাম শামিলের সঙ্গে সাক্ষাত করেন এবং গোপনে দীর্ঘ সাক্ষাতকারের পর তিনি ফিরে এলেন কাঁদতে কাঁদতে, রক্তাক্ত চোখে। সেদিন সন্ধ্যায় মা ও সন্তানের মধ্যে কি ঘটেছিল, তা কেবল অনুমান করা যেতে পারে।

ঈমাম যা করেছিলেন তা ছিল নিম্নরূপ ঃ

চেচেনদের চারজন ডেপুটি, যারা তার মায়ের কাছে অনুগ্রত ভিক্ষা করেছিল, তাদেরকে শাস্তি না দিয়ে তিনি ঘোষণা করলেন যে, তিনি রোজা রাখবেন এবং প্রার্থনা করতে থাকবেন, যতক্ষণ না তিনি সঠিক সিদ্ধান্তের ব্যাপারে তার অন্তরে স্থির নিশ্চিত হন। তাই তিনি নিজেকে মসজিদে বন্দী করেন এবং তার আদেশে সেই মসজিদের চারপাশে মুরীদগণ ও দার্গোর অধিবাসীরা জমায়েত হন– যাতে তারা সহজেই ইবাদতে শামিল হতে পারেন। তিন দিন তিন রাত দরজা বন্ধ করে থাকার পর মুজাহিদীনরা সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহকে ডাকলেন। অতঃপর ঈমাম শামিল তার লোকজনদের কাছে বেরিয়ে এলেন। বিবর্ণ কাহিল চোখে রক্তের উচ্ছ্বাস– যেমনটি ঘটে অনেক কান্নার পর। তার দুইজন মুরীদকে নিয়ে তিনি মসজিদের সমতল ছাদে উঠলেন এবং তার আদেশে তার আম্মাকে সেখানে নিয়ে আসা হলো একটা সাদা শালে আবৃত করে। দুইজন মুল্লা তাকে পথ প্রদর্শন করে নিয়ে আসেন। তিনি ধীর পদক্ষেপে তার পুত্রের সামনে দাঁড়ালেন। শামিল কোন কিছু না বলে কিছুক্ষণ তার আম্মার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। অতঃপর শূন্যে চোখ তুলে ঘোষণা করলেন, "হে মহা নবী মোহাম্মদ (তার উপর দরূদ বর্ষিত হোক), পবিত্র এবং অপরিবর্তনীয় তোমার আদেশ, সমস্ত মুমীনদের জন্য একটা দৃষ্টান্ত হিসাবে আপনার ন্যায়ের আদেশ পূর্ণ হোক।"

তারপর উপস্থিত লোকদের দিকে তাকিয়ে তিনি ব্যাখ্যা করে বললেন, চেচেনরা তাদের জেহাদের অঙ্গীকার বিস্মৃত হয়ে স্থির করেছিল গিয়াউর-এর কাছে আত্মসমর্পণ করবে এবং তারা তাদের ডেপুটিকে পাঠিয়েছিল– যারা ঈমামের কাছে সরাসরি আসতে সাহস না করে তার আম্মার কাছে সাক্ষাত করে এ ব্যাপারে তাঁর হস্তক্ষেপ লাভের আশায়।

"আম্মাজান এবং তাঁর প্রতি আমার সীমাহীন ভক্তি আমাকে অনুপ্রাণিত করে

আল্লাহ্‌র রাসূল হযরত মোহাম্মদের অভিপ্রায় জানবার জন্য, আমাকে দেয় সাহস এবং তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এখানে তোমাদের উপস্থিতিতে তোমাদের ইবাদত বন্দেগীর সহায়তায় আমি তিনদিনের বন্দেগী এবং রোজার পর তার জবাবের করুণা পেয়েছি। কিন্তু এ জবাব আকাশের বজ্রপাতের মতোই আমাকে আঘাত করেছে। এ হচ্ছে আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় যে, চেচেনদের লজ্জাজনক অভিপ্রায় যিনি আমার কাছে প্রথম ব্যক্ত করেছেন, তাকে পেতে হবে ১০০টি প্রচন্ড ঘুষি এবং সেই ব্যক্তি হচ্ছেন আমার আপন মা।"

তারপর ঈমামের আদেশে মুরীদদেরকে সেই শাস্তি কার্যকর করতে বলা হলো। পঞ্চম ঘুষির সময় তাঁর মা মূর্ছিত হয়ে পড়েন। তখন ঈমাম শামিল সহ্য করতে না পেরে শাস্তিদানকারীদের হাতকে নিবৃত্ত করেন এবং তার মায়ের পায়ে লুটিয়ে পড়েন। অশ্রু বিসর্জন করতে করতে এবং করুণ আর্তনাদের সঙ্গে লোকগুলো তাদের কল্যাণকারিনী মহিলার জন্য করুণা প্রার্থনা করলো। ঈমাম শামিল তার মধ্যে যে ভাবাতিশয্য জাগ্রত হয়েছিল, তা কয়েক মুহূর্তে মুছে ফেলেন এবং আবার আকাশের দিতে তাকিয়ে গম্ভীর স্বরে ঘোষণা করলেন, "আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মোহাম্মদ তাঁর রাসুল। হে বেহেস্তবাসীরা, তোমরা আমার অন্তরের কান্না শ্রবণ করেছ এবং আমাকে আমার হতভাগিনী মায়ের জন্য নির্ধারিত অবশিষ্ট আঘাতগুলো আমার নিজের উপর গ্রহণ করতে আমাকে অনুমতি দিয়েছ। এই আঘাতগুলো আমি একটি অমূল্য দান হিসাবে গ্রহণ করছি।" এরপর ঠোঁটে হাসি বিচ্ছুরিত করে লাল জুব্বা গা থেকে খুলে ফেললেন এবং মুরীদ দু'জনের হাতে Nogai চাবুক দিয়ে তাদেরকে জানিয়ে দিলেন যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং রাসূলের ইচ্ছাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার দুঃসাহস করবে তিনি তাকে নিজ হস্তে কতল করবেন। অতঃপর ভয়ানক যন্ত্রণাকে সামান্যতমও ব্যক্ত না করে নীরবে অবশিষ্ট ৯৫টি আঘাত তিনি গ্রহণ করলেন। তারপর তিনি পুনরায় তার জুব্বা পরে মসজিদের ছাদের উপর থেকে নেমে এলেন এবং লম্বা লম্বা ধাপে তিনি পৌঁছুলেন ভীত-বিহ্বল জনতার মধ্যে এবং জিজ্ঞাসা করলেন নেই পাষন্ডরা কোথায়, যাদের জন্য আমার মাকে এহেন লজ্জাজনক শাস্তি পেতে হলো। তখনই কম্পমান ডেপুটিদেরকে টেনে-হিঁচড়ে তার পায়ের উপর নিচু করা হলো, তাদের ভাগ্য সম্পর্কে কারো কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু বিস্ময়ের সঙ্গে তারা লক্ষ্য করলো এবং নীরব রুদ্ধশ্বাস জনতা দেখতে পেল, তাদের প্রতি যে চরম শাস্তি প্রত্যাশিত ছিল, ইমাম তার বদলে বললেন, তোমরা তোমাদের লোকজনদের কাছে ফিরে যাও এবং তাদের নির্বোধ দাবীর জবাবে তোমরা যা কিছু দেখেছ এবং শুনেছ, তাদেরকে তা জানিয়ে দাও।

নিকোলাসের পত্র

সম্রাট নিকোলাসের সেইন্ট পিটার্সবুর্গে তার বিলাসবহুল প্রাসাদে বসে তার জেনারেলরা যে সব বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন, তা কল্পনার দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করাও নিকোলাসের ছিল প্রায় অসম্ভব। তিনি জেনারেল নীদহার্টকে আদেশ দিলেন "পার্বত্য অঞ্চলগুলোতে প্রবেশ কর। শামিলের সকল দলবদল ও বাহিনীকে পরাভূত করে ছড়িয়ে দাও, তার সকল সামরিক সংস্থা ধ্বংস করে দাও। পার্বত্য অঞ্চলে সকল অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে নাও এবং সেইসব স্থানকে সুরক্ষিত কর– যেগুলোকে আমাদের দখলে অক্ষুণ্ন রাখা প্রয়োজন হতে পারে।" এই উদ্দেশ্যে তিনি আদেশ দিলেন ককেশাস ফৌজদের অতিসত্ত্বর ২৬ ব্যাটালিয়ন সৈন্য দিয়ে শক্তিশালী করতে হবে। তাদের মধ্যে ছিল গুপ্ত পরিখা খননের জন্য সৈনিক, চার রেজিম্যান্ট কসাক এবং রাশিয়া থেকে আনা ৪০টি কামান। তাছাড়া ইতিমধ্যে সৈন্য সংখ্যা পূর্ণ করা হয়েছিল স্থানীয়ভাবে ২০,০০০ অভিজ্ঞ যোদ্ধা ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত রিক্রুট দ্বারা। "তোমাদের কাজের পরিকল্পনা সম্পর্কে যুদ্ধমন্ত্রী সকল আদেশ দিলেন। এইগুলো আমি যে ফৌজ বরাদ্দ করেছি, এসবই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য। এর সম্পূর্ণ বা আংশিক গ্রহণ করবে না করবে, এ ভার তোমার উপর। কিন্তু মনে রাখতে হবে এই বিশাল উপায় উপকরণ থেকে আমি অনুরূপ ফল প্রত্যাশা করি। অভিযানগুলো হতে হবে চূড়ান্ত এবং সোজা লক্ষ্যস্থলে, কোন পার্শ্বইস্যুতে না জড়িয়ে। কোন অবস্থাতেই আমি যে সৈন্য-সামন্ত ককেশাসে আপনার নেতৃত্বে অর্পণ করেছি, তাদেরকে ১৮৪৪ সালের ডিসেম্বরের পর ককেশাসে রাখা চলবে না।"

সম্রাট এ পরামর্শ দিলেন যে, যত অর্থই লাগুক ঈমাম শামিলের কিছু সমর্থককে, বিশেষ করে সাবেক ওস্তাদ ও তার শ্বশুর জামাল উদ্দিন আখোশা ও সোদাখরের কাজীদেরকে এবং তিলিতলের কীবীত মোহুমাকে ঘুষ দিয়ে বশে আনতে হবে। এরপর ঈমামের ঘনিষ্ঠজনের মধ্যে সকল রকম বিরোধ ও দ্বন্দ্ব ছড়িয়ে দেয়া হবে এবং চূড়ান্ত অবস্থায় বিভিন্ন কবিলাকে প্রশমিত করতে হবে। এই ঘোষণাও প্রচার করতে হবে যে, ধর্ম সম্পত্তি অথবা স্থানীয়দের রীতিনীতির বিরুদ্ধে কিছুই করা হবে না। ইংরেজরা একই রকম কৌশল অবলম্বন করেছিল ১৮৬৩ সালে আম্বালা যুদ্ধের সময় যখন তারা লিখিতভাবে বিভিন্ন গোত্রের কাছে জানিয়ে দিয়েছিল তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে মালকাতে মুজাহিদীনের সুরক্ষিত দূর্গের ধ্বংস সাধন এবং তারা কখনও এবং কিছুতেই বিভিন্ন গোত্রের ধর্ম বা রীতিনীতিতে হস্তক্ষেপ করবে না।[১]

১৮৪৩ সালে ঈমামের সাফল্য কেবল তার সামরিক অপারেশনের দৃশ্যপটেই সীমাবদ্ধ ছিল না। কাস্পিয়ান সাগরের মুখোমুখি কৈতাগো এবং তাবাসসারান

1. Paget and Masson, A Record of the expedition against the north west fronfier tribes.

জিলাগুলোও রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করেছিল। দক্ষিণ দিকে রুশ বিদ্রোহী আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র কাজী কুমোক অঞ্চলগুলোতে এবং জারো সম্প্রদায়গুলোতেও এবং তাতে পার্শ্ববর্তী মুসলিম প্রদেশগুলোতে বিদ্রোহের ঢেউ লাগে। উত্তর দিকে, এমনকি শান্তিপূর্ণ কৌমুক পতাকাগুলোও চঞ্চল হয়ে উঠে এবং ভ্লাদি ওয়াকাজের পশ্চিমে যুদ্ধপ্রিয় কাবারাদাতেও জিহাদের জন্য প্রচন্ড আগ্রহ দেখা যায়। ঈমাম শামিলের বাণী ছড়িয়ে পড়েছিল সমগ্র ককেশাস অঞ্চলে এবং রাশিয়ান সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ঈমাম হয়ে উঠেন কেন্দ্রীয় নেতা।

ঈমাম শামিলের প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা এমন দক্ষতার সঙ্গে রচিত হয়েছিল যে, আভারকৌসুতে ফৌজের সেনাপতি রুশ জেনারেল লুডার্স ১৮৪৪-এর জুলাইতে আভারিয়া আক্রমণ করতে সাহস পাননি। এই দিকে কীবীত মোহুমার সুরক্ষিত স্থানে আরগোটিনস্কি দলোরোকোফ কর্তৃক তীলিতল অভিযানও ব্যর্থ হয়। চেচনিয়ার মতো অন্যত্র প্রচুর অনিয়মিত যুদ্ধ হয়– যাতে রাশিয়ানরা প্রত্যক্ষ যুদ্ধের অভিজ্ঞতা অর্জন করে। কিন্তু মারাত্মক রকমের কোন মোকাবিলা হয়নি। ঈমাম শামিলের জনপ্রিয়তা বেড়েই চলে এবং ককেশাসের বিরাট অঞ্চলে তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। জেহাদের আদর্শ এতোই জনপ্রিয় হয়ে উঠে যে, এলিসৌ-এর সুলতান দানিয়েল, যিনি ছিলেন একজন স্থানীয় শাসক এবং রুশ বাহিনীতে কর্মরত মেজর-জেনারেল ঈমামের সঙ্গে যোগ দেবার সিদ্ধান্ত করেন এবং পরবর্তী সময়ের জন্য তিনি দক্ষিণ দাগিস্তানের সবক'টি জেলায় ঈমাম শামিলের পক্ষে সমর্থন আদায় করেন।

অধ্যায় ঃ সাত

বিফল দার্গো অভিযান

১৮৪৪ সালে স্বল্প ফল লাভে নিরাশ হয়ে সম্রাট নিকোলাস, যিনি ছিলেন একজন স্বৈরাচারী এবং কখনো চাইতেন না যে কেউই তার থেকে সামান্যতম ভিন্নমত পোষণ করুক, নতুন পরিকল্পনা তৈরী করলেন– ইতিপূর্বে যে পর্বতগুলোকে জয় করতে পারেননি, সেইগুলোকে অধিকার করতে হবে।

এইসব পরিকল্পনার সাফল্য সুনিশ্চিত করবার জন্য তিনি জেনারেল নীদহার্টের স্থলে কাউন্ট ভোরনসফ্‌কে নিযুক্ত করলেন। এই কাউন্ট নেপোলিয়নিক যুদ্ধে একজন চমৎকার সেনাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তিনি ছিলেন একজন অভিজাত, তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। তৎসঙ্গে তাঁকে করা হলো ককেশাসে ভাইসরয় বা সম্রাটের প্রতিনিধি। উৎকৃষ্টতম যুদ্ধ সামগ্রী দিয়ে ককেশাসের ফৌজকে সজ্জিত করে, তিনি প্রত্যাশা করেছিলেন তিনি অনুরূপ ফল পাবেন এবং তাকে তিনি প্রকাশ্যেই বললেন, ককেশাস থেকে বছর শেষ হবার আগেই যোদ্ধাদলগুলোকে ফিরে আসতে হবে।

সেন্ট পিটার্সবুর্গে মন্ত্রণাকক্ষ থেকে সোজা বেরিয়ে নতুন সেনাপতি প্রতিজ্ঞা করলেন, তিনি সম্রাটের ইচ্ছাগুলো পূরণ করবেন এবং সেন্ট পিটার্সবুর্গের পরিকল্পনার ব্যাপারে স্থানীয় জেনারেলদের আপত্তিকে কোন গুরুত্বই দিলেন না– ঠিক যেমন ইতিপূর্বে তার বর্তমান সেনাপতির পূর্বসূরী তাদের মতামতের কোন তোয়াক্কা করেননি। অবশ্য অল্পকালের মধ্যেই সাফল্যের সম্ভাবনা সম্পর্কে তিনি তার অন্তরে কিছু সংশয়কে স্থান দিয়েছিলেন। ২৫শে মে তিনি যুদ্ধমন্ত্রীকে লিখলেন– "যদিও আমিএই বছর আক্রমণাত্মক যুদ্ধের আদেশ পেয়েছি, চেচেন অগ্রবর্তী লাইনটি নির্মাণ শুরু করার আগেই এই আদেশটি ছিল আমার নিজ মত থেকে ভিন্ন, যেমন সকল স্থানীয় জেনারেলের অভিমত থেকেও তা পৃথক, কিন্তু এখানে সবাইকে আমি খোলাখুলি বলে বেড়াচ্ছি যে, আসলে তা নয়; তাই আমার কাছে শামিলকে এড়িয়ে চলা এবং সম্ভব হলে তার কোন ক্ষতি না করা, অভিজ্ঞজনোচিত মনে হয়। কারণ এতে অন্য সকল বিষয় থেকে আমাদের জন্য তা হবে সহায়ক। ঈশ্বর যদি আমাদেরকে সাফল্য দিয়ে অনুগ্রহ করেন, তবু আমাদের দু'টি আদেশ পালন করা হয়েছে বলে গণ্য করা হবে, আমাদেকে নিন্দাবাদ করা চলবে না। তখন আমরা কিছু সময় পরে নিয়মমাফিক পদ্ধতির দিকে দৃষ্টি ফেরাব। এর সুফল আমরা পাব।

তবে খোদ শামিলের উপর আমাদের বিজয় অপেক্ষা এতো দ্রুত তা সাধিত হবে না।" যখন অভিযানের নেতা সম্ভাব্য ব্যর্থতার কথা বলেন এবং তার সকল মুখ্য অধঃস্তনেরা তা সম্ভাব্য বলে মনে করে সে স্থলে সাফল্যের সম্ভাবনা কতদূর তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রকৃত সত্য এই যে, সেন্ট পিটার্সবুর্গের কর্তৃপক্ষ ঈমাম শামিল এবং তার ফৌজের প্রকৃত শক্তি সম্পর্কে বলতে গেলে কোন জ্ঞানই রাখতো না। তারা তাকে কেবল একজন জনতার একটি দলের নেতা বলে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতো এবং ভাবতো অধিক যুদ্ধ সামগ্রী এবং অধিক সংখ্যক সৈন্য সরবরাহ করলেই ঈমাম নতি স্বীকার করতে বাধ্য হবে। অবশ্য ইতিহাসে এর কোন পূর্ব দৃষ্টান্ত ছিল না। যাক, তারা সামরিক শক্তি এবং অপরিসীম সামর্থ্য নিয়ে অহংকারে এতোটা স্ফীত ছিল যে, পরাজয়ের সম্ভাবনাকে সরাসরি নাকচ করে দেয়। মানচিত্রের রূপরেখার উপর এবং যুদ্ধ কাউন্সিলের পরিকল্পনার উপর নির্ভর করতো বলে তাদের কাছে রুশ ফৌজ বাস্তবে যে সব অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিল– তার কোন ধারণাই তাদের ছিল না।

অনেক সময় তারা তাদের কমান্ডারকে এমন দায়িত্ব দিতেন, যা তাদের জন্য আত্মঘাতী প্রমাণিত হবে। কমান্ডারগণকে তা কার্যকর করতে বাধ্য করা হবে। তারা তাদের কর্তৃপক্ষের আদেশ থেকে বিন্দু পরিমাণ ভিন্ন কিছু করতে পারতেন না, এমন কি কাউন্ট ভরনসোফ তার যুদ্ধ মন্ত্রীকে এই ভাষায় লিখতে পেরেছিলেন– "আমরা অবশ্য আমাদের উদ্যোগ থেকে সাফল্যের কোন প্রত্যাশা করতে পারি না। তবুও আমি সম্রাটের অভিপ্রায়কে কার্যকর করার জন্য এবং তার আস্থার যুক্তিযুক্ততা প্রমাণের জন্য আমার সামর্থ মতো সবকিছুই করব"। পরদিন ভিনেজাপনাইয়া থেকে তিনি মার্চ করেন তার চেচনিয়া বাহিনী নিয়ে। তার সঙ্গে দাগিস্তানের কলাম এসে যোগ দেয়। তাতে মোট সৈন্য সংখ্যা দাঁড়ালো ১৮,০০০ জন– যার মধ্যে ১২টি পদাতিক ব্যাটালিয়ন, ২টি কোম্পানী ইঞ্জিনিয়ার, ৮৩টি কোসাক কোম্পানী, ১০০০ স্থানীয় মিলিশিয়া এবং ২৮ জন জেনারেল। দাগিস্তানের কলামে ছিল ৯টি ব্যাটালিয়ন, ২ কোম্পানী ইঞ্জিনিয়ারদের গুলি ছোঁড়ায় দক্ষ কৌশলী দুইটি কোম্পানী, ৮টি ঘোড়সওয়ার রেজিমেন্ট এবং ১৮টি কামান, এর আগে আর কখনো এতো বড় বিশাল ফৌজ দাগিস্তান এবং চেচেনিয়া আক্রমণ করেনি।

ঈমাম শামিলের সামরিক প্রতিভা

ঈমাম শামিল স্বভাবতঃই নিজের এবং তার শত্রু পক্ষের ব্যাপারে ক্রিয়াশীল সকল অবস্থার নিখুঁত এবং চূড়ান্ত বিচার-বিবেচনার উপর নির্ভর করে তার কৌশল স্থির করেন। তিনি আর্গুতিনেস্কী যেরূপ উল্লেখ করেছিলেন, তাতে করে জানতেন যে,

রুশ ফৌজ বর্তমান অবস্থায় পর্বতগুলো ভেদ করে আরোহন করতে পারবে, কিন্তু সেখানে তারা নিজেদের রক্ষা করতে পারবে না। তিনি এও জানতেন যে, খোলাখুলি যুদ্ধে এ ধরনের একটি ফৌজকে পরাজিত করার কোন জাগতিক সম্ভাবনাই তার নেই। এমন কি ওরা যখন মার্চ করে অগ্রসর হবে, তখনো সিরিয়াস কোন হয়রানি তাদের করতে পারবে না। যদিও ফৌজ এবং অশ্বরাজি নতুন এসেছে, যুদ্ধ সামগ্রী প্রচুর এবং রসদ যথেষ্ট, তার সুযোগ-সুবিধা আসবে পরে, যখন রুশ হানাদারেরা পরিশ্রমে জীর্ণ, অনটনে এবং ক্ষুধায় দুর্বল হয়ে গৃহাভিমুখে দাগিস্তানের বৃক্ষলতা শূন্য পাহাড় পর্বত অথবা ইচেরিয়ার জঙ্গলের ভিতর দিয়ে মার্চ করার অবস্থায় উপনীত হবে। তখনই ঈমাম শামিল তাদের উপর ছেড়ে দিবেন তার দ্রুতগতি যোদ্ধাদলকে, আল্লাহ্‌র অভিশাপের মতো, তাদের সম্মুখের রাস্তা ভেঙ্গে দিবেন। সম্মুখ অথবা পশ্চাৎ রক্ষীদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলার জন্য প্রত্যেকটি সুযোগ গ্রহণ করবেন। শত্রু ফৌজের মধ্যবর্তী কলামকে তাদের মালসামানা ও রসদ বহনকারী দল এবং আহতদের দীর্ঘ সারিকে বিভ্রান্তির মধ্যে নিক্ষেপ করতে পারবেন এবং দিনরাত কোন সময়ে তাদেরকে ফুসরত দিবেন না। বড় জোর তারা যুদ্ধ করে করে সওলাক অথবা সুঞ্জাতে তাদের মূল কেন্দ্রে ফিরে যেতে সমর্থ হবে। তবে ঈমাম শামিল লক্ষ্য রাখবেন এ অবস্থা যেন এমন হতাশাব্যঞ্জক হয় যে, নিজের চোখেই তারা কাস্পিয়ান থেকে কৃষ্ণসাগর, তেরেক থেকে পারস্য সীমান্ত পর্যন্ত প্রতিটি বাসিন্দার কাছে হেয় হয়ে পড়বে। ইত্যবসরে তিনি তাদেরকে প্রলুব্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় ফৌজ প্রদর্শন করবেন এবং আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের সাহায্যে তিনি যদি দার্গোর অরণ্য শক্তিকেন্দ্রে তাদেরকে প্ররোচিত করতে সক্ষম হন সে অবস্থায় তাদেরকে উচিত শিক্ষা দেবার একটা সুযোগ হবে, যেমনটি তিনি ১৮৪২ ভরনসফ এবং গ্রাবিকে শিক্ষা দিতে পেরেছিলেন। একজন সুদক্ষ কৌশলী কর্তৃক নিপুণতার সঙ্গে তৈরী ফাঁদে পড়ে গেল রুশ ফৌজ।

রুশ অগ্রগতি

রুশ কলামগুলো ১৮৪৫-এর ৩রা জুন একত্র হয়ে একই দিনে তাদের মার্চ শুরু করে এবং তেরেন্‌গুল পার হয়ে, যা আগের বছর একটি অভিযানকে প্রকাশ্য বিরোধিতার সম্মুখীন করেছিল, তারা পুরানো বৌরতোনাই দখল করে নেয় কোন প্রতিরোধ ছাড়াই। এতে তারা মনে করেছিল ঈমামের ফৌজের উপর এখানে তারা একটি সাফল্য অর্জন করবে। তারা নিরাশ হয়ে পড়ে। ৫ তারিখে কার্ক গিরিপথের (৮০৭০ ফুট) একটি তথ্যানুসন্ধানী দল সালাতু গোম্বেটের মধ্যবর্তী স্থানে একটি সমগ্র সেনাবাহিনীর সম্মুখ অগ্রগতির রূপ নেয়। গিরিপথটি ছিল অরক্ষিত এবং

পাসেকের নেতৃত্বে রুশ অগ্রগতির রক্ষীবাহিনী পরিত্যক্ত দুর্গ উদাসনিয়াতে দুর্গের বিপরীত দিকে অবতরণ করে। দুর্গটি ১৮৩৯ সালে আর্গুয়ানী এবং আখুলগো অভিমুখে যাত্রার পথে নির্মাণ করেছিলেন এবং একটি কামানসহ ৩০০০ মুজাহেদিনের দোদুল্যমান বাধার মুখে বিপরীত দিকের উচ্চভূমিতে অন্তচিমীরের (৭৩৯৬ ফুট) উপর হামলা করেন। ভরন্তসোফ তার রিপোর্টে এই ঘটনাটিকে তার সর্বকালের অভিজ্ঞতার মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল ঘটনা বলে বর্ণনা করেন। ততটা দুর্বল নয়, এমন একটি (পাসেকের ছিল ৬ ব্যাটালিয়ান, তৎসহ অশ্বারোহী সৈন্য এবং গোলন্দাজ কামান) মজবুত অবস্থানকে আক্রমণ করা ছিল সিঃসন্দেহে একটি দুঃসাহসী কাজ। কিন্তু যেহেতু এ যুদ্ধে মাত্র ১৭ জন যোদ্ধা আহত হয়, তাতে পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, এখানে যুদ্ধ করার অভিপ্রায় মুজাহেদীনের ছিল না। এর পরেই হলো এই অভিযানের প্রথম ভুল, যাতে মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতি হয়। ৬ তারিখের সকালে কোন নির্দেশের অপেক্ষা না করেই পাসেক এগিয়ে যেতে থাকেন, সেখান থেকে ১০ মাইল দূরে জুন্নুনমীরের দিকে। কিছু সময়ের জন্য তিনি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। হঠাৎ এখানে গ্রীষ্মের খরতাপ থেকে তীব্র শীতে রূপান্তরিত হলো আবহাওয়া এবং ৫ দিন হতভাগ্য ফৌজ ঠান্ডা বাতাস, তুষার বরফে এবং রসদের অভাবহেতু চরম দুর্ভোগ পোহায়। ৪৫০ জনের বেশি তুষারে অচল হয়ে পড়ে এবং ৫০০ ঘোড়া মারা যায়।

ঈমামের কৌশল

যোগাযোগ ব্যবস্থাকে পাহারা দেবার জন্য বিপুল সংখ্যক ফৌজ রেখে ভরন্তসফ ১১ তারিখে পাসেকের সঙ্গে যোগদান করেন এবং ১২ তারিখে আন্দি প্রবেশদ্বার বা গিরিপথের দৃষ্টিসীমার ভিতর তিলতীতল পল্লীর নিকেট অবস্থান গ্রহণ করেন। এটি ছিল এমন একটি অবস্থান, যা গুপ্তচরদের মতে শেষ পর্যন্ত প্রতিরক্ষার জন্য ঈমাম শামিল স্থির করেছিলেন। পরদিন আক্রমণের হুকুম দেয়া হয় কিন্তু আবার হানাদারেরা হতাশ হয়ে পড়ে। দরজাগুলো অরক্ষিত ছিল– যদিও বালির তৈরী বস্তা দিয়ে প্রতিরোধের জন্য দেয়াল দিয়ে ওগুলো বন্ধ করা হয়েছিল। ঈমাম শামিল স্থির করেছিলেন, এখঅনেই তিনি তাদেরকে প্রতিরোধ করবেন। কিন্তু এখনো তিনি তার বিরুদ্ধে কত সৈন্য সমাবেশ করা হবে সে সম্পর্কে অনিশ্চিত ছিলেন। কিন্তু যখন দেখলৈন কামান-বন্দুকে দুশমন খুবই শক্তিশালী, তখন তিনি অতিশয় বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিলেন কিছু ব্যর্থতার সুযোগ দিয়ে। তিনি পশ্চাৎ অপসরণ করলেন, আন্দি এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে আগুন লাগিয়ে দিলেন, যাতে ঐসব স্থান থেকে রাশিয়ানরা কোন রসদ সংগ্রহ করতে না পারে। ১৪ তারিখে রাশিয়ানরা গ্যাগাতল

এবং আন্দির ধ্বংসস্তূপের উপর দখল নেয় স্বল্প সংখ্যক পর্বতবাসীকে বিতাড়িত করে। পর্বতের ঢালু খাঁজকাটা অঞ্চলে, যা আভাল নামে পরিচিত, ঈমাম শামিল ৬০০০ সৈন্য এবং ৩টি কামান নিয়ে অবস্থান গ্রহণ করেন। তিনি স্থির করেছিলেন– নিম্নে অবস্থান গ্রহণকারী বাড়িয়াতিনোস্কী, কাবার্দা রেজিমেন্ট, জর্জিয়ান এবং অন্যান্য স্থানীয় ফৌজের দু'টি কোম্পানীসহ কিছুটা বিপজ্জনক অবস্থায় আছেন। আবার নতুন সৈন্যদল ও সাজ-সরঞ্জাম এলো এবং পর্বতটি দখল করে নেয়া হলো এবং ঈমাম শামিল সাফল্যের সঙ্গে প্রত্যাবর্তন করেন, তার ফৌজের সামান্যতমও ক্ষতি না করেই। সম্রাট একটি চিঠিতে লিখলেন, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তিনি রুশ ফৌজকে বিজয়ী করেছেন, আমি নিশ্চিত, আপনি শামিলের প্রভাবকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে পারবেন।"

ভরন্তসফের নিকট ইতিমধ্যেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, তার কেন্দ্র থেকে এতো দূরে রুশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার প্রশ্নই উঠে না। ১৭ই জুন তিনি লিখলেন, "ইহা পরিষ্কার যে, আমরা যদি কখনো আন্দিতে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই তাহলে চিরখেই অথবা ভিনেজপায়া থেকে আমরা আমাদের রসদ সংগ্রহ করতে পারবো না। কারণ গ্রীষ্মকালে এমন কার্যক্রম প্রায় অসম্ভব এবং বছরের বাকি অংশে একেবারেই তা সম্ভব নয়।" আর্গোতিনস্কি এবং ফ্রীতাগ অভ্রান্তই ছিলেন– যা করা যেতে পারে তা হচ্ছে কোন স্থায়ী ফল অর্জন না করেই প্রত্যাবর্তন করা। যদি তারা নিজেরা মারাত্মক ক্ষয়-ক্ষতির সম্মুখীন না হয়েই ফিরে যেতে পারে– ইহাই উত্তম। ইতিমধ্যেই ফৌজের জন্য রসদ সরবরাহ করার ঝুঁকি সম্পর্কে তারা সচেতন হয়ে উঠেছিলেন এবং আন্দিতে প্রথম চারদিনের মধ্যে তাদের জন্য রেশন ছিল অতি অল্প। যদিও অভিযানকারী সৈন্যদের এক-তৃতীয়াংশের বেশি যোগাযোগ লাইনের পিছনে পড়েছিলো এবং প্রিন্স রেডুটফ, যিনি ছিলেন দাগিস্তান কলামের কমান্ডার, তাকে বিশেষ করে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো– কনভয়গুলোকে সম্মুখ দিকে নিয়ে যাবার জন্য। অবস্থার বৈপরীত্ব উপলব্ধি করা ছিলো বুদ্ধিমানের কাজে এবং অবস্থা আরো খারাপ হয়ে যাবার পূর্বে প্রত্যাবর্তন করাই বেহতর। কিন্তু এখান থেকে দার্গো মাত্র ১০ মাইল দূরে অবস্থিত এবং এতে বিস্ময়ের কোন কারণ নেই যে, ভরন্তসফের এখনো ১০,০০০ অভিজ্ঞ সৈন্য অভিযানের জন্য বিদ্যমান থাকাতে ঈমাম শামিলকে তার সুরক্ষিত স্থানে আক্রমণ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকা উচিত ছিলো। এক্ষেত্রে উজ্জ্বল বা চমৎকার শব্দটি অবাস্তব নয়, কারণ ককেশাসের কোন রুশ বাহিনীরই এই বাহ্য চাকচিক্য, যা একটা গৌরবজনক যুদ্ধের জাঁকজমকের জন্য অপরিহার্য, তার তুলনা করা যায় না।

রুশ ফৌজের শান-শওকত

কাউন্ট ভরন্তসফের নামএবং খ্যাতি সেন্ট পিটার্সবুর্গ এবং মস্কো থেকে অভিজাতদের একটি তারকাপুঞ্জকে তার চারদিকে আকর্ষণ করে, যারা আগ্রহী ছিলো, এই রকম একজন বিখ্যাত কমান্ডারের অধীনে কাজ করতে এবং ঈমাম শামিলের প্রত্যাশিত পরাজয়ে এবং ককেশাসের চূড়ান্ত বিজয়ে অংশগ্রহণ করতে। তার স্টাফ এবং দলের মধ্যে ছিলেন প্রিন্স আলেক্সান্ডার, প্রিন্স উইটজেন্সটীন, ওয়ার্সোর প্রিন্স এবং বহু অভিজাত তার ব্যক্তিগত কনভয়ের মধ্যেই ছিল একদল ফৌজ, যারা তাদের বিচিত্র জাতীয় পোশাক পরে যোগ দিয়েছিল। পঞ্চম আর্মি কোরের কমান্ডার জোনারেল লুডার্স, ক্লুগেনু, পাসেক এবং অন্যদের প্রত্যেকেরই ছিল, বহু স্টাফ, এবং ক্যাম্পে বা ময়দানে তাদের অবস্থান আদালা আলাদা করে বোঝানোর জন্য প্রত্যেক জেনারেলেরই ছিল বর্শার মাথায় বাঁধা একটি ত্রিভূজাকৃতি পতাকা, কমান্ডার ইন চীফের ছিল লাল এবং সাদা পতাকা, ঘোড়ার লেজ অঙ্কিত। লুডার্সের পতাকা ছিল লাল এবং কালো, রৌপ্য ক্রসযুক্ত ইত্যাদি ইত্যাদি। অশ্বযোদ্ধাদের সংখ্যা স্বভাবতই বিশাল। এরা ছিল বালকবৃত্ত, সহিস, খানাসামা ইত্যাদি এবং ক্যাম্পের আসবাবপত্র, অফিসারদের রসদ, ঘোড়া এবং তাঁবু ছিল যোদ্ধা ফৌজের অনুপাতে সীমাহীন। নিদেনপক্ষে স্থানীয় ধ্যান-ধারণার বিচারে, মনে হলো তারা যেন এক রাজ্যাভিষেক উৎসবে যোগদান করার জন্য এসেছে, ককেশাসে যুদ্ধ করতে নয়, ককেশাসের স্থায়ী রেজিমেন্টগুলোর লোকজন ভরন্তসফের স্থলবর্তী মৌরভিওফ, এদেরকে চিহ্নিত করেছিলেন আয়েশী হিসাবে। যতদিন না তারা তার জন্য নিয়ে এলো সাফল্য এবং খ্যাতি– তারা রাশিয়া থেকে আগত ব্যাটালিয়নগুলোকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতো এবং স্টাফ অফিসারদের অত্যধিক প্রশ্রয়প্রাপ্ত চাকর-বাকরদের প্রতি ছিল তাদের বিপুল ঘৃণা, শেষোক্তজনেরা যারা ছিল স্মার্ট ইউনিফর্ম পরিহিত, ব্যবহারে চমৎকার কিন্তু ককেশাসের বা অন্য কোন যুদ্ধ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তারা ছিল স্থানীয় অফিসার এবং সৈন্যদের দৃষ্টিতে অরুচিকর। তাছাড়াও তাদের জন্য অতি সামান্যই সহানুভূতি ছিল যদিও তারা কথা বলতো বিশুদ্ধ রুশ ভাষায়। প্রত্যেকটি বাক্য ফ্যাশন্যাবল ফরাসী ফ্রেজ দিয়ে আরম্ভ না করে। তারা রেজিমেন্টের দর্জির তৈরী ইউনিফর্ম পরতো, তবুও তারা অনেক ক্ষেত্রেই মরিয়া হয়ে যুদ্ধ করেছিল। সেন্ট পিটার্সবুর্গের ফৌজের ক্ষমতাই ছিল না– ঈমাম শামিলের গতিশীল গেরিলাদের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধের কথাই উঠে না। যখন যুদ্ধ শুরু হতো, সংগ্রামের ধকল বহন করতে হতো স্থানীয় ব্যাটেলিয়নগুলোকে।

রুশদের গাড়ীগুলো আসতো ধীরে ধীরে এবং তারা এতো সামান্যই জিনিস নিয়ে

আসতো যে, কয়েক দিনের বেশী রেশন জমা করা সম্ভব হতো না– যদিও ভরন্তসফ আন্দিতে এর জন্য তিন সপ্তাহ প্রতীক্ষায় ছিলেন। স্থানীয় সরবরাহের ব্যাপারে বলা যায়, ফৌজ যেন সাহারার মধ্যভাগে আটকা পড়েছিল। ঈমাম শামিল তার কর্তব্য কি জানতেন। তিনি কয়েক মাইলব্যাপী স্থানে মানুষের খাদ্যের উপযোগী সমস্ত কিছু দখল করে নেন বা ধ্বংস করে ফেলেন, বাকিটুকু রৌদ্রই করেছিল– কারণ ঘাস পুড়ে ছারখার হয়ে গিয়েছিল। একজন রুশ অফিসার প্রহরা দিতে গিয়ে দু'টি মানুষের মাথা দেখতে পায়– যাতে তাতার ভাষায় লেখা ছিল "ইহাই হচ্ছে, যারা রুশদেরকে সাহায্য করে, তাদের পরিণাম"।

১৮ তারিখে একটি উল্লেখযোগ্য ফৌজ বতলিকের দিকে প্রেরণ করা হয় এবং আর্জিয়াম হ্রদের নিকটে খোলা জায়গায় তাঁবু না খাটিয়ে শিবির স্থাপন করে। কিন্তু তারা কোন কিছু অর্জন না করে ফিরে আসে। কয়েক ডজন ট্রাউট পাখি হত্যা করে, এ জন্য এ অভিযানটিকে বলা হয় 'ট্রাউট অভিযান'।

দার্গো অভিযান

জুলাই এর ৪ তরিখে যখন তিনি দেখতে পেলেন তার মাত্র অল্প কয়েকদিনের রেশন আছে এবং পরবর্তী কনভয় ১০ তারিখের আগে আসতে পারবে না এবং এ কারণে এদিক দিয়ে তারা ভালো অবস্থায় থাকবেন না এবং আরও একটি সপ্তাহ অপব্যয়ই করবেন– ভরন্তসফ ৬ তারিখের সকালে দার্গোর পথে রওনা শুরু করার জন্য ব্যবস্থা করলেন। তার ইচ্ছা ছিল তার ফৌজের একটি অংশকে ফেরত পাঠাবেন– কনভয়টি যখন পৌঁছুবে, তখন কনভয় থেকে তারা রসদ গ্রহণ করবে। এ সিদ্ধান্তের জন্য রাশিয়ানদেরকে পরে অনুশোচনা করতে হয়েছিল।

৬ তারিখ সকালে তিনটার দিকে, ঈমাম শামিলের যে গুপ্তচর ছদ্মবেশে কাউন্ট ভরন্তসফের নিকট উপস্থিত ছিল, সে ভরন্তসফের প্রিয় অশ্বটিকে নিয়ে ছুটে গেল ঈমামকে হুঁশিয়ার করে দেবার জন্য যে, রাশিয়ানরা রওনা শুরু করতে যাচ্ছে। এক ঘন্টা পরে মার্চ শুরু হলো এবং নয়টার দিকে গোটা ফৌজ অরণ্যের কিনারে পৌঁছে গেলো। এখানে কয়েক ঘন্টা থামার জন্য নির্দেশ দেয়া হলো। তখন লোকজন বিশ্রাম করে এবং আক্রমণের আগে তারা ভোজন করে। উত্তর দিকে একটি সুন্দর দৃশ্য প্রসারিত ছিল। তেরেক নদীকে দেখা যাচ্ছিল একটি রূপালী রেখার মতো এবং তার উভয়দিকে রয়েছে রুশ বর্ডার, বহু সৈন্য তাদের জীবনে সর্বশেষবারের মতো এই দৃশ্য দেখেনি। দার্গো অভিমুখী রাস্তাটি ৪/৫ মাইলের বেশি ছিল না। পথটি অগ্রসর হয়েছে গভীর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে। রাস্তাটি কোন কোন স্থানে এতো সংকীর্ণ যে, ফৌজকে অগ্রসর হতে হলো কলামে একজন একজন করে। উভয়

পার্শ্বে ছিল বিশাল বিশাল বৃক্ষ এবং তাদের শাখা জড়াজড়ি করেছিল। অধিকন্তু মুজাহিদীনের গেরিলা দলগুলো অপেক্ষা করছিল– রুশ ফৌজ কখন এই দুর্গম পথ অতিক্রম করার চেষ্টা করবে।

রুশ অগ্রাভিযান

দুপুর একটার দিকে জেনারেল লুডার্স, যিনি লিটভস্কি রেজিমেন্ট নিয়ে আক্রমণ করার জন্য অনুমতি পেয়েছিলেন, তিনি তাদেরকে সম্বোধন করে কতগুলো উত্তেজক বাক্য উচ্চারণ করলেন। সৈন্যগুলো তাদের মাথার উপর তরবারী ঘুরালো এবং শপথ করলো যুদ্ধের ময়দানে তাদের শক্তিমত্তা প্রমাণ করবে। অগ্রগতির সংকেত দেবার সঙ্গে সঙ্গে তারা তাদের নিজ নিজ অফিসার এবং বহু স্টাফের নেতৃত্বে দ্রুত ধাবিত হলো। তারা কোন দৃঢ় প্রতিরোধের সম্মুখীন হলো না এবং ক্ষয়ক্ষতি হলো সামান্যই। তাদের পিছনে এলো রাস্তা পরিস্কার করার লোকজন, কলামের জন্য বামের বাকী অংশটুকু পরিস্কার করার জন্য। অগ্রগতির গতি ঈমামের গেরিলাদের কৌশলের জন্য ছিল উপযোগী- যা প্রতীক্ষায় ছিল শত্রুর কলামকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করার জন্য- যখন কমান্ডার-ইন-চীফ জেনারেল লুডার্সকে নিয়ে নীরবে ঘোড়ায় চড়ে অগ্রসর হচ্ছিলেন এবং তাদের পিছু পিছু চলছিল তার স্টাফ এবং প্রিন্স আলেক্সজান্ডার। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বাধার প্রতিবন্ধকের সংকীর্ণ স্থানে যখন পৌঁছুল, তিনি বন্দুকের বিপুল গোলাগুলির সম্মুখীন হলেন এবং তখনকার মত আসন্ন বিপদের মধ্যে গিয়ে পড়লেন। তখন ভ্যান্‌টি অনেক এগিয়ে গেছে এবং মধ্যবর্তী জায়গাটুকু শত্রু আবার দখল করে নেয়। সবাই থেমে গেল। চল্লিশ জনের মত অফিসার এক জায়গায় জমায়েত হয়েছিল। তারা অজস্র গোলাগুলির সম্মুখীন হলো। একটি পার্বত্য কামান আনা হলো এবং সেটি পৌঁছুলে তাকে রাস্তার দু'পাশে ঘুরানো হলো দক্ষিণ পার্শ্বের জঙ্গলে ঢাকা সংকীণ উপত্যকাটি শত্রুমুক্ত করার জন্য। কারণ ঐদিক থেকেই গুলি আসছিল। কিন্তু দ্বিতীয় গুলিবর্ষণের পর ঐ কলামে কর্মরত প্রতিটি লোক নিহত হয়, অথবা সাংঘাতিক আহত হয়। আবার সেখানে লোক মোতায়েন করা হয় এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে তার ফল দাঁড়াল- অল্পক্ষণের জন্য কামানটি একা পড়ে রইলো- তার চারপাশে মৃত বা মৃত্যুমুখী সৈন্য বাদে, কেউই সংকীর্ণ স্থানটি অতিক্রম করতে সাহস পেল না। পতাকাধারী একজন সৈন্যকে পাঠানো হলো। সৈন্যটি অক্ষত অবস্থায় ফিরে এলো। কিন্তু পতাকাটি ব্যবহার করা হলো না। এই সংকটকালে জেনারেল ফোক কামানের দিকে এগিয়ে গেলেন এবং নিজে তাতে গোলা ভরলেন। কিন্তু তা ফায়ার করার আগেই তিনি আহত হয়ে মৃত্যুবরণ

করলেন। ভরন্তস্‌ফ তখন কয়েকজন জর্জিয়ান মিলিশিয়াকে এবং অশ্ব থেকে নেমে পড়া কসাকদের জঙ্গলের ভিতরে পাঠালেন। এরপর গুলি বন্ধ হয়ে গেল।

ইত্যবসরে কাবারদা ব্যাটেলিয়ন যা লিটভস্কির লোকদের পিছু পিছু আসছিল, তারা তাদের সঙ্গে ষষ্ঠ প্রতিবন্ধকের এখানে এসে মিলিত হয় এবং শেষোক্ত দল তাদের বিজয়ী অভিযান নিয়ে অগ্রসর হতে থাকে, যতক্ষণ না তারা খোলা জায়গায় একটু উঁচু স্থানে পৌঁছুল এবং দার্গোকে দেখতে পেল অনেক নীচে, প্রায় এক মাইল দূরে। এখানে তারা অপেক্ষা করলো, যতক্ষণ না ভরন্তস্‌ফ এলেন সন্ধ্যার দিকে এবং বিলিয়াভস্কিকে, যিনি অগ্রগামী গার্ডের কমান্ডার ছিলেন, আদেশ দেওয়া হলো গ্রামটি দখল করে নেবার জন্য। কিন্তু ইতিমধ্যে তা দাউ দাউ করে জ্বলছিল। ঈমাম শামিল নিজেই তা ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। বিকাল দুইটার দিকে কমান্ডার-ইন-চীফ দার্গোতে পৌঁছলেন এবং খোলা জায়গায় ছাউনী বা তাবু ছাড়াই গোটা ফৌজকে সমাবেশ করলেন। ক্ষতি খুব বেশী হলো না। যদিও প্রয়োজনের চাইতে বেশী ছিল না। একজন জেনারেল, তিনজন অন্য অফিসার এবং ৩২ জন সৈন্য নিহত হলো এবং আহত হলো ৯ জন অফিসার ও ১৬০ জন সেপাই।

ঈমামের রাজধানী দখল করে নেওয়া হলো। কিন্তু তিনি মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতি করার কোন সুযোগ দিলেন না। দার্গোতে অবস্থান করা ছিল অসম্ভব এবং ফৌজের সম্মুখে রয়েছে ২৮ মাইল জঙ্গল, আর এই দূরত্বের প্রতিগজ স্থানেই ছিল ভয়ানক অসুবিধা। ১৮৪২ সনে গ্রাবি একই সংখ্যক সৈন্য নিয়ে পরাজিত ও বিপর্যস্ত হয়েছিলেন, গার্জেন গ্রামের অর্ধেক দূরত্বে পশ্চাতে অপসারণ করতে গিয়ে। অথচ তার বিরুদ্ধে ছিল মাত্র ২০০০ ফৌজ। ঈমাম শামিল তার সমস্ত সৈন্য নিয়ে কাছেই উপস্থিত ছিলেন রুশ ফৌজকে ধ্বংস করার জন্য। ককেশিয়ান যুদ্ধের অভিজ্ঞ যোদ্ধারা অনুমান করতে পেরেছিল পরিস্থিতি অতিশয় বিপজ্জনক এবং আসন্ন ভুল প্রমাণের ফলে বিপর্যয় অনিবার্য হয়ে উঠলো।

রসদে আর মাত্র ৫ দিন চলতো। সন্দেহ নেই যে, যতো দ্রুত সম্ভব ঘারজেল পল্লীর দিকে অগ্রসর হওয়া ছিল সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ। তিনি দাগীস্তানের কমান্ডারদের এই আদেশ দেন যে, তারা যেন সৌলাকে ফিরে যায়। কিন্তু ভরন্তস্‌ফ চাইলেন তার পরিকল্পনা অক্ষুণ্ন রাখতে এবং প্রত্যাশিত কনভয়ের আগমন পর্যন্ত প্রতীক্ষা করতে।

ইত্যবসরে দার্গোর যে অংশটি রুশ দলত্যাগীদের তারা অধ্যুষিত ছিল, সেখানে প্রচুর উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। রুশ ফৌজের মনোভাব অনুমান করা যেতে পারে- যখন সূর্যাস্তের সময় ৬০০ সৈন্য আকসাইয়ের বাম তীরে এদিকে-ওদিকে মার্চ করে অগ্রসর হয় সৈন্যদের ফিরিয়ে আনার জন্য রুশ ঢাক বাজাতে বাজাতে। এ ছিল

সবচাইতে নির্দয় ব্যবস্থা। একই উচ্চতায় ঈমাম শামিল চারটি কামান স্থাপন করেছিলেন, যা রুশ অবস্থানের উপর বেধড়ক গোলাবর্ষণ করতে থাকে। ৮ তারিখের সকালে জেনারেল লাবীন্‌তসেফ-এর অধীনে একটি ফৌজ মুজাহিদীনের অবস্থান আক্রমণ করে। এই আক্রমণ কার্যকর হয় এবং তা সফল প্রতীয়মান হয়। ঈমামের ফৌজ হাওয়া হয়ে যায়। রাশিয়ানগণ নীচুতে অবস্থিত তাদের তাঁবু থেকে তা দেখে খুশী হয়। কিন্তু তাদের পশ্চাৎ অপসারণকালে তাদের হর্ষ শোকে পরিণত হয়। রাস্তাটি অগ্রসর হয়েছে ভুট্টা ক্ষেতের মধ্যদিয়ে। সেখানে শৃঙ্খলা বজায় রাখা বা সম্পর্ক রাখা ছিল কঠিন। উভয় পার্শ্বে ছিল জঙ্গলে ঢাকা জমি এবং প্রত্যেকটি গাছ ও পাথরের পিছন থেকে মুহূর্তেই গেরিলা যোদ্ধারা লাফিয়ে পড়লো। সকল দিকে রুশ ফৌজ মারা যায়। কলামটি তাঁবুতে ফিরে যায়। নিহত, আহত নিয়ে ১৮৭ জনকে হারিয়ে। ঈমামের ফৌজ তাদের পূর্ব অবস্থান আবার দখল করে নেয় এবং সকাল-সন্ধ্যা রুশ দলত্যাগীরা ঢাকের বাধ্য বাজাতে থাকে। যে মুহূর্তে কলামটি প্রত্যাবর্তন করতে যাচ্ছিল, গোটা অভিযানের জন্য সেটাই ছিল একটি টার্নিং পয়েন্ট। এক অবর্ণনীয় হতাশা ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত ফৌজের মধ্যে। কয়েক মিনিট আগে যে রুশ সৈন্যরা ছিল হর্ষোৎফুল্ল, তারাই সিরিয়াস এবং দুঃখভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে- প্রায় ২০০ জন মৃত এবং আহতের দৃশ্যই নয়, বরং এই বিশ্বাস যে, রুশ কুরবানী ব্যর্থ হয়েছে অর্থডক্স পুরোহিতদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় অনবরত মন্ত্র উচ্চারণ এবং কবরে লাশ রাখার সময় ধ্রিম ধ্রিম বন্দুকের আওয়াজ হতাশাকে আরও গাঢ় করে তোলে এবং তাতে ঈমাম শামিল বুঝতে পারেন, কতজন মারা গেছে। অধিকন্তু গোলাবারুদ ইতিমধ্যেই ফুরিয়ে গেছে। এখন রাশিয়ানরা তাদের মৃত্যুদেহগুলোকে নীরবে সমাধিস্থ করতে থাকে।

৯ই জুলাই সন্ধ্যায় জঙ্গলের কিনার থেকে, যেখানে ফৌজ অবস্থান করছিল ৬ তারিখে রকেট নিক্ষিপ্ত হলে বুঝা গেল কনভয়টি উপস্থিত হয়েছে। স্পষ্টতই সাহায্য ব্যতিরেকে ইহা দার্গোতে পৌঁছাতে পারতো না এবং তখন থেকেই এই হতভাগ্য উদ্যোগ 'বিস্কিট অভিযান' নামে পরিচিতি লাভ করে।

যেহেতু রশদ ছিল সকল ইউনিটের জন্য, তাই স্থির করা হলো যে, প্রত্যেক ইউনিট অর্ধেক লোককে পাঠাবে তার ভাগের রশদ সংগ্রহ করার জন্য। পাসেককে অগ্রবর্তী গার্ডের কমান্ডে এবং পশ্চাৎবর্তী গার্ডের কমান্ডে ভিক্টোরোফকে রেখে ক্লুগেনোর উপর এই দায়িত্ব অর্পিত হয়, যাতে প্রায় ৪০০০ সৈন্য নিয়ে একটি কলাম তৈরী হয়। যতদূর কল্পনা করা যায় এটি ছিল বহু ধরনের সৈন্য নিয়ে গঠিত একটি ফৌজ।

ইতিপূর্বে বর্ণিত চার থেকে পাঁচ মাইল পথ অতিক্রম করার জন্য কলাম রওয়ানা

করে ১০ তারিখের সকালে; সে পথের প্রত্যেকটি প্রতিবন্ধককে ৬ তারিখে বহু কষ্টে ধ্বংস করা হয়। পথটি ইতিমধ্যে আগের চেয়ে আরও মজবুতভাবে নির্মিত হয় এবং নতুন প্রতিবন্ধক তার সাথে যোগ করা হয়। পাসেক কাবারদা রেজিমেন্টের দুই ব্যাটালিয়ান, স্যাপারস ও বন্দুকধারীদের একটি কোম্পানি, দুটি পার্বত্য কামান নিয়ে সামনে এগিয়ে গেলেন একের পর এক প্রতিবন্ধকের উপর হামলা চালিয়ে এবং তার সঙ্গে গেলেন ক্লুগনো। স্বভাবতঃই ভ্যান থেকে মধ্যভাগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পশ্চাৎভাগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে কেন্দ্র থেকে এবং ঈমাম শমিলের গেরিলা ফৌজ ঝাঁকে ঝাঁকে মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়ঘায় ঢুকে পড়ে আর সুবিধাজনক প্রত্যেকটি পয়েন্ট থেকে, এমন কি মাথার উপর শাখা থেকে গুলিবর্ষণ শুরু করে। যেমন গ্রাবির অভিযানের সময় অবারিত বীচ্‌বৃক্ষ আশ্রয় দিয়েছিল বহু চেচন বন্দুকধারীকে সেখানে বিভ্রান্তি শুরু হয়। সেখানে তারা কাজ সমাধা করার জন্য তরবারী এবং কিঞ্জাল নিয়ে ছুটে যায়। সংকীর্ণ পর্বত শিলাটি ছিল একটা পুরো গ্রীষ্মের দিনে মরিয়া যুদ্ধের দৃশ্য, কেবলমাত্র রাত্রিকালে অগ্রবর্তী দলটিকে ফেরত পাঠান হয়েছিল সাহায্যের জন্য, তাদের সাহায্যে কলামের বাকী অংশ খোলা জায়গায় পৌঁছাতে সক্ষম হয়। জেনারেল ভিক্টরফ্, জেনারেল ফোক এবং বহু অফিসার ও সিপাহী নিহত হয়- বহু সংখ্যক আহত হয় এবং দুটি কামান খোয়া যায়।

অবস্থাটি ছিল খুবই শোচনীয়। কিন্তু এর থেকেও শোচনীয় অবস্থা তখন তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। ক্লুগেনো অভ্রান্তভাবেই চিন্তা করলেন দাগীস্তানের ভেতর দিয়ে পশ্চাৎ অপসরণ করাই হবে বেহতর- ভরন্তস্‌ফকে পেছনে রেখে গিয়ে যাতে করে তিনি সংগ্রাম করতে করতে তার অবশিষ্ট ফৌজসহ গার্জেল পল্লীতে পৌঁছাতে পারে। তৃতীয়বারের মতো সেই ভয়ঙ্কর পথ দিয়ে অগ্রসর হবার ঝুঁকি নেওয়ার চাইতে পশ্চাৎ অপসরণকে ক্লুগেনো বেহতর মনে করলেন- কেননা তিনি রসদ এবং নিহতদের বোঝা নিয়ে ভারাক্রান্ত ছিলেন, তদুপরি এক বিজয়ী শত্রুর মুখোমুখি হয়েছিলেন। ভরন্তসফের কাছে দ্বিতীয় একটি পত্র নিয়ে একজন দুঃসাহসী সংবাদবাহক পৌঁছায়। তাতে বলা হয়েছিল তাঁবুতে প্রত্যাবর্তন করার জন্য ঘুরে কলাম রওয়ানা করবে। আমরা বিচার করতে পারি সেই কমান্ডার-ইন-চীফ কি রকম নির্বুদ্ধিতার সঙ্গে পরিস্থিতি বিচার করেছিলেন এই বাস্তবতা থেকে যে তিনি সংবাদ বাহকটিকে উল্লাসের সঙ্গে গ্রহণ করেন এবং তাকে সেই স্থানেই প্রমোশন দেন।

১১ তারিখ সকালে কনভয় রওয়ানা করে। কামানের তিনটি গোলাবর্ষণ থেকে, যারা দার্গোতে অবস্থান করছিল, তারা বুঝতে পারলো যে, ফৌজ রওয়ানা করেছে এবং অল্প সময়ের মধ্যে বৃক্ষরাজির উপর ধূম্র রেখা থেকে তারা বুঝতে পারলো,

কোথায় তারা রক্তরঞ্জিত পর্বতশিলার নিম্নে লড়াই করতে করতে অগ্রসর হয়েছে। পূর্বের চাইতে অধিক সংখ্যক লোক নিয়ে গঠিত ছিল মুজাহিদীন ফৌজ। প্রতিবন্ধকগুলো আবার নতুন করে নির্মিত হয় এবং ঘোর বৃষ্টি মার্চ করে অগ্রসরমান ফৌজের অসুবিধা ভয়ানকভাবে বাড়িয়ে দেয়। পাসেক ছিলেন অগ্রবর্তী গার্ডের কমান্ডে। তিনি লড়াই করতে ইতিমধ্যে বর্ণিত সংকীর্ণ রাস্তাটিতে পৌঁছুলেন। এখানে তিনি দেখলেন বৃক্ষ দিয়ে তৈরী একটি আত্মরক্ষা দেওয়াল- যার সম্মুখেই রয়েছে আগের দিনের রুশদের মৃতদেহ- একটি আর একটির উপর স্তুপীকৃত। এই উৎকট প্রতিবন্ধকের পশ্চামে প্রতিরক্ষার জন্য কেউই ছিল না। কিন্তু এটি ছিল উভয় দিকে ছোট্ট প্রতিরক্ষা দেওয়ালের দ্বারা বেষ্টিত। এগুলো দখল করার পূর্বে কোন অগ্রগতিই সম্ভব ছিল না। প্রতি মুহূর্তেই সৈন্যদের মৃত্যু হচ্ছিল। কলামটি এরই মধ্যে চরম বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে যায়। পাসেক একজন তরুণ গার্ডসম্যান ভলখোভ্স্কির নেতৃত্বে দক্ষিণ দিকের প্রতিরক্ষা দেওয়ালের বিরুদ্ধে লিওব্লিন রেজিমেন্টের দুই কোম্পানী সৈন্য পাঠান। এই তরুণ গার্ডসম্যানটি বীরত্বের সঙ্গে নেতৃত্ব দেন এবং তিনিই প্রথম প্রতিবন্ধকটি ডিঙ্গাতে সক্ষম হন। কিন্তু পর মুহূর্তে তিনি নিহত হন। সাথে সাথে কোম্পানির অনেক সৈন্য মারা যায় এবং তারা বিশৃংখলার মধ্যে পিছু হটে যায়। ইত্যবসরে পাসেক নিজে একই রেজিমেন্টের অবশিষ্ট দুই কোম্পানী নিয়ে বামদিকের প্রতিরক্ষা দেওয়ালের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। এখানে পাসেক নিহত হন এমনি এক করুণ অবস্থার মধ্যে যে, সেই মুহূর্তে তার কাছে কেউই ছিল না। তাদের কমান্ডারকে এ ধরনের সহায়হীন দুঃখজনক মৃত্যুবরণ করতে দেওয়া রুশ ফৌজের জন্য ছিল অত্যন্ত লজ্জার বিষয়- যদিও ব্যক্তিগতভাবে অফিসার এবং সৈন্যরা অতিশয় বীরত্বের প্রমাণ দেয়, তবুও রুশ ফৌজের উপর কলঙ্কের ছাপ রয়ে যায়।

ইতিপূর্বে ভরন্তসফ ফ্রিতাগকে লিখেছিলেন গার্জেল পল্লীর দিকে অগ্রাভিযান সম্পর্কে তার অভিমত চেয়ে। এর জবাবে ৫ই জুলাই বামপার্শ্বের কমান্ডার জানালেন, "চেচেনদের মধ্যে ইতিমধ্যেই এটা আর কোন গোপন ব্যাপার নয় যে, আপনি দার্গো থেকে নেমে সমতল অঞ্চলে আগমনের অভিপ্রায় করেছেন, তারা বলে রুশদের সঙ্গে এখনো আমরা যুদ্ধ শুরু করি নাই। তারা যেখানে ইচ্ছা যাক, আমরা জানি কোথায় তাদের আক্রমণ করতে হবে। বস্তুত তারা জানে যে, অরণ্যের ভিতর সমস্ত সুবিধাই তাদের পক্ষে এবং তারা বুঝে কি করে সেই সুবিধার সুযোগ তারা গ্রহণ করতে পারে।"

"মহামান্য সেনাপতি আমার মত জানানোর জন্য আমাকে অনুমতি দিয়েছেন, সম্পূর্ণ সরলভাবে প্রকাশ করা ছাড়া এ ধরনের তোষামোদের অবস্থাকে আমি

যুক্তিযুক্ত মনে করি না। নিম্নাভিমুখী অগ্রগমনে আপনি অরণ্যের ভিতর এমন সব প্রতিবন্ধক এবং এমন ধরনের প্রতিরোধের সম্মুখীন হবেন, যা সম্ভবত আপনি আশা করে না। আমি চেষ্টা করবো একথা প্রমাণ করবার জন্য যে, অপারেশন সম্পূর্ণ অসম্ভব। পক্ষান্তরে আমি মনে করি মাহামন্য সেনাপতি বিজয় অর্জন করবেন, কিন্তু ক্ষয়ক্ষতি হবে বিপুল। আপনি দেখতে পাবেন চেচেনরা অভিজ্ঞ বীরযোদ্ধা।"

ফ্রিতাগ আরও পরামর্শ দেন যে, অভিযানকারী কলামটি "বাক্সের ভিতরে বাহিত কলাম" নামে গঠন করা উচিত- যা অরণ্যের যুদ্ধে সবচেয়ে উপযোগী। তিনি আরও বলেন, "আমি খোলাখুলি বলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, আমাকে অবশ্যই খোলাখুলি বলতে হবে। মহামান্য সেনাপতির পত্র বিবেচনা করে বোঝা যাচ্ছে আপনি অরণ্যের ভিতর দিয়ে সমতল অঞ্চলে অগ্রগামী অভিযান থেকে উপযুক্ত ফল আশা করেন। আমাকে অনুগ্রহ করে বলতে দিন সহজ ভাষায় যে- আপনি প্রতারিত হচ্ছেন, আপনার অগ্রাভিযান যতই সফল হউক তা শত্রুকে পদানত করার উপর প্রভাব ফেলবে না। আমি যে বিধি প্রকাশ করেছি, তাতে আপনি নিশ্চিত হতে পারেন যে, আমি নীরব থাকতে পারি না। আমি আমার সাধ্যমত সমস্ত কিছু করবো, যাতে আপনি আমার উপর যে আস্থা রেখেছেন, তার জন্য লজ্জিত হতে না হয়। আমি আমার গুপ্তচরদের মাধ্যমে কখন আপনি রওয়ানা করবেন তার খবর পাবার আশা করি। কিন্তু ইহা বাঞ্ছিত যে, আমাকে যথাসময়ে অবহিত করা হবে।"

রুশ বিপর্যয়

পরবর্তী কয়েকদিন নিয়ে এলো সমূহ বিপর্যয়, যা শত্রুর উপর ঈমামের গেরিলা ফৌজ সৃষ্টি করতে সক্ষম ছিল। মার্চের প্রস্তুতির জন্য রুশ ফৌজ ১২ তারিখ ব্যস্ত থাকে। তার মধ্যে ছিল আহতদের বহনের জন্য পরিবহনের ব্যবস্থা এবং সকল তাঁবু ও তার যেসব রসদ অপরিহার্য নয়, সেগুলোর ধ্বংস সাধন। ১৩ তারিখ ভোরে রওয়ানা শুরু করা হয়, তবে বড় রকমের কোন যুদ্ধ হয়নি। কিন্তু অগ্রগতি ছিল ভয়ানকভাবে মন্থর। রাত্রিকালের জন্য কলামটি অবস্থান করলো সোনকারছিতে। এ সময়ের মধ্যে তারা মাত্র তিন মাইল অগ্রসর হয়। ১৪ তারিখে আবার মার্চ শুরু হয় শোয়ানির দিকে- যেখানে রাস্তাটি ভাগ হয়ে একটি শাখা গেছে মেয়রটোপের দিকে, অন্যটি গেছে গারজেল পল্লীর দিকে। এখানে ঈমাম শামিল স্থির করলেন তিনি অপেক্ষা করবেন এবং সম্ভব হলে মোকাবিলার সমাপ্তি ঘটাবেন। কথিত আছে যে, তার নায়েবগণ কসম করেছিলেন, রুশ কলামকে এই স্থান অতিক্রম করতে দিবেন না। এখানে বড় রকমের যুদ্ধ শুরু হয়। কিন্তু সন্ধ্যার দিকে কলামটি বিজয় লাভ করে- সনটারি থেকে ১২ মাইল দূরে সায়াসিনির বিপরীত দিকে, আকসাই নদীর

বাম তীরে ইসাযোটের নিকটে। কলামটি এখানে এসে থেমে যায় এবং এই যুদ্ধে তাদের সাতজন অফিসার এবং ৭৫ জন সৈন্য নিহত হয়- আহতদের তালিকায় আরও ২৪ জন অফিসার এবং ২৫০ জন সৈন্য অন্তর্ভুক্ত হয়। রুশ অগ্রগামী দল দ্রুত অগ্রসর হতে থাকে। ঈমাম শামিলের গেরিলারা এই বাস্তবতার সুযোগ গ্রহণ করে এবং পঞ্চম আর্মি কোর তাদের রসদের বিশাল কনভয় এবং আহতদের নিয়ে গঠিত কলামের মধ্যভাগের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং ব্যাপক ধ্বংসলীলা চালায়। ১৫ তারিখে পূর্বদিনের যুদ্ধে হতবল রুশ ফৌজ আর মার্চ করে অগ্রসর হতে অক্ষম হয়ে পড়ে- যদিও গেরিলারা সামান্যই হয়রানি করে; ভয়ন্তসফ মাত্র ৪ মাইল দূরে এলারোপিতে থেমে যান। তাদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ হলো ১৫ জন নিহত, ৩ জন অফিসার এবং ৬৩ জন সিপাহী আহত। ১৬ তারিখ রুশ ফৌজের জন্য ছিল বিপর্যয়পূর্ণ- কেননা গেরিলারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল এবং রুশ ফৌজ তাদের ফাঁদে পড়ে যায়। তাতে ইতিমধ্যে যে ভুলের কারণে এতো রক্ষপাত এবং কষ্ট হয়, অবিশ্বাস্য মনে হলেও তারই পুনরাবৃত্তি ঘটে। অভিযানের আগাগোড়া রুশ কলাম ভুল করে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। যখনই তারা একটি প্রতিবন্ধক অতিক্রম করে অগ্রসর হয়, তারা দেখতে পায় আর একটি প্রতিবন্ধক তাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। পথটি ছিল আকছাই নদীর বাম তীরে। ঘন জঙ্গলাকীর্ণ রাস্তা ধরে এবং পাহাড়ের ঢালুতে আরও সুবিধাজনক প্রতিটি স্থানে ছিল কর্তিত অথবা পাতিত বৃক্ষের দ্বারা তৈরি স্বাভাবিক প্রতিবন্ধকসমূহ। এখানে যুদ্ধ হলো খুব ঘনিষ্ঠভাবে প্রায় হাতাহাতি; অগ্রগতির প্রতিটি পদক্ষেপ স্বভাবতই পরবর্তী পদক্ষেপ হয়ে উঠে। তাছাড়া প্রতিটি সৈন্য জানতো যে, নিরাপত্তার একমাত্র সুযোগ নিহিত রয়েছে গারজেল পল্লী বা তার পরিপার্শ্বে- বড়জোর পরবর্তী দুই কিংবা তিন দিনের মধ্যে এবং অতিমাত্রায় দ্রুততার সঙ্গে তারা আরও অগ্রসর হতে পারলে এর স্বাভাবিক পরিণতি শুরু হয়, কলামটি ভেঙ্গে যায় এবং পূর্বতন দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটে। রাস্তা পরিষ্কারক যোদ্ধাদের ছিন্নভিন্ন করে দেওয়া হয়। কারণ যেসব ফৌজ প্রতিবন্ধকগুলো দখল করেছে, তাদের উপর অর্পিত ছিল সমস্ত রাস্তাব্যাপী তা পরিস্কার করা। তারা সম্মুখে এগিয়ে যায় এবং তাদেরকে শত্রু ঘেলাও করে ফেলে। কামান, গোলা অনাবৃত অবস্থায় পরিত্যক্ত হয় এবং প্রতিটি সৈন্য মারা যায় বা আহত হয়। সন্ধ্যার দিকে দুর্দশাগ্রস্ত জীর্ণ কলামটি কোন রকমে নিজেকে টেনে শাওখাল বারদি পল্লীতে নিয়ে যেতে সক্ষম হয় ৫ মাইলের দূরত্ব অতিক্রম করে এবং সেখানে তা অবস্থান করে। কেননা সৈন্যরা হয়ে পড়েছিল একেবারে হতবল। চতুর্থ দিনে ক্ষয়ক্ষতি হলো- নিহত দুইজন অফিসার এবং ১০৭ জন সৈন্য, আহত ১৫ জন অফিসার এবং ৪০১ জন সিপাহী। দার্গো ছেড়ে আসার পর এ পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ হলো ১০০০-

এর উপর এবং গার্জেল পল্লী রয়েছে এখনো পনর মাইল দূরত্বে। অর্থাৎ ছয়দিনে কলামটি অতক্রিম করেছে মাত্র ২৬ মাইল। গড়ে প্রতিদিন ছয় মাইলের সামান্য কিছু উপরে। মাত্র তিনজন সম্পূর্ণ সুস্থ সিপাহী ছিল ভয়ঙ্কর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে প্রত্যেকটি রুগ্ন অথবা আহত গার্ডকে বহন করার জন্য এবং পশ্চাৎভাগে খবর সংগ্রহ ও পশ্চাৎবর্তী ভ্যানে অথবা উভয়পার্শ্বে যুদ্ধ ইত্যাদির জন্য। ইতিমধ্যে রসদ ফুরিয়ে গেছে। সেপাইগণ ইতিমধ্যেই ক্ষুধাপীড়িত হয়ে পড়েছে এবং তারা দ্রুত মনোবল হারিয়ে ফেলছে। ভরন্তস্ফ তখন দেখতে পেলেন মার্চ করে আর কিছু দূর অগ্রসর হওয়া অসম্ভব, তিনি স্থির করলেন সেখানেই অপেক্ষা করবেন ফ্রীতাগের উপস্থিতির জন্য। তিনি জানতেন না দার্গো থেকে প্রেরিত তার বার্তা কখনো জেনারেলের কাছে পৌঁছুবে কিনা। পুরো সতেরতম দিবসটি একটা ভয়ানক অনিশ্চয়তার মধ্যে কাটলো। সিপাইদের কোন খাবার ছিল না, স্বল্প পরিমাণ ভুট্টা, ক্ষুদ্র অস্ত্র এবং গোলাবারুদ ইতিমধ্যেই ফুরিয়ে গেছে। গোলন্দাজ বাহিনীর বলতে গেলে এক রাউন্ড গোলাও ছিল না ঈমাম শামিলের কামানের উত্তর দেবার জন্য। ঈমাম শামিল স্থানে স্থানে সারা পথে সারাদিন শিবিরের উপর যে বোমা বর্ষণ করেন তার জবাব দেবার কিছুই তাদের ছিল না। ফৌজ এখন বস্তুতই উপবাসে মারা যাচ্ছে। বড় জোর একদিন দুইদিনের মধ্যেই ধ্বংসের শেষ নিয়ে আসতে পারে। পরিস্থিতি এতই ভয়াবহ হয়ে উঠে যে, কথিত আছে সেই দিন কোন সাহায্য না এসে পৌঁছুলে ভরন্তস্ফ সিদ্ধান্ত নিতেন আহতদের পরিত্যাগ করে তিনি রাস্তা করে গারজেল পল্লীতে পৌঁছুনোর চেষ্টা করবেন। এই অভিযোগ মিথ্যা হতে পারে। কিন্তু শিবিরের ভিতর তা চালু হয়ে পড়েছিল। এতে বুঝা যায়, ঈমামের মুক্তিযোদ্ধা গেরিলাদের দ্বারা এখানে সমগ্র রুশ ফৌজ কি রকম বিপন্ন হয়ে পড়েছিল।

১৮ই জুলাই কলাম দার্গো ত্যাগ করার ষষ্ঠ দিনে পূর্বদিনের মতই কেটে গেল। কিন্তু ফ্রীতাগের কাছ থেকে কোন সংকেত ছাড়াই ক্ষুধা হয়ে উঠল আরও মরাত্মক। কলামের কোন গোলাবারুদ ছিল না। বড় জোর ৫০ রাউন্ড গুলি ছিল ফৌজের। ঈমাম শামিল তার বোমাবর্ষণ চালিয়ে যেতে থাকেন। মুরীদ এবং তাদের অনুসরণকারীরা সুবিধাজনক প্রত্যেকটি স্থান থেকে সকল দিক থেকে আক্রমণ করে। প্রকৃত ক্ষতি বেশি না হলেও সকলকেই সতর্ক করে দেয়।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো এবং মনে হলো বেশীরভাগ রুশ ফৌজের জন্য এটাই শেষ রাত্রি। যখন কামানের গুলির আওয়াজ শোনা গেল, পরবর্তীকালে জানা যায়, দার্গো থেকে প্রেরিত দু'জন রুশ এবং ৩ জন স্থানীয় অধিবাসী নিয়ে পৃথক পৃথক যে ৫ জন বার্তাবাহককে পাঠানো হয়েছিল তার সাহায্য চেয়ে, ওরা ১৫ এবং ১৬ তারিখের ভিতরে গন্তব্যে পৌঁছুতে সক্ষম হয়। ফ্রীতাগ এ ধরনের কিছু ঘটবে বলে

আগেই অনুমান করেছিলেন এবং ইতিমধ্যেই তিনি তার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তার লভ্য ফৌজগণকে রেডি রাখলেন গ্রোজনী এবং গারজেল পল্লীর মধ্যে। তিনি মুহূর্তকাল অপেক্ষা না করে রওয়ানা দিলেন, ২ দিনে ১২০ মাইল অতিক্রম করলেন। পথে তার ফৌজকে জমায়েত করে ১৬ তারিখ রাত ৯টায় তার অগ্রবর্তী রক্ষীদল একটি ছোট্ট খোলা জায়গায় পৌঁছুল; সেখান থেকে ঘেরাও করা শিবিরের পূর্ণ দৃশ্য দেখা যাচ্ছিল। পরদিন ভরন্তস্ফ অগ্রসর হলেন তার সঙ্গে সাক্ষাত করার জন্য এবং ২০ তারিখে অভিযানকারী অবশিষ্ট ফৌজ নিরাপদে গারজেল পল্লীতে পৌঁছুলো। ঈমাম শামিল শত্রুদের যে নিখুঁত মার দিয়েছিলেন, তাতে সন্তুষ্ট হয়ে তার গেরিলাদের নিয়ে যুদ্ধে নিবৃত্ত হলেন- তার নিজের ফৌজের কোন বড় রকমের ক্ষয়ক্ষতি হতে না দিয়েই, এমন কি পশ্চাৎ অপসরণের শেষ দিনেও রুশ ফৌজের তিনজন অফিসার এবং ৭৮ জন সৈন্য মারা যায়। আহত হয় ৮ জন অফিসার এবং ১৩৮ জন সেপাই। ফ্রীতাগ হারালেন ১৪ জনকে। একজন অফিসার ও ২৭ জন সৈন্য আহত হলো উদ্ধার প্রতীক্ষায় থেকে। ভরন্তসফের কাছে ১৮৪৬ সনের ফেব্রুয়ারিতে একটি ইন্টারেস্টিং চিঠিতে যেরিমোলফ লিখেন, আমি এ বিষয়ে আপত্তি উপথাপন করতে চাই না যে, নতুন ফৌজ নিয়ে ফ্রীতাগ না এলেও আপনি যুদ্ধ করে আপনার পথ করে নিতেন। কিন্তু কথা হলো আপনার কয়কজন সৈন্য তা পারতো। তিনি ভরন্তসফের বিবৃতি সঠিকভাবে সংশোধন করেন- যখন তিনি বলেন যে, ইতিপূর্বে রুশ ফৌজ দার্গোতে পৌঁছেনি যদিও রজেন এবং ভেলিয়ামিন্‌ফ সেখানে পৌঁছেছিলেন ১৮৩২ সনে।

ভরন্তসফের ফৌজের সাকূল্যে ক্ষয়ক্ষতি দাঁড়ালো ৩ জন জেনারেল ও ১৯৫ জন অফিসার নিহত এবং ৩৪৩৩ জন সেপাই আহত। তারা ৩টি কামান হারালো।

স্থানীয় ব্যাটালিয়নগুলো না থাকলে একজন সৈন্যও বাঁচতে পারতো না। দৌরিন রেজিমেন্টর ব্যাটালিয়নটি, পার্শ্ব রক্ষা করার জন্য যাদেরকে ব্যবহার করা হয়েছিল, অরণ্য যুদ্ধে যা সবচাইতে বিপজ্জনক কাজ- হারালো ৬৩০ জন সৈন্যকে এবং ২৩ জন অফিসারকে। ব্যাটালিয়নের ৮৫০ জনের মধ্যে কাবারদার ক্ষয়ক্ষতিও একই অনুপাতে। এভাবে হত্যবাগ্য রুশ অভিযান- যা ঈমাম শামিলকে শিক্ষা দেবার জন্য চালিত হয়েছিল, তা চূড়ান্তভাবে ঘায়েল হয়ে পড়ে ঈমাম কর্তৃক গৃহীত গেরিলা যুদ্ধের উন্নততর কৌশলের কারণে।

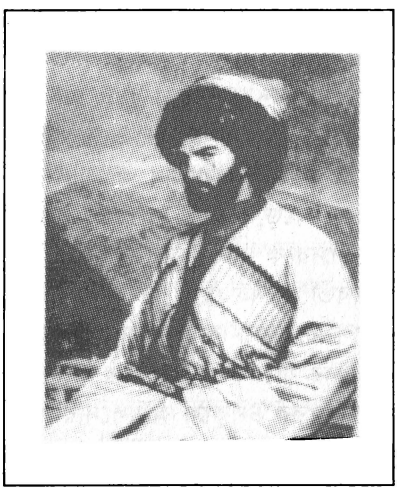
চেগুয়েভারা দার্গো অভিযানের প্রায় এক শতাব্দী পরে নিম্নরূপ লিখেছিলেন, যা রুশ ফৌজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গৃহীত কৌশলের সঙ্গে হুবহু মিলে যায় ঃ "গেরিলা যোদ্ধা জানে কোথায় সে যুদ্ধ করছে, কিন্তু আক্রমণকারী কলাম জানে না রাত্রিকালে গেরিলা যোদ্ধারা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু শত্রু অন্ধকারে আগ বাড়তে ভয় করে। এভাবে

বেশি অসুবিধা ছাড়াই একটি কলামকে সম্পূর্ণরূপে বিন্যাস করা যেতে পারে, অথবা কলামে এমন ক্ষতি করা যেতে পারে, যার ফলে যুদ্ধে ফিরে আসার জন্য সম্ভাবনা রুদ্ধ হয়ে যাবে এবং পুনরায় ব্যূহ রচনার জন্য দীর্ঘদিন সময় নিতে বাধ্য করবে।" "এভাবে প্রতিরক্ষা ফৌজ এবং সমগ্র প্রতিরক্ষা যন্ত্রটি সাজাতে হবে যে, শত্রুর অগ্রভাগ সর্বদাই হঠাৎ আক্রমণের সম্মুখীন হবে। মনস্তাত্ত্বিক ফ্যাক্টর হিসেবে ইহা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে অগ্রবর্তী সৈন্যরা প্রত্যেক যুদ্ধে ফাঁদে পড়ে মৃত্যুবরণ করবে, কেননা এতে শত্রু ফৌজের মধ্যে এই বিপদের উপলব্ধি জন্ম নেয়- যতক্ষণ না সেই মুহূর্তটি উপস্থিত হয়, যখন কোন সিপাহী অগ্রবর্তী দলে থাকতে আর রাজী থাকে না এবং ইহা সুস্পষ্ট যে, অগ্ররক্ষী ছাড়া কোন কলাম অগ্রসর হতে পারে না, কেননা কেউ না কেউকে এই দায়িত্ব নিতেই হবে।

১. চেগুয়েভারা ইতিপূর্বে - পৃষ্ঠা ৭০

অধ্যায় ঃ আট

হাজী মুরাদ



হাজী মুরাদ

দার্গোর অভিযান ব্যর্থ হয়েছে। এ বিষয়ে সম্রাটের কাছে ভরন্তস্ফ ভয়ংকর ক্ষয়ক্ষতির জন্য এক পত্রে যে কৈফিয়ত দিয়েছেন, তা এই যে, পর্বতগুলো এখন জানতে পেরেছে যেসব জায়গা এতোদিন অগম্য বলে মনে হয়েছিল, আমরা সেইসব স্থানে এখন পৌঁছুতে পারি। তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন যে, ভবিষ্যতে নিয়মিতভাবে এবং সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হতে পারবো এবং কেবল তাহাই দখল করবো যা আমরা স্থায়ীভাবে আমাদের দখলে রাখতে পারি। রাশিয়ানরা ১৮৪৬ বছরটি ব্যয় করলো নির্মাণ কাজে। বিদ্যমান দুর্গগুলোকে মজবুত করার নতুন দুর্গ নির্মাণ করা, ব্যারাকে আবাসস্থান উন্নত করা, আখতী থেকে জর্জিয়ার ভিতরে একটি সামরিক রাস্তা নির্মাণ এবং বিভিন্ন ফৌজ নিয়ে গঠিত ককেশাস ফৌজের মধ্যে উন্নততর সমন্বয়সাধন ও বিন্যস্ত পঞ্চম আর্মি কোরকে ফিরে যেতে হবে রাশিয়ায় দ্বিতীয় ব্যাটালিয়নগুলোকে পিছনে রেখে, একটা সমগ্র নতুন ডিভিশনের নিউক্লিয়াস হিসেবে- যার মধ্যে থাকবে পদাতিক রেজিমেন্টের চার-পাঁচটি ব্যাটালিয়ন এবং আনুপাতিক হারে বর্ধিত গোলাবারুদ ও প্রকৌশলীগণ; বড় আকারের কোন আক্রমণাত্মক অপারেশন কল্পনা করা হলো না- যদি কোন মারাত্মক যুদ্ধ শুরু হয়, তা হবে কেবল ঈমাম শামিলের পক্ষ থেকে বিরোধীতারই ফল।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, মেজর জেনারেল মোকীন একই কৈফিয়ত লিখেছিলেন, বৃটিশ সরকারের ব্যর্থ ব্লাক মাউনটেন অভিযানের পর। তিনি লিখেছিলেন যে, এতদিন যেসব এলাকায় পৌঁছানো যেতো না, সেগুলো বৃটিশ পদতলে দলিত হয়েছে।[১] এ বিষয়ে এই বাস্তবতাকে অস্বীকার করা হয় যে, স্থানীয় লোকেরা

১. *জেনারেল একস্‌পেডিশন অন ব্লাক মাউন্টেন্স ১৮৮৮*

সেইসব অনতিক্রম্য এলাকায় তখনো রয়ে গিয়েছিল। মনে হলো ঈমাম যেন দার্গো কনফেডারেসী এলাকাগুলো আক্রমণের জন্য তৈরী হয়েছেন। আসলে তিনি গোপনে গোপনে তৈরী হয়েছিলেন কাবারদা অবরোধের জন্য, যা ছিল সকল সামরিক উদ্যোগের মধ্যে সবচাইতে অপ্রত্যাশিত।

এই ঘটনা বোঝা যাবে না, যদি না আমরা পশ্চিম ককেশাসে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যে স্বাধীনতা আন্দোলন চলছে সে সম্বন্ধে জানি। এই আন্দোলন প্রজ্জ্বলিত থাকে ১৮৬৪ সন পর্যন্ত এবং সময়ে সময়ে রাশিয়াকে মোকাবেলার জন্য সংঘর্ষের উভয়ক্ষেত্রে প্রতিরোধের সমন্বয় সাধনের প্রায়াস চলতে থাকে। এখন চেরকেশ এবং অন্যান্য গোষ্ঠী থেকে দূত পাঠানো হলো ঈমাম শামিলের কাছে, তার সাহায্যের জন্য তার উপদেশের জন্য। তিনি নিজেও তার প্রতিনিধিদের পাঠান প্রতিরোধ আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য- যখন আন্দোলন ঝিমিয়ে পড়ে, অথবা সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে সময়ে সময়ে তাদের সাফল্যের জন্য তাদেরকে অভিনন্দন জানাতে। যে কোন স্থানে কোন কিছু ঘটলে ককেশাসে যত দূরবর্তী স্থানেই হোক, তার খবর এত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে যে, কোন উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার অবর্তমানে তা অতি অবিশ্বাস্য মনে হয়; এক স্থানের বিজয় অন্য স্থানের যুদ্ধরত গেরিলাদের মনোবল আকাশচুম্বী করে তুলতো। তাই ১৮৪০-এ কৃষ্ণ সাগরের উপকূলে আখুলগোর পরে রুশ দুর্গগুলোর ধ্বংস সাধন ছিলো ঈমামের ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর। রুশ বিজয় অথবা পরাজয়, তার মিলিটারী শক্তির উপর গভীর প্রভাব ফেলতো, কারণে পশ্চিম সীমান্তে যুদ্ধ অব্যাহত থাকা ঈমাম শামিলের জন্য ছিল আবশ্যক। তিনি স্থির করলেন, কাস্পিয়ান সাগর থেকে কৃষ্ণ সাগর পর্যন্ত শরীয়াহ প্রচলনের সময় উপস্থিত হয়েছে।

পূর্বাঞ্চলে ভ্লাডি কাওকাজের নিকট থেকে এবং প্রায় কাস্পিয়ান পর্যন্ত জর্জিয়ার রাস্তায় মুরিদীজম বিশাল সাফল্য অর্জন করে। পশ্চিমে কুবানের উজান থেকে কৃষ্ণ সাগরের উপকূল পর্যন্ত স্বাধীনতা যুদ্ধ চলতে থাকে। কিন্তু মধ্যবর্তী স্থানে ছিল কাবার্দা, যেখানে চেরিকসের সঙ্গে রক্ত সম্পর্কে সম্পর্কিত একটি যুদ্ধপ্রিয় জাতি বাস করতো।

কাবারদারের অধিবাসীরা রাশিয়ার অধীনতা স্বীকার করে নেয় এবং ১৮২২ সন থেকে প্রকাশ্য বিদ্রোহ থেকে বিরত থাকে- যদিও সম্প্রতি তারা ক্রমেই অস্থির হয়ে উঠেছিল। তাই যুদ্ধ লাইনের একেবারে কেন্দ্রস্থলে সৃষ্টি হয়েছে এক ব্যবধান, যে ব্যবধান দূর করতে না পারলে সব সময় সংঘর্ষের দু'টি মূল অঞ্চল বিভক্ত হয়ে যাবে। যদি কাবারদার লোকেরা অস্ত্র নিয়ে দাঁড়ায়, তাহলে পূর্ব এবং পশ্চিম শুধু সংযুক্ত হবে না- ঈমাম শামিলের শক্তিও বহুগুণে বেড়ে যাবে এবং উত্তর ককেশাসে

রাশিয়ার মুখোমুখি হবে স্বাধীনতা সংগ্রামের সম্মিলিত বাহিনী। এসবের সঙ্গে রাশিয়ার এখনো সাক্ষাত হয়নি। রাশিয়ার বিরুদ্ধে ঈমাম শামিলের বিপুল সাফল্যগুলো নেতৃস্থানীয় কিছু কিছু প্রিন্সের মধ্যে আবেদন সৃষ্টি করে- যারা ঈমাম শামিলকে এসে রাশিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামে অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান করে। এমন একটি সুযোগের জন্য ঈমাম অপেক্ষা করছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তিনি তার মুরীদদের নিয়ে সেখানে পৌঁছানোর জন্য।

অবশ্য মুরীদ বাহিনীর সংহত হবার খবর গোপন রাখা সম্ভব ছিল না। স্থানীয় অবস্থার কারণে উভয় ক্যাম্পে বহু গুপ্তচর নিয়োজিত ছিল, যাতে এই ধরনের গোপনীয়তা সম্ভব না হয়। বিরোধী পক্ষের প্রত্যেকটি গতিবিধি অন্য পক্ষের নিকট জ্ঞাত ছিল। তা শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে দৈনিক প্রতিঘন্টায় তার অগ্রগতির উপর নজর রাখা হচ্ছিল এবং তার খবর জানানো হচ্ছিল। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, কেমন করে ভরন্তসফের ব্যক্তিগত ভৃত্য দার্গো আক্রমণের আগেই ঈমামকে তা জানিয়ে দিয়েছিল। ঈমামের ছিল একটি দক্ষ গুপ্তচর সংগঠন।

রাশিয়ানরা যারা বাইরের লাইন দখল করেছিল, তারা কচিৎ তাদের পরিকল্পনা গোপন করতে পারতো। কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানে তাদের ফৌজের সমাবেশ তাদের আসল উদ্দেশ্য পরিস্কারভাবে জানিয়ে দিতো। ঈমাম শামিলের অবস্থা ছিল ভিন্ন। বিরুদ্ধ অঞ্চল দ্বারা সম্পূর্ণ পরিবেষ্টিত অবস্থায় এবং ভিতর থেকে তিনি যেহেতু যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন, তিনি তার সৈন্য সমাবেশ করতে পারতেন এবং একাধিক দিকে শত্রুকে আক্রমণ করতে পারতেন। তাতে তারা সন্দেহে পড়ে যেত- শেষ মূহূর্ত পর্যন্ত কোথায় আবার আক্রমণ শুরু হবে সে সম্বন্ধে। শত্রুকে হতবুদ্ধি করে দিয়ে তিনি তার নিজের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেন। তাই তিনি পরিকল্পিত উপযুক্ত আত্মরক্ষামূলক পন্থা অনুসারে, ইচ্ছামত যে কোন স্থানে আক্রমণ করতে পারতেন। বর্তমান মুহূর্তে তিনি আর্গোনটিনস্কী এবং ভরন্তস্ফকে বোঝাতে সক্ষম হলেন যে, তার লক্ষ্য হচ্ছে মধ্য দাগীস্তানের আকাশ। এতে রুশ কমান্ডার-ইন-চীফ এতো সন্তুষ্ট হলেন যে, নিজে দক্ষিণে শেমাখা থেকে গিয়ে তিনি ফ্রীতাগকে নির্দেশ দিলেন তিনি যেন ফৌজের গৃহমুখী অগ্রগতি বিলম্বিত না করেন।

এপ্রিলের প্রথম দিকে গ্রোজনীতে ফ্রীতাগ জানতে পারলেন চেচনিয়াতে মুরীদরা জমায়েত হয়েছে, যেখানে ইতিপূর্বে মার্চ মাসে রুশ ফৌজের উপর একাধিক দুঃসাহসী আক্রমণ পরিচালিত হয়েছে। সেই মাসের ১১ তারিখে, শত্রুর লক্ষ্য সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক কোন সুযোগ, এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে তিনি জেনারেল হ্যাসফোর্টকে মেজদোকে অনুরোধ জানালেন সেন্ট পিটার্সবুর্গ থেকে ইতিবাচক নির্দেশ সত্ত্বেও এবং ভরনসোফ তা সম্প্রতি সমর্থন করলেও, পঞ্চাশ আর্মি কোরের অংশ যে দুটি ব্যাটালিয়ন তখন সেখানে অবস্থান করছিল, সেগুলোর গৃহমুখী যাত্রা

যেন স্থগিত না হয় এবং ওকাজের ত্রিশ মাইল উত্তরে তেরেক নদীর তীরে স্টানটিস মাইকোলাইএভশায়াতে তাকে যেন পরিচালনা করা হয়। এ সময়ে ঈমাম শামিলের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ফ্রীতাগের কোন ইতিবাচক জ্ঞান ছিল না। কিন্তু এই গতিবিধি এবং তার সঙ্গে কিজলিয়ারে আর একটি ব্যাটালিয়ন তার নিজের কমান্ডে রেখে যাওয়া, এই অবস্থায় যে কোন আকস্মিকতা মোকাবেলার জন্য তা উপযোগী হবে। কার্যতঃ পাহারা না দিয়েও তেরেকের খাল পার হওয়ার পথ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তাতার্তোব মিনারের বিপরীতে তেরেকের এই অবস্থান। এটি হচ্ছে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ একটি স্থান, যেখানে তাইমোরলেন তোকতানুইশের উপর বিজয় লাভ করেছিলেন এবং এটি ছিল ১৭৮৫ সালে শায়েখ মনসুরের পতনের স্থান। ঈমাম শামিল যদি পশ্চিমে ব্লাডি কাওকাজের দিকে অগ্রসর হতে ইচ্ছা করেন, তাহলে এখানেই তাকে তেরেক অতিক্রম করতে হবে। ইহা সুস্পষ্ট যে, এ বিষয়ে ফ্রীতাগের সন্দেহ ইতিমধ্যেই সৃষ্টি হয়েছে। ব্লাডি কাওকাজ ছিল ১৩০০ সৈন্যের গ্যারিসন দ্বারা সুরক্ষিত। তার সঙ্গে ছিল নাজরানে জেনারেল নেষ্টরোফের ক্ষুদ্র অথচ সংহত ফৌজ। পক্ষান্তরে, যদি ঈমামের লক্ষ্য হয় কিজলিয়ার এবং কৌমিকপ্রান্তর, তাহলে সেখানে অবস্থিত অতিরিক্ত ব্যাটালিয়নটি স্থানীয় গ্যারিসনকে উল্লেখযোগ্যভাবে শক্তিশালী করতে পারবে। যে কোন অবস্থায় কেন্দ্রস্থলে অবস্থানের বামপার্শ্বের ক্ষুদ্রবাহিনীকে অল্প সময়ের নোটিশে একত্র করা সম্ভব ছিল, যাতে সেখানে প্রয়োজনে আক্রমণ করা যায়। তার নিজের উপর সরকারি আক্রমণের সম্ভাবনা বিবেচনার যোগ্য ছিল না। অন্যদিকে ইতিমধ্যেই দাগীস্তানে যাত্রার স্থানীয়ভাবে ব্যবস্থা করা হয়েছে।

প্রথম নিকোলাসের মতো একজন শাসকের আদেশ অমান্য করা একটা তুচ্ছ ব্যাপার ছিল না। তিনি চূড়ান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রথমে নির্ধারিত সময়ের পরেও পঞ্চম আর্মি কোরকে ককেশাসে থাকতে সম্মতি দিয়েছিলেন। এখন তিনি তার প্রত্যাবর্তনের জন্য ইতিবাচক নির্দেশ জারি করলেন। কথা ছিল ১৮৪৪-এর শেষ পর্যন্ত ককেশাসে পঞ্চম আর্মি কোর অবস্থান করতে পারবে, এখন তিনি তাদেরকে প্রত্যাবর্তনের আদেশ দিলেন। নিজের দেশের স্বার্থে জারের আদেশ অমান্য করার জন্য এই কমান্ডারকে উপযুক্ত মর্যাদা দিতে হবে।

ঘটনায় শীঘ্রই প্রমাণিত হয় ফ্রীতাগের কৌশল ছিল সম্পূর্ণ নিখুঁত। কিন্তু তবুও তার অবস্থান ছিল মহা উদ্বেগের কারণ। কেননা যে সংবাদ পাওয়া গেল, তাতে কোন সন্দেহ রইলো না যে এবার শামিলের সৈন্য সংখ্যা হবে তার বাহিনীর চাইতে বড়। অর্থাৎ ফ্রীতাগের একজনের স্থলে শামিলের সৈন্য হবে দু'জন। তার সমগ্র ফৌজের ক্ষেত্রেই এই হিসাব। অসাধারণ দ্রুতগতির অধিকারী বলে ঈমামের ফৌজ অবস্থানের পশ্চিমে কিংবা পূর্বে যে ইউনিটগুলো সন্নিবেশিত হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে বিপুল সংখ্যায় ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবে। ইহা সত্য যে, ফ্রীতাগ বড় জোর কয়েক

ঘন্টার মধ্যেই তাদের নাগাল পেয়ে যাবেন। কিন্তু মুরীদদের মতো এত দ্রুতগতিসম্পন্ন অগ্রাভিযানকারীদের জন্য যাত্রা শুরু করাই ছিল একটা দীর্ঘ ব্যাপার। মুরীদ যোদ্ধাদের সাফল্য রুশদের মনোবলের উপর বিরূপ প্রভাব বিস্তার করবে। ফলে স্বাধীনতার আন্দোলন জোরদার হবে।

আবার ঈমাম শামিল তার কৌশলে সফল হলেন। মেলারজুক মেলোস্কি নদীর উপর ঝুঁকে পড়া জঙ্গল অব্যশই দখল করলেন। কিন্তু ঈমাম শামিলের অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি নীচে নেমে এলেন তার সাথে মোকাবেলার জন্য। ঈমাম তার ভুল বুঝতে পারলেন এবং তিনি অবস্থানটি নিজেই দখল করলেন এবং হাজী মুরাদের সঙ্গে একমত হয়ে দ্রুত তার সমগ্র ফৌজকে দক্ষিণ তীরে নিয়ে গেলেন। তখন মেলারজুক মেলোস্কি তাকে অনুসরণ করেন এবং ফ্রীতাগ নিজে কয়েকঘন্টা পরে নদী পার হয়ে তার পশ্চাদধাবন করেন বিকাল ৪.০০টায়। কিন্তু মহান সুযোগটি হাতছাড়া হয়ে গেছে। ঈমাম শামিল এবং তার গেরিলা ফৌজ ২৪ ঘন্টার কিছু অতিরিক্ত সময়ে ৬৭ মাইল অতিক্রম করেন প্রথমে তাদের বর্হিমুখী মার্চের লাইন ধরে- কিন্তু নদী সিদাখ থেকে ডানদিকে ঘুরে ৬০ মাইল দূরত্বে তেরেক এবং সুঞ্জা পর্বতমালার পানিশূন্য উপত্যকার ভিতর দিয়ে। পরে মিখাইলোভার বিপরীত দিকে এবং সুনজার নিকটে কাজাখকিচুর নিকটে ২৭ তারিখের সকালে আবার ৪০০ সৈন্যের গ্যারিসন দুর্গে ফিরে গেল। তারা তাদেরকে বাধা দেবার জন্য যখন এগিয়ে এলো সেই মুহূর্তে থেকে তাদের পশ্চাদধাবন থেকে তারা হলো নিরাপদ। মেলারজুকমেলেস্কি কোপরা ছাড়িয়ে মুরীদদের পশ্চাদধাবন করলো। কিন্তু মরুভূমি অঞ্চলের মুখোমুখি হতে সাহস না করে তারা আচালকের ভিতর দিয়ে মোড় ফিরলো দক্ষিণ দিকে। এই মরু প্রান্তরে স্থানীয় কয়েকজন লোক পর্যন্ত পানির অভাবে মারা গিয়েছিল। বিকাল ৭.০০টায় ২৫ তরিখে তারা পৌঁছলো সোনজেনিস্কায়াতে অবস্থিত সুনজায়। এভাবে গেরিলাদেরকে বাধা দেবার জন্য মেষ্টারফসের সুযোগ নষ্ট হয়ে গেল। প্রত্যাবর্তনের জন্য উত্তরমুখী রাস্তা ধরার জন্য এবং রাত ৮টায় রাতদিন মার্চ করে ফ্রীতাগ যখন কাজাখকিচু পৌঁছুলেন একই দিনে, তিনি হতাশ হয়ে দেখতে পেলেন ঈমাম সফলতার সঙ্গে তার কৌশল ব্যর্থ করে দিয়েছেন।

কাবারদানদের বিশ্বাসঘাতকতা

ঈমাম শামিল তার মূল লক্ষ্য পূরণ করতে না পারলেও বলতে গেলে তিনি কিছুই হারাননি। সফল পরিচালনার মাধ্যমে তিনি তার সমগ্র ফৌজকেই রক্ষা করেন। রুশরা তার কোন ক্ষতি করতে না পারায় তার খ্যাতি অনেক বেড়ে গেল। এই অভিযানে কাবারদানিরা ঈমামকে সাহায্য না করায় ককেশাসের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর

দৃষ্টিতে অধঃপতিত বিবেচিত হয়। বৎসরের বাকী দিনগুলো ঈমামের গেরিলা বাহিনী ছিল তৎপর এবং তারা দাগীস্তানে বা চেচনিয়াতে রুশদের শান্তি কেড়ে নিল। আক্রমণটি কি রকম দুঃসাহসী ছিল তা বোঝা যাবে- তারা এমনকি গ্রোজনী এবং ভজডভিজহেনসকোর উপর পর্যন্ত বোমাবর্ষণ করলো।

দাগীস্তানে হাজী মুরাদ ঘিমড়ী থেকে বেরিয়ে এসে শুরার গ্যারিসনে হামলা চালান এবং ১৫৮টি ঘোড়া ও ১৮৮টি গরু-ছাগল দখল করেন। এই মোকাবেলায় তিনি ২০ জন শত্রু সৈন্যকে খতম করেন।

ঈমামের গেরিলা যোদ্ধারা এতো তৎপর ছিল যে, ককেশাসে রুশ বাহিনী তুলমানমূলকভাবে শান্তিপূর্ণ এই বৎসরে ১৫০০ জন অফিসার এবং সেপাই হারায়। আহত হয় এবং নিখোঁজ হয় অনেক।

প্রতিরক্ষার প্রস্তুতি

১৮৪৭ সনের প্রথম তিনমাস ঈমাম শামিল ভেদেনে[১] চুপচাপ থাকলেন, ভেদেনকে তিনি বলতেন দার্গো ভেদেন। দার্গোর স্মরণে যাকে ধ্বংস করে ফেলা হয়েছিল দু'বছর আগে- সম্পূর্ণ অনিশ্চিত হয়ে পড়লো- তিনি আবার যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হবেন কিনা, কিন্তু ২৮শে মার্চ সেখানে দেখা গেল একটি উজ্জ্বল উল্কা। একই রাত্রে রুশ দলত্যাগীদের অধিকৃত উপশহর বা কোয়ার্টার পুড়ে ছাই হয়ে গেল। শামিল এই ঘটনাগুলোকে তার অনুসারীদের কাছে ব্যাখ্যা করলেন। প্রথমটি হচ্ছে আল্লাহর আদেশ, জেহাদ আবার আরম্ভ করার জন্য, দ্বিতীয়টি হচ্ছে কাফিরদের ভাগ্যে যা রয়েছে তার আলামত। কালবিলম্ব না করে ভরন্তসফ, যিনি শিক্ষা পেয়েছিলেন ১৮৪৫ সনে, ব্যস্ত হন দুর্গ ও রাস্তা নির্মাণে- ময়দানে যুদ্ধ আরম্ভ না করে। বৎসরের প্রথম অর্ধাংশে উভয়পক্ষই প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। রুশ পরিকল্পনা ছিল তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্র। তাদের লক্ষ্য ছিল প্রধানত ঘারগেবিল, সলতি, সুগরাতিল ও আইরিব[২] দখল করা এবং প্রথম উল্লেখিত পল্লীতে একটি দুর্গ নির্মাণ, যার উপর ভরন্তসফ খুবই গুরুত্বারোপ করেছিলেন। এইসব স্থানে প্রতিরক্ষার জন্য শামিলের ব্যবস্থা থেকে বুঝা যায় অন্যান্য বারের মতো এই সময়ে তিনি তার গুপ্তচর ও তার নিজস্ব জ্ঞানে প্রচুর উপকৃত হন।

ঘারগেবিল অবরোধ

ইতিমধ্যে উল্লেখিত অন্যান্য পল্লীর মতো ঘারগেবিলের অবস্থান ছিল প্রতিরক্ষার জন্য সুবিধাজনক প্রকৃতিগতভাবে মজবুত এবং আরো দৃঢ়ীকৃত কৌশলের কারণে।

১. চেচেনদের ভাষায় ভেদেন মানে হচ্ছে চ্যাপ্টা সমতল জায়গা; চেচেনিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে এটি চেচেনিয়ার ছোট ছোট মালভূমি বা সমতল উপত্যকা বুঝায়– সাধারণত এর আগে কয়েকটি সাতন্ত্র্যবোধক শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন– Dishne-veden, Venoi-veden, Djano-veden, etc.

2. Vorontsoff to Tchernisheff, 13th February 1847, Akti, x. p. 442

আইমিয়াকি সঙ্কীর্ণ পাদদেশে একটি টিলার মুখোমুখি, এটি নির্মিত হয়েছিল একটি এমফিথিয়েটারের মতো। দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে এ ছিল অনধিগম্য, যেখানে ইহা ঝুঁকে পড়েছিল একটি গহ্বরের উপর। বাকী সবকটি দিকে ইহা সুরক্ষিত ছিল পাথরের দেয়াল দ্বারা, যা উপরোক্ত স্তরের উপর নির্মিত হয়েছিল মধ্যস্থানে একটি দুর্গের মতো- এটি বেষ্টিত ছিল ১৪ ফুট উঁচু এবং ৫ ফুট পুরু একটি দেওয়াল দ্বারা। দু'পাশে ছিল দু'টি টাওয়ার, প্রত্যেকটিরই ছিল একটি করে ছোট কামান। এই স্তরে ছিল একমাত্র গোলন্দাজী অস্ত্র এবং বাড়ীগুলোর দেওয়ালে স্থানে স্থানে এভাবে ছিদ্র ছিল যে, প্রত্যেকটি স্তর তার উপরের স্তর থেকে ক্রস ফায়ারের দ্বারা, মুছে ফেলা সম্ভব ছিল; পল্লীর ভিতরে সম্ভাব্য প্রতিটি স্থানেই ছিল ব্যারিকেড, মাটির জাঙ্গাল ইত্যাদি। রুশরা তাদের গুপ্তচরদের মাধ্যমে এসব সম্পর্কে অবহিত ছিল পূর্ব থেকে। তারা আরো অবহিত ছিল যে, স্থানটি রক্ষাকার্যে নিয়োজিত রয়েছে বাছাই করা লোক, যারা কোরআন স্পর্শ করে শপথ করেছে- মরবে তবু নতি স্বীকার করবে না। কিন্তু আক্রমণের দিন পর্যন্ত খুঁটিনাটি ব্যাপার তারা জানতো না।

পহেলা জুন প্রিন্স ভরন্তসফ ঘারগেবিল পৌঁছেন এবং সম্মিলিত দাগীস্তান ও সেমোরের ডিভিশনগুলোর কমান্ড গ্রহণ করেন, যার মধ্যে সাকুল্যে ছিল ১০ ব্যাটালিয়ন পদাতিক সৈন্য- ঘোড়সওয়ার গোলন্দাজ, স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত যোদ্ধারা ব্যতীত। এক বিশাল পাঁচমিশালী বাহিনী। ঐ দিনই গোলন্দাজ বাহিনীগুলো অবস্থান গ্রহণ করে এবং গ্রামের দক্ষিণকোণের সুবিধাজনক স্থানে ভারী গোলাবর্ষণ শুরু হয়- যা মনে হয়েছিল প্রবেশের সহজতম পথ। দুই তারিখ চত্বরের বাগানগুলো দখল করা হয়। তাদের প্রতিরক্ষায় একটি গুলির সম্মুখীন না হয়েই। এর কারণ পরবর্তীকালে জানা যায়, প্রতিরক্ষার জন্য নিয়োজিত মুরীদদের মধ্যে কলেরা ছড়িয়ে পড়েছিল। তৃতীয় দিনের রাত্রে অগ্রসর হওয়ার মতো বড় একটি ফাঁক গড়ে উঠে, ভরন্তসফ দুর্বল প্রতিরোধের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে ভাবলেন যে, গ্যারিসনটি দুর্বল। তাই আক্রমণের হুকুম দিলেন।

ইত্যবসরে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটে যায়। কারাকৈসোর নদীর বাম তীরে উঁচুতে প্রায় একটি অভেদ্য অবস্থানে মুজাহিদীন উপস্থিত হলো বিপুল সংখ্যায়। ঈমাম শামিল তার মুরীদদের সঙ্গে নিয়ে সশরীরে আগমন করেন, চূড়ান্ত সংগ্রামটি প্রত্যক্ষ করার জন্য।

রুশ আক্রমণ

৪ঠা জুন সকাল ৬টায় রুশ ফৌজ আক্রমণ করে। কতগুলো কলাম, এসবের মধ্যে যেভডোকীমফ এর কলামও ছিল, ওরা আদেশমাত্র রওয়ানা করে, এটির উপর দায়িত্ব ছিল গ্রামের পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থান গ্রহণ করার এবং সংকেত পাওয়ামাত্র মরিয়া হয়ে আক্রমণের, যাতে করে আক্রমণের স্থান থেকে গ্যারিসনের একটা

অংশকে বার করে আনা সম্ভব হয়। প্রিন্স ওরভিলিয়ানীর নেতৃত্বাধীন কলাম, যার মধ্যে ছিল আশ্‌ফেরণ রেজিমেন্টের ২১তম ব্যাটেলিয়ন এবং ওয়ারসোর প্রিন্সদের একটি ব্যাটেলিয়ন, তাদেরকে সাহস করে সিঁড়ি এবং যন্ত্রপাতি নিয়ে সোজা এগিয়ে যেতে হবে, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ফাঁক দিয়ে। পাসকিয়েভিচের এবং স্যামুরের আর একটি ব্যাটালিয়নকে রিজার্ভে রাখা হয়। আর্গোটিনোস্কী-ডলগোরোকফের পুরো ডিভিশনটিকে নির্দেশ দেওয়া হলো, বাইরের শত্রুর উপর নজর রাখার জন্য এবং আত্মরক্ষাকারীদের সাহায্যের জন্য যে কোন চেষ্টা প্রতিরোধ করতে। এতে বেশ বিলম্ব হয়ে যায়। সে সময়ে কামানগুলো ভয়ঙ্কর বোমাবর্ষণ করতে থাকে- ভাঙ্গন বা ফাঁকটি আরো প্রশস্ত করার জন্য। বোমাবর্ষণের ফাকে ফাকে প্রহরী রুশীরা দেওয়ালের পিছন থেকে উত্থিত দরাজ গলায় মরণসঙ্গীত শুনতে পায়- যেমনটি শোনা যায় খোলা কবরের কাছে, মাতমের মত। ভরন্তসফের যখন বিশ্বাস হলো তিনি অল্পসংখ্যক সাহসী যোদ্ধার সম্মুখীন হতে যাচ্ছেন, তখন সকাল নয়টায় তিনি হুকুম দিলেন, সংকেত রকেট ফায়ার করার জন্য। রুশরা সম্মুখে ধাবিত হয়। উদ্দিষ্ট স্থান থেকে দূরে এমন জায়গায় তারা দেওয়াল বেয়ে উঠলো যে, পরিণামে এ জন্য তাদের বড় রকমের ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে হলো। কলামের বাকী অংশটি সঠিক নির্দেশনা মতো অগ্রসর হয় এবং আশফেরণ ফৌজ ভাঙ্গনটি অতিক্রম করার চেষ্টা করে। তাদের ওয়ারসো রেজিমেন্টের সাথীরা, তাদের অনুসরণ করে, কিন্তু শত শত রাইফেল থেকে গুলিবর্ষণ সেপাইদেরকে নীচে ফেলে দেয় কর্তিত ঘাসের মত। যেভডোকীমফ নিহত হলেন, এক ডজন বুলেটে ছিন্নভিন্ন হয়ে। ভিন্নকফ, যিনি ছিলেন গ্রেনেড নিক্ষেপক একটি কোম্পানীর ক্যাপ্টেন, তার মৃতদেহ মাড়িয়ে অগ্রসর হন এবং ভগ্ন স্থানটির শীর্ষে পৌঁছুতে সক্ষম হন। কিন্তু আক্রমণে তিনিও নিহত হলেন।

একজন ডেনিস অফিসার এখন ফৌজের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন এবং দেওয়ালটি দখল করে নিলেন। ক্ষয়ক্ষতি ইতিমধ্যেই হয়েছে বিপুল। কিন্তু রুশরা ছিল দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। সামনে ছিল প্রস্তর নির্মিত নীচু সাকালিয়ার প্রথম সারি। এগুলোর প্রাচীর বেয়ে আক্রমণকারীরা সামনের দিকে ধাবিত হয়। যখন আতংকিত হয়ে তারা দেখতে পেল তাদের পায়ের নীচে মাটি সরে যাচ্ছে এবং চিৎকার ধ্বনির মধ্যে তারা নীচে অবস্থানরত মুরীদদের তরবারী ও কিঞ্জালের মুখে পতিত হলো। নীচুতে অবস্থিত প্রত্যেকটি সারির ঘরবাড়ীগুলোর সমতল ছাদ সরিয়ে ফেলা হয়েছে এবং তার স্থলে স্থাপিত হয়েছে কয়েকস্তর ছনবন, যা ঢেকে দেয়া হয়েছিল পাতলা মাটি দিয়ে। বস্তুতঃ প্রত্যেকটি বাড়ীই ছিল এক একটি মৃত্যু ফাঁদ, যেখানে হতভাগ্য আক্রমণকারীদের অবশ্যি পড়তে হবে, মুজাহিদীন কর্তৃক নিহত হবার জন্য। তাদের সঙ্গীদের কেউ তা দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো। তবু কলাম এগুতে থাকে এবং

শীঘ্রই পুরো কলামটি এসে পড়ে দেওয়ালের ভিতর। এতে বহু অফিসার মৃত্যুবরণ করে। একাকী বা ছোট ছোট গ্রুপে যেসব ফৌজ সংগ্রাম করে করে আউলে পৌঁছুতে চেয়েছে তারা এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং গৃহগুলোতে বা সংকীর্ণ রাস্তায় আটকা পড়ে যায়। কোন কমান্ডই আর সম্ভব ছিল না। রুশীদেরকে পশ্চাৎ অপসরণ করতে হয় এবং ঘায়েল অফিসারদেরকে কষ্টের সাথে উদ্ধার করে কলামের অবশিষ্ট অংশটি, দেয়ালের ভগ্নস্থান দিয়ে পিছু হটে। এখানে রিজার্ভ সৈন্যদের দ্বারা সমর্থিত হয়ে তারা আবার ব্যূহ রচনা করে এবং ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে দাবী করে আর একবারের মতো তাদেরকে সম্মুখ যুদ্ধে পরিচালিত করা হবে। দ্বিতীয় প্রয়াসটি ছিল প্রথম প্রয়াসটির পুনরাবৃত্তি। স্থানটি ছিল অভেদ্য। বিজয়ী মুরীদরা দ্বিতীয়বার ভাঙ্গা কলামটিকে বিতাড়িত করে পিছু ধাওয়া করে। কিন্তু এক সময়ে রিজার্ভ বাহিনীর বেয়নেটের মুখে তারা দাঁড়ায়। রুশ ফৌজের বীরত্বপূর্ণ সাহসিকতা সত্ত্বেও আক্রমণটি ব্যর্থ হয় এবং জীবিতরা ক্যাম্পে ফিরে যায়, ক্ষয়ক্ষতি হলো মারাত্মক ধরনের। ৩৬ জন অফিসার এবং ৮৫১ জন সিপাহী নিহত ও জখম হয়। আরো চার দিনের জন্য ভান করা হয়- যেন অবরোধ অব্যাহত থাকবে কিন্তু মাঝে মাঝে কামানের গোলাবর্ষণ ছাড়া অতিরিক্ত কিছুই করা হলো না। প্রত্যেকটি রাত্রে শত্রু নেমে আসে পাহাড় থেকে এবং রুশদের ব্যতিব্যস্ত রাখে- যতদিন না তারা সম্পূর্ণ হতবল হয়ে পড়ে। কলেরা ছড়িয়ে পড়ে এবং ভরন্তসফ অনেকটা আশ্বস্ত হয়ে তার অবস্থান ত্যাগ করে প্রত্যাবর্তন করেন কাজী কুমুক কৈসুর প্রবাহের উজানে।[১]

সলটীতে রুশ ক্ষয়ক্ষতি

ভরন্তসফ এখন তার মনোনিবেশ করলেন সলটীর দিকে, হুকুম দিলেন পহেলা জুলাই এর ভিতরে অবরোধের বিপুল পরিমাণ উপকরণের ব্যবস্থা করার জন্য। এবং ৭ সপ্তাহের নিয়মিত অবরোধের পর তৃতীয় চেষ্টায় পল্লীটি দখল করে হঠাৎ আক্রমণ করে। এই যুদ্ধে উভয় পক্ষেই বীরত্বের পরাকাষ্টা দেখায়। নিহত এবং আহত মিলিয়ে রাশিয়ার ক্ষতি দাঁড়ালো ২০০০ জনে।[২] পরবর্তী বছর অর্থাৎ ১৮৪৮ সনে জুনের মাসে ঘারগেবিলে আবার তিনি ১০,০০০ সৈন্যসহ প্রেরণ করেন আর্গেটিনোস্কি, দলকোরুকফকে। ২৩ দিন অবরুদ্ধ থাকার পর মুরীদরা রাতের আঁধারে ঘারগেবিল পরিত্যাগ করে চলে যায়। তখন বিভিন্ন শক্তির ৪৬টি কামান থেকে ভয়ঙ্কর গোলাবর্ষণ অব্যাহত ছিল।[৩] এই অবরোধের সময় প্রত্যক্ষ সহকারী হিসেবে রুশ কমান্ডার এমন সব লোক পেয়েছিলেন, যারা তার মতই বিখ্যাত হতে

1. Vorntsoff's report to Tchernisheff : Akti x.p. 450
2. For saltee, see Vorontsoff's official report Akti x.pp. 463-783
3 Argonteemky— Dolgornkoffs reports ibid

পেরেছিলেন- যেমন প্রতিভাবান এবং সফল নেতা র‍্যাঙ্গেল এবং ওরবিলিয়ানী; যেভদোকীমোফ এবং বেয়িয়াটিনস্কী, ব্রীমার। এই অবরোধের মধ্যে রাশিয়ানরা এই পার্বত্য পল্লীটিতে বাইরে অবস্থানরত মুরীদদের উপরে ১০,০০০ গোলাবর্ষণ করে। তাদের ক্ষয়ক্ষতির মধ্যে ছিল নিহত ৪ জন অফিসার এবং ৭৬ জন সেপাই আর আহত ১৪ জন অফিসার এবং ৪৬৭ জন সৈন্য। মুজাহিদীন ১০০ জনকে হারায়। ফলে বাগানগুলো দখল করার জন্য প্রিন্স বেরিয়াটিনস্কী এবং হাজী মুরাদের মধ্যে যে যুদ্ধ সংগঠিত হয়, প্রধানত তাতেই ১০০০ মুজাহিদীন শাহাদাৎ বরণ করেন। বিজয়ীরা তাদের চেষ্টায় বলতে গেলে কিছুই লাভ করতে পারেনি। কারণ তারা ঘারগেবিলে তাদের অধিকার রক্ষার সামর্থ ছিল না। তারা পশ্চাৎ অপসরণ করে খোজালমাখিতে নামক স্থানে মুরীদদের পশ্চাদধাবনের সঙ্গে। গভীর খাতের অন্য প্রান্তে আইমিয়াকীতে, পরে যা সুরক্ষিত হয়েছিল, বহু কারণে যা ছিল একটি প্রকৃষ্টতর অবস্থান। সেখানে ঈমাম শামিল ঘারগেবিলের পরিবর্তে নির্মাণ করেন একটি মজবুত দুর্গ যাকে বলা হয় ঔলুকালা।[১]

আখতী অবরোধ

রাশিয়ানরা আখতী রক্ষায় বীরত্বের পরিচয় দেয়। এই সামোরের তীরে অবস্থিত এই দুর্গটিকে রক্ষা করতে গিয়ে রাশিয়ানরা যে অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দেয় তার প্রশংসা না করে পারা যায় না। এখানে প্রথমে কর্ণেল রোতের নেতৃত্বে এবং পরে তিনি আহত হলে, ক্যাপ্টেন নভোসিলফের সেনাপতিত্বে ৫০০ সিপাহী এক সপ্তাহের বেশী সময় দুর্গটি রক্ষা করে। তখন ঈমাম শামিল এবং তার প্রধান লেফটেন্যান্ট দানিয়াল সুলতান, কীবীত মোহুমা, হাজী মুরাদসহহ কয়েক সহস্র সৈন্য নিয়ে আক্রমণ চালাচ্ছিলেন। গ্যারিসনের অর্ধেক সৈন্যই নিহত বা আহত হয়। প্রধান বারুদাগার উড়িয়ে দেয়া হয়। দেয়াল ভেঙ্গে ফেলা হয়, পানি ফুরিয়ে যায় এবং কোন খাবারই আর রান্না-বান্না করা যাচ্ছিল না। চূড়ান্ত পর্যায়ে রাশিয়ানরা স্থির করলো শত্রুর হাতে পড়ার চাইতে নিজেরাই নিজেদেরকে ধ্বংস করে ফেলবে। ১৮৪৩ সনে ঘারগেবিলে মতোই দুর্গরক্ষীরা একটা নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয় যখন তারা দেখতে পেল, আর্গোটিনস্কী- দলগোরোকফের নেতৃত্বে উদ্ধারকারী একটি ফৌজ আসছে। কিন্তু উত্তর দিক থেকে স্যামোর নদী অতিক্রম করার প্রয়াস ব্যর্থ হলে তারা দৃষ্টির অন্তরালে পশ্চাৎ অপসরণ করে।

ভরন্তসফের কতিপয় প্রশাসনিক সংস্কার

১৮৪৮ থেকে ১৮৫৬ এর মধ্যে পূর্ব ককেশাসে রাশিয়ানরা এবং ঈমাম শামিল উভয়েই প্রতিরক্ষায় তৎপর ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তুলনামূলক উল্লেখযোগ্য

1. Kavkazsky Sbornik, vii. pp. 483-538

মোকাবেলা অল্পই হয়েছে, যাতে কোন পক্ষেরই তেমন কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। ঈমাম শামিল পশ্চিম দাগীস্তান দখল করে থাকলেন, তাকে বাধা দেবার কেউ ছিল না। পশ্চিম দাগীস্তানের অন্তর্গত ছিলো আভারিয়া এবং চেচনিয়ার বৃহদংশ। পক্ষান্তরে সলতি ও ঘারগেবিলের ধ্বংস সাধন, আইমিয়াকী সোদখার এবং অন্যান্য স্থানে দুর্গ নির্মাণ, স্থায়ী স্টাফ কোয়ার্টার প্রতিষ্ঠা, উপযুক্ত স্ট্রাটেজিক স্থানগুলোতে ব্যারাকে ব্যাপক বাসস্থানের সুযোগ রাশিয়ার জন্য অবরোধের সম্ভাবনা বিপুল পরিমাণে হ্রাস করে দেয়। তার অধীনস্থ স্থানীয় রাষ্ট্রগুলোরও হামলার আশংকা কমে যায়। প্রিন্স ভরন্তসফ যখন বুঝতে পারলেন বর্তমান অবস্থায় মুরিদীজমের উপর মৃত্যু আঘাত হানার মতো যথেষ্ট শক্তি তার নেই, তখন তিনি সকল দিকে তার লাইনগুলো মজবুত করার জন্য মনোনিবেশ করলেন, অপেক্ষা করতে থাকলেন একটি সুবিধাজনক মুহূর্তের জন্য যখন তিনি আরো সক্রিয় পলিসি অনুসরণ করতে পারবেন।

অন্যদিকে তিনি বেসামরিক প্রশাসনের সংস্কারের জন্য তার বিপুল সামর্থ ও শক্তিকে নিয়োজিত করলেন। এই ক্ষেত্রে ককেশাসের মতো বিচিত্র এবং বিস্তৃত অঞ্চলে তিনি স্থায়ী সাফল্য অর্জন করেন। এর উপরই ককেশাসে ভাইসরয় বা রাজপ্রতিনিধি হিসেবে তার খ্যাতি নির্ভর করে। কিন্তু তার সামরিক লক্ষ্য কোন রকমেই কেবল নিষ্ক্রিয় প্রতিরক্ষা ছিল না, বিশেষ করে চেচনিয়াতে, যেখানে পূর্বের মতই চলছিল নির্বিচার দলীয় যুদ্ধ। মাঝে মাঝে বৈচিত্র্য সৃষ্টি হতো ব্যাপক স্তরে, হামলা অভিযানের মাধ্যমে।

হাজী মুরাদের বীরত্বপূর্ণ কর্মকান্ড

ঈমাম শামিল বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে তার প্রভাব সৃষ্টির জন্য ব্যস্ত ছিলেন। তৎসঙ্গে তাদেরকে একটি মাত্র শক্তিশালী ইউনিটে সংগঠিত করতে চাইছিলেন। তার পতাকার নীচে হাজার হাজার মুরীদ ভিড় করে, তারা তাদের জান কোরবান করবার জন্য প্রস্তুত ছিল। ঈমামের প্রধান প্রতিনিধি হাজী মুরাদ রাশিয়ানদের শিক্ষা দেবার জন্য এই ইউনিটকে যে কোন স্থানে নিয়ে যেতে পারতেন। সলতী এবং ঘারগেবিলে ১৮৪৮ সনে রাশিয়ানদের সাফল্যের সঙ্গে সমতা সাধিত হয় পর বৎসর- যখন তবখের নিকট কীবিত মোহুমার নতুন দুর্গ দখল করতে গিয়ে আর্গোটিনস্কির চেষ্টা ব্যর্থ হয়। একটি অসাধারণ রকমের মজবুত অবস্থান দখল করেছিল এই দুর্গ- দাগীস্তনের জন্যে ও গুনিবের দক্ষিণ-পূর্বে ১২ মাইল দূরে একটি পর্বতের উপর- দীর্ঘস্থায়ী বোমাবর্ষণের পর, যাতে ২২,০০০ বোমা বর্ষিত হয়। রুশ কমান্ডার আক্রমণের ঝুঁকি না নিয়ে পশ্চাৎ অপসরণ করে এবং যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত তচোখ্ রয়ে যায় একটি অক্ষত অস্পষ্ট দুর্গ। এর বিরুদ্ধে রাশিয়ানরা আখতীর

সামরিক রাস্তা সম্পূর্ণ করার কাজে মনোযোগ দিতে পারতো। এই রাস্তা নির্মিত হলে তিফলিস ও শূরার মধ্যকার যোগাযোগের পথ ২৫০ মাইলেরও বেশী কমে যেত। এর মধ্যে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে রাশিয়াতে নির্মিত প্রথম সুরঙ্গ পথ। একই বৎসর প্রথম দিকে (১৪ই এপ্রিল) হাজী মুরাদ তার খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত করেন মুরীদ নেতাদের মধ্যে সবচেয়ে দুঃসাহসী বলে। কেননা তিনি রুশ দাগীস্তানের রাজধানী এবং প্রধান সামরিক কেন্দ্র শূরার উপর হামলা চালান। এই ঘটনার পর সম্রাট নিজে তীব্র তিরস্কার করতে বাধ্য হন। এই সময়েই তার পশ্চাদধাবনকারীদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য ঘোড়ার পায়ের নাল উল্টো করে লাগানোর সুপরিচিত কৌশল অবলম্বন করা হয়।

পরের বৎসরে তিনি পূর্ব জর্জিয়াতে ঢুকে পড়েন এবং বাবরআতমিনস্কায়ার রুশ গ্যারিসনটিকে তরবারির সাহায্যে সম্পূর্ণ ছিন্নভিন্ন করে দেন।

১৮৫১ সালে ঈমাম শামিল হাজী মুরাদকে প্রেরণ করেন বাবরআইতাগো এবং তাবাসসারানের উপকূলীয় প্রদেশগুলোতে- রুশ প্রভুদের বিরুদ্ধে সেখানকার অধিবাসীদের আবার জাগ্রত করা রজন্য। আবার তিনি নিজকে বিখ্যাত করে তোলেন, সেই সব দুঃসাহসী শত্রুকে এড়িয়ে যাওয়ার প্রয়াস দ্বারা যা ককেশিয়ার যুদ্ধের ইতিহাসে তার খ্যাতিকে অমর করে রেখেছে। ৫০০ অশ্বারোহী নিয়ে তিনি রাত্রিকালে দার্বেন্দ এবং শূরার মধ্যবর্তী সামরিক রাস্তার উপর সমৃদ্ধিশালী নুইনাক পল্লীতে প্রবেশ করেন এবং টার্কোর শামখালের ভাই শেখ ওয়ালিকে তার বাড়ীর চৌকাঠের উপর হত্যা করেন এবং তার স্ত্রী ও সন্তানদেরকে বন্দী করে নিয়ে যান। ঈমাম শামিল এদের জন্য মোটা রকমের মুক্তিপণ আদায় করেন। এই অভিযানে হাজী মুরাদ এবং তার সঙ্গী সৈন্যরা ৩০ ঘন্টার কম সময়ের মধ্যে ১০০ মাইল অতিক্রম করেন। তার পিছনে তীব্রগতিতে ধাওয়া করে রুশ সৈন্য, তবু তিনি তাদের এড়িয়ে যান। তার সাহসের কোন সীমা পরিসীমা ছিল না। এ কোন বিস্ময়ের ব্যাপর নয় যে, ঐসব জেলার অধিবাসীদের কাছে তিনি হয়ে উঠলেন ভয়ঙ্কর আতঙ্কের বিষয়। জেলাগুলো ইতিপূর্বে রাশিয়ার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল- এ পর্যন্ত যে একবার একজন রুশ অফিসারের কমান্ডে ১৫০০ স্থানীয় মিলিশিয়া, ২০ জনের মত মুরীদের সম্মুখে পালিয়ে যায়, তারা 'হাজী মুরাদ', 'হাজী মুরাদ' উচ্চস্বরে বলে আক্রমণ পরিচালনা করেছিল।

একটি ভুল বোঝাবুঝি

ঈমাম শামিলের সঙ্গে হাজী মুরাদের কিছু ভুল বোঝাবুঝি হয়। তিনি নিজের ফৌজ পরিত্যাগ করে রাশিয়ানদের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। হাজী মুরাদের এই বিশ্বাস হয়েছিল যে মুরাদের শক্তিতে ভীত হয়ে তিনি চেয়েছিলেন হাজী মুরাদ নিহত হন।

এ ছিল একটি বড় রকমের মিথ্যা। কিন্তু হাজী মুরাদ ঈমামকে ভুল বুঝলেন। কর্ণেল প্রিন্স ভরন্তসফ হাজী মুরাদকে পাঠিয়ে দিলেন তার পিতার নিকট, যিনি ছিলেন তিফলিসের ভাইসরয়। তিনি তাকে উল্লাসের সঙ্গে গ্রহণ করলেন এবং সম্রাটের কাছ থেকে সম্মতি আদায় করলেন, যাতে হাজী মুরাদ ককেশাসে থেকে যেতে পারেন তিনি যে খেদমতের আঞ্জাম দিতে পারেন তার বিবেচনায়। কিন্তু নিকোলাস, ভরন্তসফের চিঠির মার্জিনে লিখলেন ভগবানকে ধন্যবাদ, একটা শুভ সূচনা হয়েছে। তিনি চিঠির মার্জিনে লিখলেন, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অবিশ্বাস থেকে, যে ব্যক্তি একবার বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, সে আবার তা করতে পারে এবং সমস্ত দায়িত্ব তিনি ভরন্তসফের উপর চাপিয়ে দিলেন। হাজী মুরাদ তিফলিসে এক ধরনের সম্মানজনক কয়েদীর জীবনযাপন করতে লাগলেন। কিন্তু তার পরিবার-পরিজন ছিল সেলমেসে। এলাকাটি ছিল ঈমাম শামিলের অধীনস্থ একটি সুরক্ষিত স্থান। হাজী মুরাদ বাধ্য হয়ে তার পরিবার-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে খুবই বিচলিত ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন প্রিয় স্বামী এবং স্নেহপরায়ণ পিতা। তিনি তার পরিবার-পরিজনের জন্য ভীষণ দুঃখ অনুভব করলেন। তিনি সারারাত প্রার্থনা করে কাটান এবং দুর্বল হয়ে পড়েন। তখন তাকে পাঠানো হয় গ্রোজনীতে- তিনি তাদের উদ্ধারের কোন ব্যবস্থা করতে পারেন কিনা। এতে ব্যর্থ হয়ে তিনি তিফলিসে ফিরে আসেন এবং সেখান থেকে তার নিজের অনুরোধে তাকে পাঠানো হয় নৌখাতে, এই অজুহাতে যে, সেখানে তিনি তার ধর্মের নিয়মকানুন আরো কঠোরভাবে পালন করতে পারবেন। এখন হাজী মুরাদ যা কিছু করেছেন তার জন্য অনুশোচনায় ভুগতে লাগলেন। তখন তিনি ছিলেন ঘিয়ুরদের হাতের মুঠোয়। কঠোরভাবে তার কাজকর্মের উপর নজরদারী রাখা হয়। তিনি তার পরিবার-পরিজনকে দেখার জন্য উদ্বিগ্ন ছিলেন। ঈমাম শামিল এবং অন্যান্য মুজাহিদীনের মত তিনি ছিলেন অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ পিতা ও স্নেহপরায়ণ স্বামী। তিনি স্থির করলেন তিনি পালিয়ে যাবেন এবং ঈমাম শামিলের কাছে গিয়ে তার ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। এক সন্ধ্যায় তিনি যখন তার চারজন বিশ্বস্ত অনুচরকে নিয়ে ঘোড়া চালাচ্ছিলেন এবং কমান্ডার-ইন-চীফের কেবলমাত্র ৫ কিংবা ৬ জন কোসাকের এক কনভয় তাদেরকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন হাজী মুরাদ সহসা তার পিস্তল বের করলেন এবং কমান্ডের নন কমিশন অফিসারটিকে হত্যা করলেন। তার সঙ্গীরা একজন কোসাককে হত্যা করে এবং ছোট্ট দলটি ঘোড়া হাকিয়ে উধাও হয়ে যায়। তাদের জন্য দায়িত্বে ছিলেন ক্যাপ্টেন বুতেহকীয়েফ। তিনি এই ঘটনার খবর পেয়ে উন্মাদ হয়ে পড়লেন এবং ঘোড়া হাঁকিয়ে তিফলীস পৌঁছুলেন। ভরন্তসফ তার কঠোর প্রভুর প্রতি বিপুল ব্যক্তিগত দায়িত্বের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং তার অধঃস্তন কর্মচারীর বড় রকমের অসতর্কতার কারণে এখন হাজী মুরাদ পালিয়ে

গেছেন, এই অপ্রীতিকর সংবাদ জানানোর কর্তব্য তাকে পালন করতে হবে। অবশ্য সৌভাগ্য বশত নৌখাতে রাশিয়ানদের কর্ণেল কোরগানফ ছিলেন শক্তিমান এবং বিচার বিবেচনা সম্পন্ন মানুষ। তিনি জানতেন যে গিরি সংকটগুলোয় পাহারাদার মোতায়েন রয়েছে। তিনি হুকুম দিলেন মিলিশিয়াদের সমতলভূমির রাস্তা ধরে অগ্রসর হতে- যে পথ ধরে হাজী মুরাদ ১৮৫০ সনে বাবার্তমিনস্কায়ার উপর আক্রমণের জন্য অগ্রসর হয়েছিলেন। দু'দিন পরে ১৮৫২-এর ২৩শে এপ্রিল হাজী মুরাদ আবিষ্কৃত হলেন। তিনি বিপুল এক মিলিশিয়া বাহিনীর দ্বারা একটি জঙ্গলে বেষ্টিত হয়ে পড়েছিলেন। এই সব মিলিশিয়ার সাথে যোগদান করে আরো ফৌজ। তাদের সঙ্গে যোগ দেয় হাজী মুরাদের এক জানী দুশমনের নেতৃত্বে এলাকাবাসী। এখন শুরু হলো সেই সব নাটকীয় দৃশ্যের একটি যা ককেশাসের যুদ্ধপ্রণালীতে বার বার দেখা গিয়েছে। পলায়ন যখন অসম্ভব মুরীদরা তাদের কিনজাল দ্বারা একটি গর্ত খোদাই করে তাদের ঘোড়াগুলোকে হত্যা করে আত্মরক্ষার জন্য তাদের দিয়ে তৈরি করে একটি বাঁধ এবং মরণ সঙ্গীত গেয়ে তারা তৈরি হলো তাদের দুশমনদেরকে বিপুল সংখ্যায় হত্যা করতে। তাদের কার্তুজগুলো যতক্ষণ ছিল তারা এক একজনে ১০০ শত্রুকে ঠেকিয়ে রাখে। অতঃপর হাজী মুরাদ খালি মস্তকে তরবারী হাতে নিয়ে লাফিয়ে উঠলেন তার দু'জন সঙ্গীসহ, শাহাদাৎ বরণের জন্য। যারা ছিল গুরুতরভাবে আহত তাদেরকে বন্দী করা হয় এবং মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়। এভাবে ১৮৫২ সালের ২৪শে এপ্রিল শাহাদাৎ বরণ করেন হাজী মুরাদ। তিনি যেভাবে জীবনযাপন করেছিলেন, সেভাবেই মৃত্যুবরণ করেন। তার উচ্চাভিলাস ছিল তার সাহসেরই মতো। তিনি একটি সাহসী জাতির একটি সাহসী সন্তান ছিলেন। তিনি বিপদ উপভোগ করতেন। পার্বত্য ভূমির অস্থির এবং কঠিন জীবনকে তিনি বেহতর মনে করতেন রাশিয়াতে দাস জীবনের আরাম-আয়েশ থেকে। নির্লজ্জ জীবনের চাইতে মৃত্যুকেই সম্মানজনক মনে করতেন এবং রক্ত অর্পণের মধ্যদিয়ে তিনি তার এই আদর্শকে তুলে ধরেছিলেন। তিনি বহু বিজয় অর্জন করেছিলেন। তার প্রথম দিকের শিক্ষা একটি জীবন্ত ভূমিকা পালন করে তার মধ্যে চমৎকার গুণাবলীর বিকাশ সাধন করতে; সেই শিক্ষাই তার অন্তর্নিহিত শক্তিকে বের করে আনে। তার বিস্ময়কর সাফল্যগুলোর মূলে প্রধানত ছিল তার প্রথম জীবনের শিক্ষা। তাই এখানে তার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

"বারিয়াটিস্কী তার নিজের বাড়ীতেই ছিলেন ৫ বছর বয়স পর্যন্ত। পরবর্তী দুই বছরে সকল রকম পরিশ্রমের জন্য তার শরীরকে তৈরী করা হয়। শারীরিক ব্যায়াম, অশ্বারোহন, ঠান্ডা পানিতে গোসল এবং এই ধরনের আরো কষ্ট তার শারীরিক ষ্টেমিনা বর্ধন করে। এরপরে তাকে শেখানো হয় বিভিন্ন ভাষা, তখনকার দিনে রাশিয়ার অভিজাতেরা, রুশ ভাষা শিক্ষার উপর তেমন গুরত্ব দিতো না।

বেরিয়াটিনস্কী, ফরাসী, গ্রীক এবং আরবী ভাষা ছাড়াও রুশ ভাষা শিক্ষা লাভ করেন। তিনি কবিতা জানতেন, বাগ্মিতাও জানতেন, গণিত, ইঞ্জিনিয়ারিং, কার্যক্ষেত্রে কৃষিকর্ম এবং কাঠের কাজ জানতেন। এই কাজগুলো তাঁকে শেখানো হয়, তার মধ্যে ব্যবহারিক দক্ষতা সৃষ্টির জন্য। এই পেশাগুলো শিক্ষা লাভের পর বেরিয়াটিনস্কীকে ৫ বছরের এক ট্যুরে ইউরোপ পাঠানো হয়। এ সফরে তিনি ইউরোপের সবগুলো দেশ ভ্রমণ করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল তার মধ্যে উদার দৃষ্টিভঙ্গী এবং পরিণত উপলব্ধির সৃষ্টি। একদল শিক্ষক এই সফরে তার সঙ্গী হন। তার সফরসঙ্গীদের মধ্যে ছিলেন একজন রাসয়নবিদ, একজন ডাক্তার, একজন উদ্ভিদবিজ্ঞান বিশারদ এবং একজন মেকানিক। আশা করা গিয়েছিল এই সফরে তিনি ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন করবেন এবং জীবনের বিচিত্র সমস্যার সত্যকে উপলব্ধি করতে পারবেন।

তার ইউরোপীয়ান সফরের পর পার্টি তাকে অনুসরণ করে দুইবছর স্থায়ী রাশিয়ান সফরে। ৭ বছর সফর শেষে তাকে কৃষিকর্ম তদারকের কাজে নিয়োগ করা হয়। তার পিতা প্রকাশ্যভাবে চেয়েছিলেন তার পুত্র যেন সেনাবাহিনী, পররাষ্ট্র বিভাগ কিংবা সভাসদের কোন চাকরি গ্রহণ না করে। তিনি স্বরাষ্ট্র কিংবা অর্থ মন্ত্রণালয়ে যোগ দিতে পারতেন। তার পিতা তাকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তার সমস্ত ধন-সম্পত্তি, ধন-দৌলতের অধিকারী হবেন। বিস্ময়কর মনে হয় যে, পিতার ইচ্ছাকে উপেক্ষা করে তিনি সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। রাজ পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের জন্য রানী তা জানতে পারেন এবং বেরিয়াটিনস্কীর দৃষ্টিভঙ্গী সমর্থন করে তিনি তাকে তার নিজ রেজিমেন্টেই কমিশন দান করেন।

বেরিয়াটিনস্কীর মধ্যে ছিল একটি বিপদের সঙ্গে মোকাবেলা করার নেশা। তিনি ককেশাসে গিয়ে ককেশাসের চাঞ্চল্যকর জীবনের অভিজ্ঞতা লাভে ইচ্ছুক ছিলেন। তাকে একটি কোসাক রেজিমেন্টে নিয়োগদান করা হয়- যাতে তিনি বীরত্বের পরিচয় দেন। একটি অভিযানে তিনি ছিলেন একমাত্র জীবিত ব্যক্তি এবং গুরুতররূপে আহত হওয়া সত্ত্বেও তিনি শেষ পর্যন্ত লড়ে যান, যার পুরস্কার হিসেব তাকে একটি সোনার তরবারী দান করা হয়। পরবর্তী ১৫ বছর তিনি যুদ্ধ চালিয়ে যান এবং বহুবার আহত হয়ে ফিরে আসেন। বিখ্যাত রাশিয়ান ঔপন্যাসিক টলস্টয় তার সম্পর্কে লিখেন, কমান্ডারগণ, অফিসারগণ এবং সকল সিপাহী তাকে প্রভূতভাবে ভালোবাসে, সন্দেহ নেই যে তিনি একজন মহৎ কমান্ডার। বেনিয়াটিনস্কীর শিক্ষা তার মধ্যে বিভিন্ন ব্যাপারে বোঝার একটি ক্ষমতা সৃষ্টি করে। তিনি অবস্থার একজন দক্ষ বিচারক ছিলেন। তার দক্ষ গভর্ণরশীপের কারণেই তিনি যুদ্ধে জয়লাভ করেন, যে যুদ্ধে ইতিপূর্বে তাদের পরাজয়ের পর পরাজয় বরণ

করতে হয়েছে।

জেনারেল ওকলনিটিচি হাজী মুরাদ সম্পর্কে বলেন, ঈমাম শামিলের মত বড় রকমের এবং গুরুত্বপূর্ণ সামরিক উদ্যোগ গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিভা হাজী মুরাদের ছিল না- যা ছিল ঈমাম শামিলের। কিন্তু তা সত্ত্বেও হামলাকারী দলের নেতা হিসেবে দুঃসাহসী অভিযান চালানোর ব্যাপারে তাকে ছাড়িয়ে যাবার মতো কেউ ছিল না। এ ছিল তার জন্য এক সহজ ব্যাপার। ৪০০ কিংবা ৫০০ ঘোড়সওয়ার নিয়ে আমাদের এলাকার একেবারে ভিতরে হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়া। তার জন্য সহজ ব্যাপার ছিল আজ ৫০ মাইল এবং আগামীকাল ৮০ মাইল, অতিক্রম করা, মিথ্যা সংকেত দিয়ে শত্রুর দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং ব্যাপক ভীতি সৃষ্টির মাধ্যমে লাভবান হয়ে অক্ষত অবস্থায় পালিয়ে যাওয়া। এইসব গুণাবলী সময়ে হাজী মুরাদের জন্য এত খ্যাতির জন্ম দেয় যে, আর কোন নায়েবই পার্বত্য অঞ্চলে এতো খ্যাতি অর্জন করেননি।

প্রিন্স বেরিয়াটিনস্কী

১৮৫২ সনে প্রিন্স বেরিয়াটিনস্কী বাম পার্শ্বের সৈন্যদলের প্রধান হন, তার ফৌজের সংখ্যা ছিল তার আদেশ মতো ১০,০০০ জন। এক বছর পরে বেরিয়াটিনস্কী ককেশাসে এলেন রাজপ্রতিনিধি এবং প্রধান সেনাপতিরূপে। তিনি আগেকার অভিযানগুলোতে যেসব ভুল-ত্রুটি হয়েছিল সেগুলো বিবেচনা করে নতুনতর এবং অধিকতর সাহসী পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল। ব্যাপক হারে জঙ্গল কর্তন, যা ফ্রীতাগ আবার শুরু করেন, তা অব্যাহতভাবে চলছিল, যেভডোকীমোফ কর্তৃক, যাতে রাশিয়ান লাইন নিরাপদ হয়। তৎসঙ্গে এ ধরনের স্থানীয় সুরক্ষিত স্থানগুলোতে পৌঁছুনোর জন্য যেসব সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয়েছিল সেগুলো তখনো বহাল থাকে।

ঈমামের সংকট

প্রতিযোগিতার অধীন অঞ্চলে যেসব চেচেন বাস করতো এখন তারা দেখতে পেল তাদের অবস্থান অসহনীয় হয়ে পড়েছে। কেননা রুশ বিজয় তাদের জীবনকে করুণ করে তুলেছে। রুশরা ঈমামের পক্ষ অবলম্বন করার জন্য এইসব লোককে হয়রানি করতো এবং শাস্তি দিতো। ঈমাম তাদেরকে চেচনিয়ার ভিতরে হিজরত করার অনুমতি দিলেন। সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কোসাক লাইন দক্ষিণ দিকে সম্প্রসারিত হয়, কেননা রাশিয়ানরা যেখানে আক্রমণ করেছিল সেই অঞ্চলের প্রান্তবর্তী অধিকাংশ কৃষকই হিজরত করে অধিকতর নিরাপদ দক্ষিণাঞ্চলে চলে যায়। এর ফলে রাশিয়ানরা দাগীস্তানের চর্তুপার্শ্বে তাদের অধিকারের বৃত্ত আরো এঁটে আনে। কোসাক কলোনীর লাইন আরো মজবুত করা হয়। এদিকে অরণ্যের

বৃক্ষাদি কর্তন এবং গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা নির্মাণের ফলে রাশিয়ানদের যোগাযোগের লাইন অধিকতর নিরাপদ হয়ে উঠে।

লিও টলস্টয়

এই সময়ে বিংশতিতম গোলন্দাজ ব্রিগেডে কর্মরত ছিলেন একজন অফিসার হিসাবে কাউন্ট লিও টলস্টয়। তখনই তিনি কোসাক জীবন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেন এবং ককেশীয়দের যুদ্ধ প্রণালী সম্পর্কে– যা তিনি অত্যন্ত উজ্জ্বলভাবে তার বহু সামরিক কাহিনীতে লিপিবদ্ধ করেন। ১৮৫২ সালের একটি কাহিনী দি কসাকস্ আমাদেরকে দেয়, তখনকার দিনের জীবনের একটি উজ্জ্বল চিত্র, চেচনিয়ার সঙ্গে মোকাবেলার। ক্রিমিয়ান যুদ্ধের শুরুতে টলস্টয় বদলী হয়ে যান সেবাস্তোপলে। তিনি হাজী মুরাদের জীবনকে কেন্দ্র করে আর একটি উপন্যাস লিখেন।[১]

১৮৫৪ সালের ২৮শে মার্চ ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ড রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং ১৮৫৬ সালের ৩০শে মার্চ পর্যন্ত শান্তি স্থাপিত হয়নি। তৎকালে ইরানের যে কোন বিরুদ্ধতা বা শত্রুতা পরিস্থিতি বদলে দিতে পারতো। এক সময়ে পরিস্থিতি এতোই বিপজ্জনক হয়ে উঠলো যে, ককেশাসের বেসামরিক গভর্নর জেনারেল রোড ১৮৫৪ সালের এপ্রিলে প্রস্তাব করেন পারস্যের মতিগতির বিবেচনায় দাগিস্তান থেকে সকল গ্যারিশন প্রত্যাহার করা উচিত। এতে মৌলক থেকে আরাস পর্যন্ত সমগ্র পূর্ব ককেশাস এসে যেত ঈমাম শামিলের অধীনে। এই সময়ে পারস্য যখন একটি ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করতে পারতো, তখণ দাগিস্তানের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকরা করে এবং তেহরানে একটি গোপন কনভেনশনে ১৮৫৪ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর পারস্য রাজি হয়– যতদিন যুদ্ধ থাকবে ততদিন পারস্য সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকবে। যেহেতু রাশিয়া সাবেক যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসাব বাকি অর্থের দাবি পরিত্যাগ করেছে– ঘুষ দিয়ে ইরানের শাহ্-এর নিরপেক্ষতা খরিদ করা হয়। এই চুক্তি গোপন থেকে যায় এবং রুশ সরকারকে বিপুল পরিমাণে সাহায্য করে।

রুশ জিম্মিগণ

ইত্যবসরে ঈমাম শামিল দেশবাসীর মধ্যে তার প্রভাব অক্ষুণ্ন রাখার জন্য যুদ্ধকে দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করেন। ১৫,০০০ অনুসারীদের নিয়ে ১৮৫৩ সালের আগস্ট মাসে পূর্ব জর্জিয়ার দাযারোবিয়েলোকানী অঞ্চলগুলো আক্রমণ করেন। কিন্তু রুশ সেনাপতি তার যোগ্যতা প্রমাণ করেন– ৫টি শৃঙ্গ অতিক্রম করে এবং মুখোমুখি যুদ্ধে ঈমামের ফৌজকে পরাজিত করেন। রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে আর একটি প্রচেষ্টায় ঈমামের ৫০০ সৈন্য শাহাদাত বরণ করে।

১। 'হাজী মুরাদ' নামে একটি চলচ্চিত্রে রূপদান করা হয়েছে।

ঈমাম শামিল তার পুত্র জামালউদ্দিনকে ভুলতে পারেননি, যাকে রাশিয়ানরা বিশ্বাসঘাতকতা করে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলো। তার পুত্রের মুক্তির জন্য তিনি দীর্ঘদিন চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সবই ব্যর্থ হয়। এখন ব্যাপার এই হলো যে, কাজী মুহাম্মদের অধীনে একটি ক্ষুদ্র দল প্রিন্সেস অরবিলিয়ানীর পল্লী বসতি দখল করে– পুরো পরিবারটিকে ধরে নিয়ে যায়। রানীর সঙ্গে ছিলেন জর্জিয়ার সর্বশেষ জারের পৌত্র। এই জারের নাম ছিলো দ্বাদশ জর্জ। এখন ঈমামের পুত্রের পরিবর্তে এদের মুক্তি দেবার সময় এলো। এই বিখ্যাত পরিবারের বন্দীত্ব মারাত্মক উদ্বেগের জন্ম দেয় এবং তাদের মুক্তির জন্য আপোস আলোচনা শুরু হয়। সম্রাট এর বদলে জামালউদ্দিনকে ছেড়ে দিতে রাজী হলেন। ঈমাম শামিল মুক্তিপণও দাবী করেন– কেননা তিনি জানতেন যে কোন প্রস্তাবে রাশিয়ানদের সম্মত হওয়া ছাড়া উপায় নেই। দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর রাশিয়া ৪০,০০০ রুবলে রাজি হয়। ১৮৬৫ সালের ১০ই মার্চ এই বিনিময় কার্যকর হয় যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে ছোট্ট নদী মিশিকের তীরে।

জামালউদ্দিন তখন রুশ লেনসার রেজিমেন্টের একজন লেফটেন্যান্ট। রাজকুমারীর স্বামী প্রিন্স চাভাৎচাভাজে এবং রুশ ফৌজের কমান্ডিং অফিসার ব্যারণ নিকোলাই, জামালউদ্দিনকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন। এই তিনজন প্রহরী হিসাবে ৩০ জনকে নিয়ে এবং গাড়ী মুক্তিপণ বোঝাই করে নদীর তীরে এড়িয়ে এলো। এদিকে কাজী মোহাম্মদ সমসংখ্যক মুরীদ নিয়ে অপর তীরে এলেন দুই চাকাওয়ালা গাড়ী করে বন্দীদের নিয়ে। তখন জামালউদ্দিন দুইজন অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে এবং টাকা বোঝাই গাড়ীটি নিয়ে নদী পার হয়ে বামতীরে গেলেন। এইদিকে রাজকুমারীরা গেলেন ডানতীরে যেখানে তারা গ্রোজনী থেকে আনীত ঘোড়ার গাড়ীতে আরোহন করেন। জামালউদ্দিনকে রুশ ইউনিফর্ম খুলে ফেলে দাগিস্তানী পোশাক পরিধান করানো হয়। তারপর ঈমাম শামিল পাহাড়ের যে উঁচুস্থানে অবস্থান করছিলেন, সেখানে গাড়ীতে করে নিয়ে যাওয়া হয়। তার দুইদিকে ছিলেন কাজী মোহাম্মদ এবং দানিয়েল সুলতান। তাকে পরিবেষ্টন করেছিলো মুরীদেরা, বিশাল আকৃতি একটি নীল রঙের ছাতার নীচে। পুত্র যখন নিকটে এলো ইমাম কাঁদতে কাঁদতে তাকে আলিঙ্গন করলেন। কিন্তু যে ঘটনার জন্য এতোদিন তিনি আশা করেছিলেন, তাতেই নিহিত ছিলো তিক্ত হতাশা।

জামালউদিনের ভাগ্য আসলেই ছিলো করুণ। ১২ বছর বয়স থেকে সেনট পিটার্সবুর্গে লালিত-পালিত হয়ে এবং রুশ সেনাবাহিনীতে রিক্রুট হয়ে তিনি তার নিজের পিতার কাছেই এক অপরিচিত ব্যক্তি হয়ে উঠলেন; তার জন্মভূমিতেই তিনি একজন বিদেশী। নিজের জাতির মধ্যে নিজের স্থান গ্রহণ করতে তিনি সম্পূর্ণ

অক্ষম হয়ে পড়েন। তদুপরি তার দেশের লোকজন এবং তার নিজের মধ্যে সহানুভূতি ছিলো সামান্যই। দেশবাসী তাকে দেখতে শুরু করলো সন্দেহের দৃষ্টিতে। এমন কি ঈমাম শামিল পর্যন্ত বিস্মিত হলেন যখন তিনি দেখলেন রুশ ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে এবং রাশিয়ার শক্তি সম্পর্কে অবহিত হয়ে তার পুত্র তাকে পরামর্শ দিচ্ছে আত্মসমর্পণের জন্য। কিছুদিন পর জামালউদ্দিনকে পাঠানো হলো কারাতায়, এ নামের সম্প্রদায়ের প্রধান পল্লীতে, যেখানে তার ছোটভাই কাজী মোহাম্মদ বাস করতেন। স্থানটি ছিলো প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত। কিন্তু নিসর্গের সৌন্দর্য এবং তার ভ্রাতার যত্ন-ভালোবাসা কিছুই তার পরিবেশ বদলের সঙ্গে তাকে মানিয়ে নিতে পারলো না। তিনি বিষন্ন হয়ে পড়লেন এবং ক্রমেই তার অধঃপতন শুরু হলো এবং তিন বছরের মধ্যেই তিনি মারা গেলেন।

ঈমামের রুটিন

ভেদেনে শামিলের বসতির চিহ্ন এখনো একটি স্রোতস্বীনীর দক্ষিণ তীরে দেখা যায়। তখনকার দিনে স্থানটির আয়তন ছিলো বেশ বৃহৎ। শামিলের নিজ কোয়ার্টারে ছিলো অনেকগুলো কক্ষ। ঈমাম মেহমানখানায় দর্শনার্থীদের গ্রহণ করতেন। মেহমানখানাটি এই উদ্দেশ্যেই নির্মিত হয়েছিলো। বহু মেহমানের মধ্যে যারা ঈমামের টেবিলে যোগ দেন, তাদের মধ্যে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য ছিলেন দানিয়েল এলিশনের সাবেক সুলতান। শামিলের পুত্র কাজী মোহাম্মদের সঙ্গে যার কন্যার বিয়ে হয়েছিলো। কিন্তু একমাত্র অতিথি যাকে স্বাগতম জানাতে কখনো ভুল করা হতো না, সেটি ছিলো সাদা এবং কালো রঙের মিশানো একটি সহজ বিড়াল। এটি একজন রুশ দলত্যাগী উপহার দিয়েছিলো। এই প্রাণীটির জন্য শামিলের স্নেহ ছিলো প্রচুর। যখন তিনি ভেদেনে ছিলেন তখন তার এই চুতষ্পদী বন্ধুটিকে রেখে কখনো খেতেন না। বিড়ালটির জন্য খাদ্য প্রস্তুত না করে নিজে খাবার খেতেন না। টেবিলটি ছিলো ছোট এবং নীচু। তার বিপরীত দিকে পুষীকে নিয়ে তার প্রভু মেঝেতে বসতেন। অবরোধকালে শামিল যখন নিকটবর্তী জঙ্গলে অবস্থান করছিলেন, তখন বিড়ালটি বিষন্ন হয়ে পড়ে এবং কাজী মোহাম্মদের সকল যত্ন সত্ত্বেও বিড়ালটি মারা যায়। তিনি যত্নের সঙ্গে বিড়ালটিকে কবর দেন, এমন কি তার কবরের উপর ফাতেহাও পাঠ করেন। কিন্তু ঈমাম শামিল যখন জানতে পারলেন, তার এই ক্ষুদ্র প্রাণীটি মারা গেছে, তখন তিনি খুবই ব্যথিত হন এবং চিৎকার করে বলেন, এখন থেকে আমার দুর্দশা শুরু হতে যাচ্ছে।

ভেদেনে গৃহ ভৃত্যরা ছিলো যুদ্ধ বন্দী। তাদের মধ্যে ছিলো মুসলমান এবং খৃষ্টান উভয়েই। মুসলমানেরা স্বেচ্ছা প্রবৃত্ত হয়ে তার খেদমত করে চলে, যদিও ঈমাম শামিল তাদেরকে আজাদী দিয়েছিলেন। ঈমাম শামিলের পুরনো বন্ধু

জামালউদ্দিনের পুত্র আব্দুর রহমান লিখেছেন, "তিনি ছিলেন অতি মহৎ, সাধারণ মানুষের প্রতি ভৃত্য, শিক্ষুক, এমন কি কয়েদীদের প্রতি দয়ার্দ্রচিত্ত। তিনি বিশ্বাস করতেন, দরিদ্রদের মোনাজাত আল্লাহ্‌র কাছে গৃহীত হয়। যে কোন অভিযানকালে তাদেরকে ডেকে একত্রিত করতেন, তাদেরকে টাকা-পয়সা ও সূতি কাপড় দিতেন এবং অনুরোধ করতেন তার অভিযানের সাফল্য সম্পর্কে প্রার্থনা করতে"।

শামিলের স্ত্রী ছিলেন মোট ছয়জন। একজন হচ্ছেন আব্দুল আজীজের কন্যা ফাতেমা, যিনি অন্টসকুলে ঈমামের সেবা করে তার আঘাতগুলো নিরাময় করেছিলেন। এই ফাতেমা ছিলেন তার তিনটি পুত্রের জননী। তার আর এক স্ত্রী ছিলেন দাজওয়াগারাদ, যার বাড়ী ছিলো ঘিমড়ী। তিনি আখুলগোতে তার শিশুপুত্রসহ রুশ বুলেটে প্রাণ হারান। তার আর এক স্ত্রীর নাম ছিলো জাইদাত। তিনি ছিলেন শামিলের শিক্ষক এবং বন্ধু কাজী জামালউদ্দিনের কন্যা। আরেকজন ছিলেন আমেনা; খুব সুন্দরী চেচেন কন্যা। আরেকজনের নাম শোয়ানেত, আর্মেনীয়ার সুন্দরী মহিলা, যিনি ১৮৪০ সালে আখওয়ার্দী মোহুমা কর্তৃক মজদুক আক্রমণের পর যুদ্ধবন্দী হিসাবে এসেছিলেন। শামিলের সকল স্ত্রীর মধ্যে তাকেই তিনি সবচাইতে ভালোবাসতেন। তার জন্য শোয়ানেত তাঁর পৈতৃক ধর্ম ত্যাগ করেন এবং অত্যন্ত বিশ্বস্ত এবং আগ্রহী মুসলিমে পরিণত হন। যখন তার ভাই এক বিত্তবান সওদাগর তার মুক্তিপণ হিসাবে ১০,০০০ রুবল দিতে রাজী হলেন, ঈমাম শামিল বললেন আমি ১০ লক্ষ রুবলও গ্রহণ করবো না এ বং শোয়ানেতও তাকে ত্যাগ করবে না এই পরিমাণ কিংবা আরো বেশী অর্থের বদলে।

যখনই সেই ভয়ঙ্কর দিনটি এসে পড়লো এবং বিজয়ী রুশ ফৌজ কর্তৃক ঈমাম শামিল গৌনিবে পরিবেষ্টিত হয়ে পড়লেন, তার পরিবারের ভবিষ্যত কিছুক্ষণের জন্য সন্দেহজনক হয়ে উঠলো। চূড়ান্ত বিপদ ঘটে যেতে পারে, কিন্তু শোয়ানেত কেবল তার জন্যই কম্পিত ছিলেন, যখন অনুমতি দেয়া হলো, ঈমামের সঙ্গে তিনিও বন্দীত্ব স্বীকার করলেন, কিছুমাত্র দ্বিধা না করেই, যদিও তিনি পেতে পারতেন তার স্বাধীনতা এবং স্বগৃহে তার স্বজনদের মাঝে ফিরে যেতে।

অধ্যায় ঃ নয়
শেষ মোকাবেলা

প্যারিস চুক্তি স্বাক্ষরের পর

ককেশাসে নতুন করে আক্রমণ শুরু করার যথেষ্ট সময় এবং সম্পদ ছিলো রাশিয়ার। বৈদেশিক আক্রমণের বিপদ থেকে তার সীমান্তগুলো মুক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে ঈমাম শামিলের গেরিলা ফৌজের প্রকট বিপদের প্রতি রাশিয়া মনোযোগ দেবার সুযোগ পেল। তখন প্রিন্স বেরিয়াটিনস্কী ককেশাসের ভাইসরয় এবং প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হয়েছেন এবং মিলোটিন ককেশাসে তার অবস্থান উন্নত করেছেন। সীমান্তগুলো ছিলো নিরাপদ, কারণ সারি সারি ক্যান্টনমেন্ট এবং দূর্গ নির্মিত হয়েছে। বিপুল পরিমাণে জঙ্গল এবং গাছ কেটে ফেলার পর অরণ্যের ভিতর দিয়ে রাস্তা পরিষ্কার হয়েছে এবং তখন পর্যন্ত বিভিন্ন অভিযানে তাদের মোকাবেলা করতে হয়েছে– এখন আর সেই রূপ মোকাবেলার সম্ভাবনা রইলো না। অবশ্য বড় কারণ ছিলো গোত্রগুলোর মধ্যে ঈমাম শামিলের ক্ষীয়মান প্রভাব।

মুরীদ আন্দোলনের অসুবিধাগুলো

যে কোন আন্দোলনের জন্য শান্ত গতিহীন সময় মনোবল নষ্ট করে দেয়। যতক্ষণ আন্দোলন তুঙ্গে থাকে ততক্ষণ সদস্যদের মনোবলও থাকে তুঙ্গে। প্রত্যেক সাফল্য বহন করে আনে নতুন সন্তুষ্টি এবং কোরবানীর আগ্রহ আরো বেড়ে যায়। পক্ষান্তরে আন্দোলনের সময় যদি নিষ্ক্রিয়তায় পর্যবসিত হয়, তাহলে মনোবল নিম্নগামী হয়, পারস্পরিক মতবিরোধ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এবং স্থিতি অবস্থা আরো অবনতি এনে দেয়। সময়টি বিপুল উত্তেজনার এবং সম্ভবত যে কোন আন্দোলনের নেতার জন্য সবচাইতে সংকটজনক। তিনি একটি উভয় সংকটের সম্মুখীন হন। প্রথমত আন্দোলনের উৎসাহ এমন গতিতে জাগ্রত রাখতে হবে যাতে তার সঙ্গীরা ক্লান্ত হয়ে না পড়ে। কিংবা উদ্যমহীন হয়ে না পড়ে। সৈয়দ আহমদ শহীদকে তার কালে একই রকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তাঁর মোজাহেদীন আন্দোলনও একই ধরনের উত্তাল সময়ের সম্মুখীন হয়েছিলো। তাঁর সঙ্গীরা বলতো তারা দীর্ঘপথ অতিক্রম করে পার্বত্য অঞ্চলে এসেছে যুদ্ধ করার জন্য, কিন্তু যুদ্ধের কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। যদি অনিয়মিত যুদ্ধ অব্যাহত থাকতো তাহলে এই লোকগুলি ব্যস্ত থাকতো এবং তাতে সমগ্র আন্দোলনেরই ফায়দা হতো। আন্দোলনের নেতা

সবকিছু বিচার করেন একটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে। তাঁর একটি সুদূরপ্রসারী প্রোগ্রাম রয়েছে। সে কারণে তাঁর অদূরদর্শী কমরেডরা তার সঙ্গে একমত হতে পারে না। তারা অধৈর্য্য হয়ে পড়ে। তখন পর্যন্ত আন্দোলনের নেতা তার সহচরদের অন্তরে ঈমানের প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখেন। আন্দোলন এগিয়ে চলে, কিন্তু কমরেডরা যে মুহূর্তে নেতৃত্বে বিশ্বাস হারাতে শুরু করে তখন সংশয় তাদের দৃঢ়তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, কঠোর কাজে তারা উৎসাহ পায় না। শত্রু কর্তৃক শত শত আক্রমণের চাইতেও এই পরিস্থিতি অনেক বেশী মন্দ। আন্দোলনের সমগ্র প্রাসাদটি কীট পোকায় ঝাঁঝরা করে দেয়। সে আর চাপ এবং কষ্ট সহ্য করতে পারে না।

যে কেউ ইসলামের ইতিহাসের প্রারম্ভিক অধ্যায়গুলোকে একইভাবে দেখতে পারে। যতদিন মহানবীর সঙ্গীরা যুদ্ধ চালিয়ে গেছেন ততদিনই ওদের উত্থান হয়েছে। কিন্তু বিজয় বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে আভ্যন্তরীণ মতবিরোধ শুরু হয় এবং মুসলমানরা একে অন্যের বিরুদ্ধে মারমুখী হয়ে ওঠে। কোন কোন লোকের কাছে ইতিহাসের এই ব্যাখ্যা বিস্ময়কর মনে হতে পারে। কিন্তু যে কোন ব্যক্তি ইসলামের প্রথম দিকের ইতিহাস বিশ্লেষণ করবেন তার কাছেই অনেক রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়ে পড়বে। অভিযান সাফল্যজনকভাবে সফল হবার পর যে কোন আন্দোলনের জন্য শান্তি এবং সমৃদ্ধি খুবই কঠিন। সংগ্রামের পর সংগ্রামই কেবল আন্দোলনকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে। যতদিন মুরীদ আন্দোলন যুদ্ধক্ষেত্রে একের পর এক বিজয় অর্জন করেছে ততদিনই এই আন্দোলন সমৃদ্ধি অর্জন করেছে। শত্রুরা পরাজয়ের পর পরাজয়ের সম্মুখীন হয় এবং এখন যদি উদ্যম শিথিল হয়ে পড়ে, তাতে কেবল রাশিয়ানদেরই ফায়দা হবে। গেরিলা ফৌজের জন্য এটি একটি মারাত্মক পরিস্থিতি করতে পারে।

রুশ মতলব

সুদীর্ঘ অর্ধ শতাব্দী ধরে রুশদের ব্যর্থতা তাদের একটি শিক্ষা দেয়। তারা তাদের পরাজয়ের কারণগুলো গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে। রুশ যুদ্ধ দানবের প্রধান প্রধান ব্যর্থতা এই কারণে ঘটে যে, ফৌজকে বিভিন্ন হুকুম ও প্রশাসনিক সমস্যার জন্য নির্ভর করতে হতো– এমন এক ধরনের প্রধানের উপর যাঁর অবস্থান কয়েকশ' মাইল দূরে এবং তাঁকেও প্রধান সেনাপতি অথবা রাজপ্রতিনিধির কাছ থেকে অর্ডার সংগ্রহ করতে হতো। যে কোন অভিযানের জন্য এ ধরনের পরিস্থিতি স্পষ্টতই বিপজ্জনক। উত্তরে বামপার্শ্বের কমান্ডার ছিলেন একজন জেনারেল, যিনি অবস্থান করছিলেন স্তাভরোপোলে।

নতুন প্রধান সেনাপতি বেরিয়াটিনস্কী সমগ্র ককেশাস ফৌজকে পাঁচটি কমান্ডে ভাগ করেন। এবং কমান্ডারকে পূর্ণ ক্ষমতা দেয়া হয় এবং তাঁকে প্রধান সেনাপতির কাছে

ব্যক্তিগতভাবে জবাবদিহি করতে হবে। এই কমান্ডারগুলোর তিনটি কমান্ড অবস্থিত ছিলো পূর্ব ককেশাসে। বামপার্শ্বের ফৌজ চেচেনিয়াকে সামনে রেখে দন্ডায়মান হয়। কাস্পিয়ান সমুদ্রের মুখোমুখি ফৌজ যার মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব রেঞ্জ ছিলো তাদেরকে একই সময়ে দাগিস্তানের একেবারে কেন্দ্রস্থলে পৌঁছুতে হবে। প্রথম দু'টি ফৌজকে পৌঁছুতে হবে দক্ষিণ-পূর্ব দিকের চেচনিয়াতে এবং আন্দি নদীর উপত্যকায় তৃতীয় বাহিনীর সঙ্গে এসে মিলিত হবে। বাকি দু'টি বাহিনীকে রিজার্ভ হিসাবে রাখা হয়। তারা প্রয়োজনীয় মুহূর্তে আহবান পাবার জন্য তৈরী ছিলো। ভদীকোমোফের অসাধারণ সাফল্যগুলো কর্মসূচীতে কতগুলো পরিবর্তন অনিবার্য করে তুলে। সাম্প্রতিক বিজয়সমূহ তাঁর কমান্ডের কর্তৃত্বকে আরো বর্ধিত করেছে।

পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৮৫৭ সালে ভদীকোমোফের বাম পার্শ্বের বাহিনী চেচনিয়ার ভাটি অঞ্চল দখল করে নেয়। অন্যদিকে দাগিস্তানী ফৌজ প্রিন্স ওর্বিলিয়ানীর কমান্ডের অধীনে স্নাটোর অঞ্চলগুলো এবং ওখ দখল করে নেয়। লেগ্‌গিয়ান লাইনের কমান্ডার ব্যারোন ওরস্কিভেদো দখল করেছিলেন এবং গোটা অঞ্চলটিতে রাস্তাঘাট নির্মাণ করেছিলেন। জঙ্গলগুলো পরিষ্কার করে তার মধ্য দিয়ে রাস্তা করা হয়। বর্তুনাই জয় করা হয় এবং রাশিয়ান দাগিস্তানী পদাতিক রেজিমেন্টের স্টাফ কোয়ার্টার সেখানে স্থানান্তরিত হয়। রাশিয়ার এই অভিযানকালে ৪০০ মুরীদ এবং দুইজন নায়েব শাহাদাত বরণ করেন। এই অভিযানে একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ছিলো রাশিয়ানদের রাইফেল ব্যবহার। মুরীদদের আরো আগেই সীমিত পর্যায়ে রাইফেল ছিলো। জঙ্গল কেটে ভিলীমের দিকে একটি রাস্তা নির্মিত হয় এবং ভোতানাইয়ে একটি দূর্গ তৈরী করা হয়, সেখানে চার ব্যাটালিয়ান সৈন্য বাস করছিলো।

বেরিয়াটিনস্কীর পদক্ষেপ

১৮৫৮ সালে বেরিয়াটিনস্কী ঈমামকে একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃঢ় অবস্থান থেকে বঞ্চিত করেন– কেননা উজানের উপত্যকা অঞ্চল প্রিন্সগণ দখল করে নিয়েছিলেন। এটি ছিলো একটি কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ স্থান। কেননা ঈমাম এখন সরাওয়াগণের পশ্চিমে সমগ্র ককেশাস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। এখন কেবল উত্তর দাগিস্তান, আন্দি এবং আতখেরিয়া রইলো ঈমামের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে। পক্ষান্তরে চেচনিয়ার কবিলাগুলোর জন্য বেরোবার কোন পথ ছিলো না। এরা আর্গুন ও আঙ্গুসীর পশ্চিমেএবং আর্গুন ও তেরেক নদীর মধ্যবর্তী স্থানে বসবাস করছিলো। এদের রাশিয়ানদের কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া উপায় ছিলো না। পূর্ব ককেশাস বেষ্টিত হবার ফলে ঈমাম একটি বিপজ্জনক অবস্থার সম্মুখীন হন।

অনেকবার হাতাহাতি যুদ্ধে ঈমাম পরাজিত হয়েছেন। আর নায়েবেরা শাহাদাত

বরণ করেছেন। অনেকগুলো জেলা নিঃশর্তে আত্মসমর্পণ করেছে রাশিয়ার কাছে। অবশ্য ঈমামের মতো একজন প্রতিভাবান নেতা, যাঁর রয়েছে বিশাল মুরীদ বাহিনী, তাঁর জন্য জঙ্গলে ঢাকা পার্বত্য অঞ্চলে যে কোন রাশিয়ান আক্রমণের মোকাবেলা করা কঠিন ছিলো না, যদি কেবল স্থানীয় জনগণ তাঁর পক্ষে থাকতো এবং ধন সম্পদ দিতে তাঁকে সাহায্য করতো। কেবল রসদের অভাবই ঈমামকে নাজেহাল করে তোলে।

রুশ অগ্রগতি

যে সব গোত্র রাশিয়ানদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলো ঈমাম তখনো তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলেছিলেন। তার ছিলো একটি কার্যকর গুপ্তচর পদ্ধতি। অবশ্য ভদীকোমোভ এমন একটি ছলনার আশ্রয় নেন যে, ঈমাম তার আক্রমণের লক্ষ্য স্থির করতে পারছিলেন না। যতক্ষণ না আক্রমণ শুরু হলো– তিনি রুশ অগ্রগতি সম্পর্কে জানতেন এবং তার ফৌজের প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন। কিন্তু তিনি হিসাব করলেন, এমন কি তার ফৌজকে বললেন আর্গুনের ২০ মাইল পূর্বে একটি স্থান আখতুরী হচ্ছে আক্রমণের লক্ষ্য। কেবলমাত্র কমান্ডার এবং অল্প কয়েকজন স্টাফ অফিসার এই দুইয়ের পার্থক্য সম্পর্কে জানতেন। এটি এমনই একটি সুরক্ষিত গোপনীয়তা ছিলো যে, বারোগাল থেকে নির্গত দু'টি কলাম, যারা যাত্রা শুরু করেছিলো ১৫ই জানুয়ারী রাতে, তারা জানতো না তারা কোথায় যাচ্ছে। সারারাত চলার পর বরফ ঢাকা পর্বত শিখর পেরিয়ে তারা একটি টাওয়ারের নিকটবর্তী আর্গুনের বামতীরে পৌঁছলো। এখানে তারা একটি সংকীর্ণ গিরিপথে প্রবেশ করতে যাচ্ছিলো যখন তারা দেখতে পেলো ভদীকোমোফ কর্তৃক ব্যক্তিগতভাবে পরিচালিত তৃতীয় একটি কলাম রয়েছে নদীর বামতীরে, শেষোক্ত কলামটিকে চেচনিয়ার বীর মোজাহেদদের কঠোর প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয় সংকীর্ণ গিরিপথটির কাছে। মুজাহেদীন তাদের অবস্থানে অবিচল থাকে, যতক্ষণ না তারা বুঝতে পারলো নদীর অপরদিক থেকে আরো দু'টি কলাম এগিয়ে আসছে এবং তারা যদি ত্বরিৎ ব্যবস্থা গ্রহণ না করে, তারা আসন্ন বিপদের সম্মুখীন হবে। তাই নিজেদেরকে পরিবেষ্টিত হতে না দিয়ে তারা সরে পড়লো।

এই গিরিপথটি দখলের পর স্থানীয় যে সব বাসিন্দা এ সময় পর্যন্ত যারা রাশিয়াকে প্রত্যাখ্যান করেছে, এখন তারা এই সব ফৌজের আগমনকে অভিনন্দন জানালো। মনে করা হলো গিরিপথটি অনতিক্রম্য। যে মুহূর্তেই এটি রাশিয়ানদের হাতে চলে গেল, স্থানীয় অধিবাসীরা তাদের মনোবল হারিয়ে ফেললো। এই ঘটনার একজন বিবরণদাতা লিখেছেন– স্থানীয় লোকেরা রাশিয়ানদের কাছে তাদের উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রি করতে শুরু করে এবং অল্প সময়ের মধ্যে গিরিপথটি একটি বাজার হয়ে ওঠে। কথিত আছে যে, যখন রুশগণ কর্তৃক এই গিরিপথ অধিকৃত হলো তখন

ঈমামের দু'চোখ অশ্রুতে টলমল করে উঠলো। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, সময় ফুরিয়ে এসেছে। এ সময়ও মুজাহিদীনের একটি বিরাট দল ছিলো তাঁর সঙ্গে। কেন তিনি একটি প্রতি আক্রমণের জন্য চেষ্টা করলেন না, তখনো কয়েক হাজার দাগিস্তানী ছিলো তাঁর সঙ্গে এবং রাশিয়ানরা পুরো এলাকাটি দখল করার আগে ঈমামা রাশিয়ানদের পরাজিত করতে পারতেন। এই সংকট মুহূর্তে ঈমাম কিছুই করলেন না। অন্যদিকে রাশিয়ানরা ব্যাপক আকারে বৃক্ষ নিধন শুরু করেছে। প্রত্যেকদিন শত শত গাছ কেটে ভূপাতিত করা হচ্ছে। রাশিয়ান কুঠারের শব্দ রুশ গোলন্দাজ বাহিনীর বজ্র ঘোষণার চাইতেও অধিকতর মনোবল বিনষ্টকারী!

১৪০০ গজ প্রশস্ত একটি স্থান দার্গুনরোখের ডান তীর পর্যন্ত পরিষ্কার করা হয়। শিখরটি ছিলো ৬০০০ ফুট উঁচু এবং ১০ মাইল ব্যবধানে। সেখান থেকে রাশিয়ানরা ভেদেনের সমতল অঞ্চলে ঈমাম শামিলের বসতবাড়ী দেখতে পেলো, অন্যান্য অঞ্চলেও জঙ্গল সাফ করা হলো, ব্রীজ নির্মাণ করা হলো, এমন কি আর্গুনোস্কীতে একটি দুর্গ পর্যন্ত নির্মিত হলো। ঈমাম শামিলের দুর্বল গোলন্দাজ বাহিনী এই দুর্গটিকে ভেদ করতে পারলো না এপ্রিল পর্যন্ত। রুশ কমান্ডার এই দুর্গে তার ফৌজের গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ রেখে প্রত্যাবর্তন করলেন ভোদেশিংক এবং গ্রোজনীর দিকে। শীতকালীন অভিযান সফল হয়েছে, এখন ফৌজরা ফিরে যাচ্ছে বিশ্রাম গ্রহণের জন্য।

১৮৫৮ সালের মধ্যে প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়। পুনরায় রুশ ফৌজ আর্গোন গিরিপথে প্রবেশ করে। কিন্তু ইতিমধ্যে অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। পরিস্থিতি ছিলো নাটকীয়ভাবে ভিন্ন। বিশাল বিশাল বীচ্‌বৃক্ষ কেটে ফেলা হয়েছে। যেসব খাল পায়ে হেঁটে পার হতে হতো, সে সব খাল এবং বিভিন্ন নদীর উপর পুল তৈরী হলো, সর্বত্রই সড়ক নির্মিত হয়েছে এবং তাদেরকে বাধা দেবার মতো কোন মোজাহেদিন ছিলো না। ৬ মাস আগে এই রাস্তা পার হতে গিয়ে রুশ ফৌজকে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। এতে করে রুশ কমান্ডারের মনোবল অনেক বেড়ে যায়। সামনেই যে রাস্তা ছিলো তা ছিলো ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক। নদীটি হাজার হাজার ফিট গভীর গিরিসংকটের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিলো এবং বহু স্থানে তা পার হওয়া সম্ভব ছিলো না। ইতিমধ্যে গুপ্তচরেরা ভদীকিমোফকে জানায় যে, মুজাহেদিন রাস্তার উপর প্রতিবন্ধক তৈরি করছে এবং ট্রেঞ্চ খোদাই করছে, রাশিয়ান অগ্রগতি প্রতিহত করার জন্য। রুশ জেনারেল তাদের একজন ছিলেন না যারা কেবল সম্মুখ যুদ্ধে বিশ্বাস করতেন। তিনি তার ফৌজকে নদীর ডানদিকে চলে যাবার জন্য হুকুম দিলেন এবং এরপর হঠাৎ তিনি তার বামপার্শ্বের ফৌজকে নদীর বামতীরে পৌঁছুনোর জন্য নির্দেশ দিলেন এবং সামান্য প্রতিরোধের মুখে মিস্‌কিনদাগের

উচ্চভূমি দখল করলেন। তিনি এখানে অবতরণ করে বারান্দা গ্রামে পৌঁছেন। এখানে গ্রামবাসীরা তাঁর কাছে আত্মগোপন করে। তিনি আবার নদী অতিক্রম করছেন এবং দানাখ গ্রামে একটি একটি অস্থায়ী দুর্গ নির্মাণ করলেন এবং একটি নতুন রাস্তার সাহায্যে তাকে যুক্ত করলেন আর্গুনোস্কো দুর্গের সাথে। ইতিমধ্যেই শাতোনগামী রাস্তাটির অর্ধাংশ রাশিয়ানদের কবলে এসে যায়। এরপর সামান্য কিছু অতিরিক্ত উদ্যমের মাধ্যমে তারা রাস্তার বাকি অংশটুকু দখল করতে সক্ষম হয়। জুলাইয়ের শেষের দিকে তারা এই অংশও অতিক্রম করে। বারান্দাকে রক্ষা করার জন্য যারা চেষ্টা করেছিলো তাদেরকে বিতাড়িত করে উচ্চ অঞ্চলগুলোর উপর হামলা চালায়। যাকে তারা উপত্যকার অন্যান্য স্থানসহ স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিলো। এই অঞ্চলে আর কোন প্রতিনিধি ছিলো না। অগ্রগামী রুশ কলাম খানতিনদী অতিক্রম করে শান্টোতে প্রবেশ করে। রুশীরা এখন জোনাখ এবং আর্গুনোস্কোর মধ্যে যাতায়াত ব্যবস্থা কায়েম করার জন্য মনোযোগী হয়। স্থানীয় গ্রাম্য লোকেরা ইতিমধ্যে রুশ বিজয়ে আভিভূত হয়ে পড়েছিলো। এখন তারা সব আশা হারিয়ে ফেলে। তারা বুঝতে পারলো রাশিয়ানরা বিজয়ী হতে চলেছে। তাই তারা রাশিয়ানদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে।

স্থানীয় জনগণের আনুগত্যহীনতা

সাফল্যের মতো কিছুই সফল নয়। এক স্থানে তাদের বিজয়, অন্য স্থানেও তাদের বিজয়ের কারণ হয়ে উঠে– কুফার লোকদের মতো– স্থানীয় পল্লীবাসীগণ তাদের তরবারী নিয়ে রাশিয়ার পক্ষে যোগ দেয়। বহু স্থানে তারা প্রকাশ্যে ঈমামের প্রতি বিশ্বাসঘাতকরা করে এবং রাজার প্রতি কল্পনাতীত আনুগত্য প্রকাশ করে। তারা ঈমামের সঙ্গীগণকে হত্যা করে। এদের দ্বারা ইটম দুর্গে নায়েবের প্রতিনিধি কয়েদ হন এবং তার ভ্রাতা এবং অন্যান্য মুরীদদেরকে হত্যা করা হয়। রাশিয়ানরা তখন একটি বার্তা পাঠায় দুর্গ ও তার অস্ত্রপাতি দখল করার জন্য। আর্গুনের উজানের অঞ্চলগুলো তখনও ছিলো ঈমামের সঙ্গে এবং দাগিস্তানের দিকে একটি নতুন রাস্তা তৈরী হয়।

ওরবিলিয়ানীর স্থলে ওয়ারাঙ্গলকে নিয়োগ দান করা হয়– তিনি ইত্যবসরে গামবিট এবং ওখের বাকি অঞ্চলগুলো দখল করে দাগিস্তানের দিকে অগ্রসর হন। অন্যদিকে রিভীস্কী অগ্রসর হচ্ছিলেন দীভজের দিকে। বিগত বছরের মতো পুনরায় তিনি সমস্ত অঞ্চলটিকে রাশিয়ার মহত্তম ঐতিহ্য অনুসরণ করে তরবারীর সাহায্যে এবং আগুন ধরিয়ে ধ্বংস করেছেন। কীতরী গ্রামটি আক্রমণের সময় রিভিস্কী নিজেও নিহত হন। কিন্তু তিনি তার উপর অর্পিত কর্তব্য সমাধান করেছিলেন, প্রিন্স মিলেহফ অগ্রসর হয়ে কোন বাধারই সম্মুখীন হলেন না পার্বত্য পথ ও অরণ্য ছাড়া।

নাজারান অবরোধ

আর্গুনের দ্বিতীয় অভিযানের সময় ঈমাম শামিল বিপুল আকারে একটি আক্রমণ চালান। নাজারানের লোকেরা যারা আগে ছিলো রুশদের মিত্র, তারা ঈমামের সাহায্য প্রার্থনা করে এবং স্বাধীনতার পতাকা উচ্চে তুলে ধরে। ঈমাম খান্‌তি অতিক্রম করে রাশিয়ান গোলন্দাজ বাহিনীর ঘন ঘন গোলা বর্ষণ সত্ত্বেও সমতল অঞ্চলে পৌঁছে যান। আখোকিতে তার বড় রকমের ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং তনি যুদ্ধ থেকে সরে পড়েন। যেহেতু দীর্ঘ এবং সংকটজনক একটি রাস্তা দিয়ে কেবল নাজারান পৌঁছানো যেত, সে জন্য ঈমাম শামিল এখন পশ্চৎ অপসরণ করলেন। ইত্যবসরে রুশ ফৌজ নাজারানে পৌঁছে যায়, তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দমন করার জন্য। নাজারান অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। রাশিয়ান অশ্বারোহী বাহিনীর ছয়টি কামান গ্রামটিকে ধ্বংস করে দেয়। চারজন নেতাকে ফাঁসি দেয়া হয় এবং ৪০টি বালক-বালিকাকে জিম্মি হিসাবে নিয়ে যাওয়া হয় ককেশাসে। সেখানে তাদের নির্মমভাবে নির্যাতন করা হয়, শিশুরা যখন ফিরো এলো, তখন তারা বড় হয়েছে এবং রুশদের বিরুদ্ধে শত্রুতায় তাদের অন্তর বিষিয়ে গেছে।

ঈমাম শামিল রুশ মনোযোগ ভিন্ন দিকে ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা করেন, যাতে করে তারা পশ্চাৎ অপসরণ করতে পারে। এখন তিনি চার হাজার অশ্বারোহী মুরীদসহ নাজারান আক্রমণ করলেন। এখানেও তাকে পশ্চাৎ অপসরণ করতে হয় বিপুল ক্ষয়ক্ষতির পর। এতে ৩৭০ জন মুরীদ শাহাদাৎ বরণ করেন, যেখানে অন্যপক্ষে কেবল ১৬ জন রাশিয়ান মারা যায় এবং ২৩ জন জন্য আহত হয়।

রুশ বিজয়ের কারণসমূহ

যুদ্ধ শেষে প্রিন্স বেরিয়াটিনস্কী ভদীকীমোফ সম্পর্কে পরবর্তী বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। এতে রুশ যুদ্ধপ্রণালীর নতুন স্কীমের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তিনি বলেন ঃ "ভদীকীমোফ তাঁর সুবিধাজনক অবস্থান থেকে কখনো শত্রুকে আক্রমণ করতে দিতেন না, কেবলমাত্র সুপরিকল্পিত রণকৌশলের অভাবেই ঈমামের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানগুলোর পতন ঘটে। আখুলগো, সলতিস, ঘারগেবিল এবং তোখ অঞ্চলে হাজার হাজার রুশ সৈন্য নিহত হয়, অথচ ভিদেনে, যেখানে শামিল তার সমগ্র শক্তি কেন্দ্রভূত করেছিলেন সেখানে আমাদের মাত্র ২৬ জন মারা যায় বা নিহত হয়। তিনটি বিষয় আমাদেরকে যুদ্ধ বিষয়ে সাহায্য করে। প্রথমতঃ আমরা প্রণালীবদ্ধ যুদ্ধ করি; দ্বিতীয়তঃ আমাদের জেনারেল কৌশলগত কোন ভুল করেননি; এবং তৃতীয়তঃ সাম্প্রতিকতম অস্ত্র দিয়ে ককেশীয় ফৌজকে অস্ত্রসজ্জিত করা। এই তিনটি বিষয় আমাদের বিজয়ের পথ তৈরী করে দেয়। পার্বত্যবাসীদেরকে যুদ্ধের মাধ্যমে জয় করা সম্ভব ছিলো না। নিরবিচ্ছিন্ন যুদ্ধ তাদের

নৈতিক মনোবলকে এমন এক স্তরে উন্নীত করে যে, তাদের অল্প কয়েকজন সৈন্য আমাদের বড় বড় কলামের অগ্রগতিকে প্রতিহত করতে সমর্থ ছিলো এবং তারা যে অল্প কয়েকটি বুলেট বর্ষন করে, তাতে আমাদের বর্ষিত শত শত বুলেটে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়, তার চেয়ে বহুগুণে বেশি ক্ষতি হয়। যুদ্ধের অর্থই হচ্ছে উভয় পক্ষ সমান শক্তির অধিকারী। কিন্তু যখনই তারা যুদ্ধ করার সুযোগ পেত না, তারা তাদের মনোবল হারিয়ে ফেলে। যতদিন যুদ্ধের সম্ভাবনা ছিলো, ততদিন তারা আবার নিজেদেরকে প্রস্তুত করতো পরাজয় সত্ত্বেও। কিন্তু যখনই তারা তাদের যুদ্ধ না করে ছত্রভঙ্গ হয়ে যেতো, তাদের নৈতিক মনোবল ধ্বংস হয়ে পড়তো এবং তারা আত্মসমর্পণ করতো। শামিলের ক্ষীয়মান শক্তির প্রধান কারণগুলোর একটি ছিলো তারা একস্থানে সমবেত হতো এবং যুদ্ধ না করেই ছত্রভঙ্গ হয়ে যেত। এখন একটি নিয়মিত যুদ্ধ চলছে। নিয়মিত যুদ্ধের শেষ ১০ বছরে জারের সৈন্যরা কোথাও বড় রকমের ক্ষতির সম্মুখীন হয়নি। কাকেশীয় যুদ্ধের সময়ে ঐ বছরগুলোতে সামান্যই রক্তপাত হয়েছে।

ঈমামের সঙ্গীদের দলত্যাগ

সকল ফ্রন্টে রাশিয়ানদের বিজয় জনতার মনোবল ভেঙ্গে দেয়। তাদের আর যুদ্ধ করার সাহস কিংবা দৃঢ়তা ছিলো না। একই লোকগুলো যারা শেষ পর্যন্ত রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে এবং কোন মূল্যেই পরাজয়কে স্বীকার করে নেয়নি এখন তারা তাদের বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধ না করেই আত্মসমর্পণ করছে। এসবই খুব বিস্ময়কর মনে হয়। কিন্তু এটি পরাজয়ের মনস্তত্ব। রাশিয়ানদের ঘন ঘন বিজয় এই গোত্রগুলোর নৈতিক মনোবলকে নষ্ট করে দেয়, ওরা এখন আর নির্ভীক বীর্যবান যোদ্ধা ছিলো না। এমন কি এর আগেও তারা রাশিয়ানদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। একটি মরিয়া অবস্থার মধ্যে যখন তাদের বিপুল সংখ্যক নিহত হয়েছে তখনো তারা ব্যাপক আকারে প্রতিরোধ ছাড়া আত্মসমর্পণ করেনি।

তেছেরিয়া, টাবোরলুই এবং উখিস নামক উচ্চতর এলাকাগুলো ঈমামের সঙ্গে তাদের আনুগত্য ছিন্ন করে ফেলে এবং রাশিয়ান প্রভুত্ব স্বীকার করে নেয়। দক্ষিণে উনসাখের অধিবাসীরা এবং উত্তর ঢালে অবস্থিত অন্যান্য জেলাগুলোও আত্মসমর্পণ করেছে। ঈমামের ঘনিষ্ঠতম কমরেডরাও তাঁকে পরিত্যাগ করেছে, দানিয়েল সুলতান আবার নতুন করে রাশিয়ানদের সাথে হাত মিলিয়েছেন,এমন কি তিলিতলের [illegible] সুলতান কীবীত মোহুমাও ভাবলেন যে, আর প্রতিরোধ অর্থহীন। তিনি যে কেবল নিজেই রুশ প্রভুত্ব স্বীকার করে নিলেন তা নয়, তিনি সোদেখারের কাজীকে গ্রেফতার করে রাশিয়ানদের হাতে তুলে দেন। কাজী আসলান ছিলেন মুরীদ আন্দোলনের সবচাইতে অগ্নিগর্ভ কর্মীদের একজন।

১৪ই জুলাই বেরিয়াটিনস্কী তদীমকীমোফের সঙ্গে মিলিত হলেন ভেদেনে, তাঁর তাঁবুতে। তখনই চূড়ান্ত আক্রমণ শুরু হলো। এই আগামী কল্যাণের সঙ্গে ছিলো ৪০,০০০ সেপাই এবং ৪৮টি কামান। ঈমাম এই অগ্নি পরীক্ষার সময় অলস বসে থাকলেন না। তিনি অবিচলিত রইলেন এবং তাঁর মনোবল ছিলো তুঙ্গে। তিনি কখনো নিরাশ হতেন না। রুশদের নিরন্তর সাফল্য ঈমামের ঘনিষ্ঠতম কমরেডদের দলত্যাগ, সমগ্র প্রদেশে আত্মসমর্পণ, রুশ ফৌজের বিপুল সংখ্যক এবং অসাধারণ যোগ্যতা সম্পন্ন একজন জেনারেল কর্তৃক তাঁরা পরিচালিত হচ্ছে– এই উপলব্ধিও তাঁকে নিরাশ করতে পারেনি। তিনি তার সামর্থ মতো সেই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও যে অপরাজেয় শক্তির তিনি অধিকারী ছিলেন সব সময় তার সাহায্যে লড়ে যান।

ঈমাম এক সময় চেচনিয়ার পর্বতগুলো ত্যাগ করে দাগিস্তানে পৌঁছুলেন। তিনি মুহূর্তকালের জন্যও বিশ্রাম নিলেন না এবং প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থাগুলোকে শক্তিশালী করার জন্য সমগ্র দিন এবং রাত্রি কাজ করে চলেন। একতালিতে অবস্থানকালে তিনি সেই স্থানটিকে দুর্গের দ্বারা সুরক্ষিত করলেন এবং আন্দির উভয়দিকের অঞ্চলগুলোর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আরো দৃঢ় করে নদীপথ ওয়ারাঙ্গল এবং তদীকিমোফের কল্যাণগুলোর জন্য আরও অনতিক্রম্য করে তুললেন, কিন্তু এসব প্রস্তুতি ছিলো নিষ্ফল। কেননা তদীকিমোফ এইসব অস্তিত্বের কথা জানতে পেরে আন্দির পাহাড়ে আরোহণ করেন এবং বোলাতাখের বিপরীত দিকে অবস্থিত পাহাড়ে গিয়ে পৌঁছেন। যখন আন্দি পল্লীর বাসিন্দারা পাহাড়ের চূড়ায় রুশ বেয়োনেটের ঝলক দেখতে পেলো, তখণ তারা মনোবল হারিয়ে ফেলে। তাবার লোকের লোকেরা বেরিয়াটিনস্কীর কাছে একটি ডেলিগেশন পাঠায় এই অনুরোধ জানিয়ে যে, তাদেরকে রাশিয়ার প্রহরায় নিজে গ্রামে ফিরে যাবার অনুমতি দেয়া হোক। ঈমাম শামিলের নায়েব দবীরের জ্বালাময়ী বক্তৃতা সত্ত্বেও তারা সকলেই আত্মসমর্পণ করে। পরদিন আন্দির লোকেরাও ঈমামকে পরিত্যাগ করে। ঈমামের পুত্র কাজী মোহাম্মদ যখন দেখতে পেলেন তিনি শত্রু কর্তৃক পরিবেষ্টিত হতে চলেছেন তখন তিনি ১১টি কামানসহ আতকালি দুর্গ পরিত্যাগ করেন। ওয়ারাঙ্গলের অধীনস্থ ফৌজেরা কসোতো এবং আভারিয়ার এলাকাগুলো কালবিলম্ব না করে দখল করে নেয় এবং সমগ্র জেলাটি রুশ শাসন স্বীকার করে নেয়।

গোটা এলাকার কোথাও রাশিয়ানরা প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়নি। ওলাও দুর্গটি নিজে নিজেই আত্মসমর্পণ করে। ঘারগেবিলের নিকটে অবস্থিত এই দুর্গটি দীর্ঘকাল ধরে রুশ শক্তিকে প্রত্যাখ্যান করেছে। এমন কি অনতিক্রম্য ওটখ রুশদের করায়ত্ব হয়ে যায়। ২৮শে জুলাই কীবীত মোহম্মা গ্রোতি পৌঁছেন এবং রুশ সম্মুখ যোদ্ধাদের নিয়ে জেনারেল র‍্যাকোসের নেতৃত্বে তার নিজ গ্রাম তিলিতলো

পৌঁছেলেন। এই পরিস্থিতি লক্ষ্য করে আভারের উঁচু এলাকাগুলো আত্মসমর্পণ করে। ৭ই আগস্ট দানিয়েল সুলতান, যিনি আরীব এবং অন্যান্য দুর্গসহ রাশিয়ানদের সমর্থন করেছিলেন, তিনিও বেরিয়াটিনস্কীর তাঁবুতে উপস্থিত হন, তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য।

ঈমাম এসবই লক্ষ্য করলেন। এমন কি তার ঘনিষ্ঠতম কমরেডগণ রুশদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। শরৎকালে কুয়াশার আঘাতে ঝরে পড়ার মতো ঈমামের আন্দোলনও ভেঙ্গে পড়ে এবং তাঁর সাহসী যোদ্ধারা বসন্তকালে পাহাড়ের চূড়ার তুষারের মতো গায়েব হয়ে যায়। তিনি তার পরিবারকে নিয়ে গুণীব পৌঁছলেন। সেই রাস্তার একটি গ্রামে রমণীরা কুখ্যাত ছিলো। আখওয়াখ (এই পল্লীটি কুখ্যাত ছিলো সমগ্র অঞ্চলটিতে অতিথিপরায়ণ না হবার ব্যাপারে) মালবাহী গাড়ী থেকে কিছু লাগেজ চুরি করে নিয়ে যায় এবং রোঙ্গার নিকটে কীবীত মোহুমার সঙ্গীগণ এর বাকি অংশ লুণ্ঠন করে। যে ব্যক্তিটি ঈমামের নিকটতম ও প্রিয়তম ছিলো সেও এই দিন ঈমামের সম্মানকে রেহাই দিলো না। এই করুণ অবস্থায় যখন পুরো দেশটি ঈমামের বিরুদ্ধে চলে যায়, এমন কি তাঁর প্রিয়তম বন্ধুরা তাঁর প্রবলতম শত্রু হয়ে দাঁড়ায়, তখনো গুণীবের লোকেরা ঈমামের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে যায়। দরিদ্র কৃষকেরা ঈমামকে অভ্যর্থনা জানায়। তারা ভাল করে জানতো, ঈমামকে রক্ষা করার চেষ্টা হবে তাদের জন্য মারাত্মক। তারা জানতো রুশীরা তাদের গ্রামকে পদদলিত করবে। তবু গ্রামবাসীরা স্থির করলো তাদের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তারা ঈমামের পক্ষে থাকবে।

ঈমামের সঙ্গে মাত্র ৪০০ কমরেড ছিলো। এই নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতিতে ঈমাম গ্রামটিতে তার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করার জন্য সিদ্ধান্ত নিলেন। এই লোকগুলো পরিখা খনন করে দৃঢ় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলে এবং তাদের সর্বশেষ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে দৃঢ়তর করার জন্য দিবারাত্রি কাজ করে চলে। ঈমাম একজন আরব কবির নিম্নলিখিত শ্লোকগুলো আবৃত্তি করতেন যা তার বর্তমান অবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিলো– "আমি নিজেকে একটি শিকলের গ্রন্থির মতো আমার নিজের ভাইদের সঙ্গে যুক্ত মনে করি। আমি মনে করতাম এরা তীরের মতো তীক্ষ্ণ। তারা ছিলো তীক্ষ্ণ তীর কিন্তু আমার অন্তরকে তারা আহত করেছে"।

৯ই আগস্ট ওয়ারাঙ্গল পৌঁছলেন এবং অবরোধ শুরু হলো। পরদিন প্রিন্স বেরিয়াটিনস্কী, ভদীকীমোফ তার স্টাফ অফিসারগণসহ রুশ দেহরক্ষীরা এবং স্থানীয় মিলিশিয়াগণ যে এলাকা আত্মসমর্পণ করেছে, সেগুলো পরিদর্শন করার জন্য এগিয়ে গেলেন। আগালী, এসগ্রিতাল, তিলকাত এবং খেত্তা ছিলো বিভিন্ন স্থান, যার মধ্য দিয়ে ওরা অগ্রসর হয়েছে এবং এখন তারা পৌঁছুলো অন্টসকুলে এবং ঘিমড়ীতে। এখানে প্রিন্স তাঁর প্রহরীদের রেখে ও তাঁর স্টাফ অফিসারগণসহ

কসোভো ও আভারিয়ার অধিবাসীদের সঙ্গে নিয়ে অগ্রসর হলেন। দু'দিন পরে তিলিতলে কীবীত মোহুমার সঙ্গে দেখা করলেন এবং তাঁর সঙ্গে খানা খেলেন। ঐদিন রাতেই তিনি তাঁবু গাড়লেন, তিমোভান পর্বতের পাদদেশে। ১৮ই আগস্ট তিনি ওরাঙ্গলের সঙ্গে মিলিত হলেন গুলীবের চূড়ায়, রাজা এবং তাখ পরিদর্শনের পর। এই যাত্রার আগাগোড়াই তিনি সর্বত্র অভিনন্দিত হন।

শেষ আশ্রয়স্থল

একটি মানচিত্রের সাহায্যে ঈমামের শেষ আশ্রয়স্থরটি চিহ্নিত করা যায়। প্রত্যেকদিকে শিলা স্তূপীকৃত করা হযেছে ৩০০০-৫০০০ ফুট উঁচু পর্যন্ত, যেখানে পশ্চিম দিকটা ছিলো প্রাচীর সদৃশ শিলাস্তূপ– যার উচ্চতা ছিলো ৭৭১৮ ফুট। এই প্রাচীরগুলোর মধ্যে জমিন হচ্ছে একটি পেয়ালার তলদেশের মতো সমতল। প্রত্যেকদিকেই ছিলো দুর্গসদৃশ পর্বতমালা এবং পানিও পাওয়া যায় প্রচুর। দূরপাল্লার কামান না থাকায় ঐদিনগুলোতে জায়গাটা ছিলো দূর্গের মতো নিরাপদ। যথেষ্ট সংখ্যক আত্মরক্ষাকারী থাকলে এই স্থানটিকে দুর্ভেদ্য করে তোলা কঠিন ছিলো না। কিন্তু ঈমামের সঙ্গে ছিলো মাত্র ৪০০ কমরেড। ১০টি অবস্থান থেকে স্থানটিকে আক্রমণ করা হয় বিভিন্ন কোম্পানী কর্তৃক এবং অনেকস্থলে এক ব্যাটালিয়ন সৈন্য নিয়ে হামলা করা হয়। এটা কল্পনা করা খুব কঠিন নয়, যে পরিস্থিতিতে ৪০০ কমরেডকে ১১ মাইল পরিধির স্থান রক্ষার জন্য চেষ্টা করতে হয়। যদি ৪০০ সৈন্য থাকতো, এ অঞ্চলটি দখল করা রাশিয়ানদের পক্ষে কঠিন হতো। কিন্তু মাত্র ৪০০ সৈন্য নিয়ে এর প্রতিরক্ষা করার প্রয়াস সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠে না। ১০টির মধ্যে কমপক্ষে ১টি কলাম আক্রমণ করতো এবং সেই আক্রমণ প্রতিহত করলেই অন্যান্য অবস্থানগুলো থেকে যেত অরক্ষিত।

ঈমাম শামিল কারানদীর বিপরীত দিকে পাহাড়ের উপর তার অবস্থান গ্রহণ করলেন তার নিজের তাঁবুতে। তিনি আত্মরক্ষার প্রস্তুতি পরিদর্শন করছিলেন। তিনি নিশ্চয় বেরিয়াটিনস্কীর তাঁবুতে সহর্ষ চিৎকার শুনতে পাচ্ছিলেন। ৩০ বছর আগে এই এলাকাতেই তিনি ইসলামের গৌরবের জন্য সংগ্রাম শুরু করেছিলেন। তিনি রুশ শক্তি চূর্ণ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন এই এলাকাতেই। তিনি রুশ শক্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ করার জন্য কাজ করে যাচ্ছিলেন এবং এই অভিপ্রেত সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তবে তার বিরুদ্ধে এখন তিনি দেখতে পেলেন শাহাদাত বরণের মুহূর্ত দ্রুত এগিয়ে আসছে। তবু তিনি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই করবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি তার সমস্ত জীবনকে জাহান্নামীর বিরুদ্ধে পবিত্র সংগ্রামে নিবেদন করেছিলেন। ঈমাম তার জীবনে বিপর্যয় এবং বিজয় উভয়েরই সম্মুখীন হয়েছেন। তিনি রুশদেরকে পরাজিত করেন এবং রুশীরাও তাকে পরাজিত করে।

প্রথম ঈমামের আমলে তিনি দেহ-মন-আত্মা দিয়ে সংগ্রাম করেছেন এবং প্রথম ঈমাম যখন শাহাদাৎ বরণ করেন যুদ্ধক্ষেত্রে তখন অলৌকিকভাবে তিনি বেঁচে যান। তিনি হামজাদের প্রতিও বশ্যতা বজায় রেখে চলেছেন। তিনি রাশিয়ানদের পরাজিত করেন এবং রাশিয়ানরাও তাকে পরাজিত করে। তিনি ঈমাম হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করেন নাই। তিনি ১৮৩৪ সাল পর্যন্ত সমগ্র দাগিস্তানের উপর তার শাসন অক্ষুণ্ন রাখেন। এখন জীবনের দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রাম এবং সফল প্রয়াসের পর তিনি ভয়ানক অসুবিধার সম্মুখীন হন এবং পরাজয় সুনিশ্চিত হয়ে ওঠে। তার বিবেক এতেই সন্তুষ্ট ছিলো যে, তিনি তার কর্তব্যে কখনো ব্যর্থ হননি। আসলে তার আন্দোলনের পরাজয়ের জন্য তাঁর কোন অপকর্ম দায়ী ছিলো না। অবস্থার এমনি মোড় ফিরে যায় যে, সেগুলো আর তার নিয়ন্ত্রণে ছিলো না।

ঈমাম ব্যর্থ হয়েছিলেন, কিন্তু এই ব্যর্থতার জন্য হাজারো সাফল্যকে উৎসর্গ করা যেতে পারে। কেউ যদি হিসাব করে দেখে কি সব ভয়ঙ্কর অসুবিধার মুখে তিনি তার আন্দোলনকে পরিচালিত করেছেন, তাহলে মনে হবে তিনি যে এতোদিন বেঁচেছিলেন, এটাই একটা অলৌকিক ব্যাপার। কেবল যে বাহ্যিক অবস্থাগুলো তার জন্য বাধাস্বরূপ ছিলো, তা নয়, আভ্যন্তরীণ অবস্থাও তাঁর অনুকূলে ছিলো না। তাকে যে কেবল জারের ফৌজের বিরুদ্ধে এবং তার সাম্রাজ্যের বিশাল সম্পদের বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছে তা নয়, তাকে আভ্যন্তরীণ মতবিরোধ এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিরুদ্ধেও লড়তে হয়েছে। আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি মোটেই তাঁর অনুকূলে ছিলো না। পরিস্থিতি এতোই প্রতিকূলে ছিলো যে, তিনি একবারে সম্পূর্ণভাবে তার মোকাবিলা করতে পারছিলেন না। অন্য সময় তাকে পরাভূত করতেও পারছিলেন না। ককেশাস অঞ্চল যদি এক গোত্রভূক্ত জাতিদের বাসস্থান হতো, তাদের জাত ও ভাষা যদি এক হতো, তার জন্য অবস্থা হতো অনেক সহজ। এই লোকগুলোর সকলেই ইসলামে বিশ্বাসী ছিলো। তারা একে অপরের রক্তপাত করার জন্য প্রস্তুত ছিলো। দেশে শান্তি আনয়ন করা সহজ ছিলো না। সেখানে ইসলামে বিশ্বাসী লোকগুলোর প্রত্যেকেই একে অন্যের রক্তপাত করার জন্য উদগ্রীব ছিলো। এদেশে শান্তি আনয়ন করা সহজ ছিলো না, যা বহু শতাব্দি ধরে রক্তাক্ত সংগ্রাম ও খুনাখুনি ছাড়া আর কিছুই দেখেনি। গোত্রগুলো যদি ঐক্যবদ্ধ হতো, তাহলে ঈমাম সক্ষম হতেন। রাশিয়ার চাইতে প্রবলতর সামাজিক শক্তির বিরুদ্ধে তিনি সফলতার সাথে লড়তে পারতেন। গোত্রগুলো কেবল সাময়িকভাবে ঐক্যবদ্ধ ছিলো, যখন রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ তুঙ্গে ছিলো। যুদ্ধে শৈথিল্য আসার পরেই ভগ্নদশা শুরু হয়ে যায়। ঈমাম গোত্রগুলোর মধ্যে আইন ও শৃঙ্খলা জারি করেছিলেন, তার প্রতি মুরীদ

আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে রাশিয়ানরা তার সদ্ব্যবহার করে। ঈমাম পরবর্তীকালে একবার বলেছিলেন যে, সাফল্য অর্জনের জন্য তাকে বহু বছর সংগ্রাম করতে হয়েছে, রাশিয়ানরা তার জন্যে সময়ক্ষেপণ না করেই তা অর্জন করেছে।

ঈমাম জানতেন শরীয়াহ্ কার্যকর না করলে গোত্রগুলিকে কখনো ঐক্যবদ্ধ করা যাবে না। এই লক্ষ্য পূরণের জন্য তাকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে হবে। তিনি প্রচার শুরু করেন, বুঝিয়ে-সুঝিয়ে লোকজনকে স্বমতে আনয়ন করেন এবং বহুবার তাকে বলপ্রয়োগ করে তাদেরকে জয় করতে চেয়েছেন। তিনি বহু সাফল্য অর্জণ করেন, তবু এমন কি সবচাইতে শৃঙ্খলা ও শান্তির সময়েও তাদের ঐক্য ভেঙ্গে পড়ে। যেসব লোক দীর্ঘকাল আদত বা লোকাচার মেনেচলে এসেছে, তাদের মনে হলো শরিয়াহ্র আইন মেনে চলা একটি দুরূহ ব্যাপার। যে সব লোক দীর্ঘকাল ধরে কঠোরতম এবং শান্তির সময়ও আদতকে মেনে চলেছে, তারা বহু সাফল্য অর্জন করে, তা সত্ত্বেও কঠোরতম নিয়ম-শৃঙ্খলা এবং শান্তির কালেরও ভাঙ্গন শুরু হয়ে যায়। নায়েবরা যে আইন কার্যকরী করেন, জনগণ তা সমর্থন করেনি। আরেকটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই ছিলো যে, যুদ্ধ এতো দীর্ঘস্থায়ী হয়ে পড়ে যে, তা স্থানীয় জনগণের মধ্যে বিরূপ ক্রিয়া করে। বলতে গেলে এমন কোন একটি পরিবারও ছিলো না, যাতে একজন স্বামী, একজন পিতা কিংবা একজন ভ্রাতা শাহাদাত বরণ করেননি। এমন কি গোটা পরিবার ধ্বংস হয়ে গেছে এবং সমগ্র গ্রামকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়েছে। বহু বছর জমি চাষ করা হয়নি এবং বাগ-বাগিচাগুলোর উপর কেউ কোন যত্ন নেয়নি। এসব ঘটেছিলো দাগিস্তানে, যেখানে ঈমাম বাস করতেন এবং যেখানে ঈমামের প্রত্যেকটি কথাই ছিলো আইন। চেচনিয়ার দুর্ভাগ্য ছিলো আরো বেশি। তাদেরকে তাদের বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনদের হাতেই হিজরত করতে হয়েছিলো। পক্ষান্তরে এই লোকগুলোর জন্য রাশিয়া বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয়ও করেছিলো। রাশিয়ার প্রয়োজন ছিলো, পথ প্রদর্শক স্কাউট, মিলিশিয়া, ঘোড় সওয়ার বাহিনী, গুপ্তচর ও বিশ্বাসঘাতকদের ফৌজ– তার প্রভুত্ব কায়েম করার জন্য সে এইসব দরিদ্র মানুষের জন্য ব্যয় করছিলো প্রচুর অর্থ। এইসব ব্যাপার যদি কেউ বিবেচনা করেন, তিনি ঈমামের ব্যর্থতায় বিস্মিত হবেন না। বরং তিনি বিস্মিত হবেন যে, সুদীর্ঘকাল মুরীদ আন্দোলনকে তিনি সক্রিয় রাখতে পেরেছিলেন! ত্রিশ বছরব্যাপী নিরবিচ্ছিন্ন যুদ্ধ মানুষের মনোবল নষ্ট করে দেয়। এ ছিলো এমন একটি বোঝা যা বহন করার সামর্থ তাদের ছিলো না। এই পরিস্থিতি বিবেচনায় রাখলে কারো কাছে এই জনগোষ্ঠীর মনোভঙ্গী এতো অপরিচিত মনে হবে না।

রুশ আক্রমণ

এটা ছিলো ১৮৫৯ সালের ২৫শে আগস্টের একটি তুষারাবৃত সকাল। চতুর্দিকেই ছিলো তুষার। রুশীরা তাদের আক্রমণ শুরু করে। স্থানীয় পথ প্রদর্শকগণ পরিচালনা করছিলো এই আক্রমণ এবং ব্যাটালিয়নগুলো শুরু করে এক সর্বাত্মক যুদ্ধ। ঈমাম গ্রামের দিকে পশ্চাৎ অপসরণ করেন। মুরীদগণ আত্মরক্ষার জন্য বীরোচিতভাবে সংগ্রাম করে। একটি জায়গাতেই শেষ পর্যন্ত ১০০০ মুরীদ শাহাদাৎ বরণ করেন। আর একটি সুরক্ষিত স্থানে অল্প কয়েকজন মুরীদ এক ব্যাটালিয়ন রুশ সৈন্যের আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য চেষ্টা করেন এবং তারাও শহীদ হন। এমন কি তাদের নারীগণও মরিয়া হয়ে লড়াই করেন এবং শাহাদাৎ বরণ করেন। বেরিয়াটিনস্কী প্রতীক্ষায় ছিলেন ঈমামকে জীবিত অবস্থায় বন্দী করতে। গ্রামটিকে আক্রমণ করার আগে তিনি ঈমামের সঙ্গে শান্তির জন্য আলাপ-আলোচনা করতে চাইলেন। ঈমাম একা হলে তিনি মৃত্যুবরণ করবার জন্যই সিদ্ধান্ত নিতেন। কিন্তু তার সঙ্গে ছিলেন তার ছেলে-মেয়ে ও স্ত্রীগণ এবং তার সেইসব বিশ্বাসভাজন গ্রাম্য লোকজন যারা তাকে আশ্রয় দিয়েছিলো যখন সমগ্র দাগিস্তান এবং চেচেনিয়া তার শত্রুতে পরিণত হয়েছে এবং তার রক্তের জন্য তারা ছিলো পাগল। এই লোকগুলোই রাতদিন কাজ করেছিলো গ্রামের প্রতিরক্ষা গড়ে তোলার জন্য। তারা শেষ পর্যন্ত লড়াই করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলো এবং ঈমামকে তাদের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত রক্ষা করার চেষ্টা করেছিলো। সর্বাত্মক আক্রমণ হলে এই গ্রামের একটি লোকও বেঁচে থাকতো না। ঈমামের ছিলো এইসব বৃদ্ধ পুরুষ, রমণী, শিশুগণ ও তাঁর বিশ্বস্ত কমরেডদের জন্য আন্তরিক বিবেচনা। তিনি তার দুইজন কমরেডকে পাঠালেন শান্তি সম্পর্কে আলোচনা করতে।

রাশিয়ানরা দাবী করলো বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করতে হবে। কিন্তু ঈমাম তাতে রাজী হলেন না। শেষে কর্নেল লেজারোফ, যিনি ঈমামকে ব্যক্তিগতভাবে জানতেন, সেই গ্রামে উপস্থিত হলেন এবং প্রতিশ্রুতি দিলেন এই গ্রামের প্রত্যেকটি চাষীকে জীবনের নিরাপত্তা দেয়া হবে। এখন ঈমাম তার ঘোড়ায় চড়লেন এবং সামান্য কয়েক পদক্ষেপ যেতে না যেতেই রুশ সৈন্যগণ তাদের চিরকালের শত্রুকে তাদের মধ্যে দেখে হাতে তালি দিতে শুরু করে। তখন ঈমাম থামলেন এবং ঘোড়ার লাগাম কষে ধরে চাইলেন গ্রামে ফিরে যেতে। তখন কর্নেল লেজারোফ মুহূর্তের মধ্যে একটি সিদ্ধান্ত নিলেন। পরিস্থিতি বিবেচনা করে লেজারোফ ঈমামের দিকে ছুটে গেলেন এবং বললেন রুশ সৈন্যগণ তাকে সম্বংর্ধনা জানাবার জন্য হাতে তালি দিচ্ছে। কর্নেল তাঁকে সঙ্গে নিয়ে অগ্রসর হন। তখন তাঁর সঙ্গে হাজার হাজার মুজাহেদীনের অবশিষ্ট মাত্র ৫০ জন মুরীদ ছিলেন। ঈমাম যখন বেরিয়াটিনস্কীর নিকট পৌঁছলেন, তাঁর মুখন্ডল ছিলো কঠোর এবং তাঁর দৃষ্টি ছিলো একটি ঈগলের

দৃষ্টি। বেরিয়াটিনস্কী তাঁকে তাঁর কমরেডগণ এবং তার পরিবারবর্গের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিলেন। বেরিয়াটিনস্কী পরদিন তাকে তেমিরখান শোরাতে পাঠালেন, যেখান থেকে তিনি তাঁর পরিবার-পরিজনকে নিয়ে রওয়ানা করলেন মস্কো।

এই সর্বশেষ যুদ্ধে ১৮০ জন সৈন্য নিহত এবং আহত হয়। অন্যপক্ষে ৪০০ মুরীদের মধ্যে মাত্র ৫০ জন এই যুদ্ধের পর বেঁচে থাকেন। ঈমাম ক্লুগে-তে অবস্থান করলেন ১৮৬৯ সাল পর্যন্ত। এখান থেকে তাঁর অনুরোধে তাঁকে খিবাতে পাঠানো হয়। সেখান থেকে তাঁকে হজ্জ করার জন্য মক্কা যেতে অনুমতি দেয়া হয়। সেখানে তিনি ১৮৭১ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী নবীর শহর মদিনাতুন্নবীতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এভাবে অবসান ঘটলো একটি উজ্জ্বল এবং নাটকীয় জীবনের, যা উৎসর্গীকৃত ছিলো যুদ্ধের ময়দানে, যাঁর বীরত্বের কাহিনীগুলো আজও গীত হয়ে থাকে দাগিস্তানের গ্রাম-গ্রামান্তরে।

পরিশিষ্ট

খোচ্‌বারের মৃত্যুর সঙ্গীত

(জেনারেল উসলারের রুশ বিবরণী থেকে[১])

একজন বার্তাবাহক এলো আভারখান থেকে জিদাতলের খোচ্‌বারকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য।[২]

"হে আমার জননী– আমি কি খুনজাক যাব?" "আমার প্রিয় পুত্র, তুমি যেওনা, তুমি যেও না, যে রক্ত অর্পণ করা হয়, তার দুঃখ– তার শোক হয় দীর্ঘস্থায়ী। খানগণ, তারা যেন ধ্বংস হয়, মানুষের জন্য তারা ফাঁদ পাতে।"

"তা হবে না, আমি যাবোই! অন্যথায় খোনজাকের অনিষ্টকর জীবেরা ভাববে যে, আমি তাদের ভয় করি। ঘৃণীত নোটসাল মনে করবে আমি তাদের ভয় করি। ঘৃণীত নোটসাল আমাকে বলবে কাপুরুষ।" "তাই খোচ্‌বার রওনা করলো খুনজাক। তার সামনে একটি ষাড় নিয়ে খানের জন্য প্রীতি উপহার হিসাবে, আর সঙ্গে নিলো একটি আংটি খানের স্ত্রীকে দেবার জন্যে।"

"স্বাগতম আভারিয়ার নুটসাল। জিদাতলের খোচ্‌বার, শেষ পর্যন্ত তুমি এসেছো, হে নেকড়ে, যে রানকে ছিন্ন-ভিন্ন করো– তুমি এখন এখানে, হে আভারদের শত্রু ঃ যখন নুটসাল এবং খোচ্‌বার কথা বলছিলো, চিৎকারকারী চিৎকার করে বললো; আর একটি ঠেলাগাড়ী আছে, সে আভার কৈসু এর বামতীরের নিকট থেকে পাইনকাঠ নিয়ে আসুক। বোগোচ পর্বতমালার পদতলে যার রয়েছে ১৩০০০ ফুটের উপরে তিনটি শিখর, হাজী মুল্লার পিতামহ ছিলেন এখানকার জেদাতলের একজন অধিবাসী।

আমি ছাড়া আর কে তোমার জানালা দিয়ে প্রবেশ করেছিলো এবং তোমার প্রিয়তমা স্ত্রীর ছয়টি সিল্কের পাজামা বহন করে নিয়ে গিয়েছিলো? আমি ছাড়া আর কে তোমার সুন্দরী বোনদের শুভ্র বাহু থেকে রুপার ব্রেসলেটগুলো নিয়েছিলো। আমি ছাড়া আর কে তোমার পোষা, তোমার পার্বত্য ছাগলকে[৩] জবাই করেছিলো। ওখানে উজানে বাস করতো ভেড়াওয়ালারা, কারা ভেড়াগুলোকে তাড়িয়ে নিয়েছিলো, এখনো শূন্য কেন ওখানে? নিচেই রয়েছে আস্তাবলে! কারা ঘোড়াগুলোকে তাড়িয়ে নিচ্ছিলো? তারা এখন কোথায় হে বিধবাগণ, লক্ষ্য কর গৃহের মাথায় এবং জানালায় কে তাদের স্বামীদেরকে হত্যা করেছিলো এবং তাদেরকে এই পর্যায়ে কে এনেছে? আমার চারদিকে দেখতে পাচ্ছি এতিম, কারা

তাদের মালিককে হত্যা করেছে এবং তাদেরকে এতিম বানিয়েছে? এদের সংখ্যা কেউ গণনা করতে পারে না ॥ যারা মৃত্যুবরণ করেছে আমার হাতে মহাদানে! আমি তোমাদের গোত্রের তিন কুড়ির কম লোককে হত্যা করিনি ॥ হে নুটসাল এইসব ঘটনা খ্যাতির জন্য দায়ী! কিন্তু প্রতারণা করে একটা মানুষকে কয়েদ করা এবং হত্যা করা, তার সম্পর্কে আমরা কি বলবো? পারে যখন খোচ্‌বার গাইছিলো এবং খেলা করছিলো তখন খালের দু'টি কচি ছেলে এসে বসলো তার পদতলে। তাদেরকে হঠাৎ করে ছিনিয়ে নিয়ে, এক একজনকে এক হাতে, বীর পুরুষটি লাফিয়ে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে ॥

হে নুটসালের ছানারা, তোমরা কুঁকড়ে যাচ্ছ কেন, আমি কি তোমাদের সঙ্গে পুড়ছি না? হে শুয়ার ছানারা, তোমরা চিৎকার করছো কেন? আমিও কি আলোকে ভালোবাসি নাই? হায় আমার বীরত্বপূর্ণ ঘোড়া যা প্রায়ই পলায়মান আভার ঘোড়ার খুরকে পদদলিত করেছে। ওহো, আমার তীক্ষ্ণ বর্শা, যা নুটসালের তাঁবেদারগণের বর্মকে প্রায়ই করেছে ছিন্নভিন্ন ॥

কেঁদো না আমার জননী, তোমার পুত্র অযথা মৃত্যুকরণ করছে না! আমার বোনেরা যেন দুঃখ না করে, আমি গৌরবের সঙ্গে মারা যাচ্ছি ॥ ভায়োলিনে ছড় টানা হচ্ছে এবং ঢোলে আঘাত করা হচ্ছে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত ॥ জেদাতলের খোচ্‌বার দখল করা হয়েছে ॥ অপরাহ্ন অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে ক্রন্দন এবং মাতম চললো, এবং অনলশিখার মধ্যে হারিয়ে গেলো আভরকুমারেরা!

এই ঘটনার তারিখ ঐতিহাসিক হলেও এতে সন্দেহ নেই যে, এর প্রধান প্রধান ঘটনাগুলো অজ্ঞাতই রয়ে গেছে ॥ খুনজাকের নিকটে পাইনকাঠের উল্লেখ এর প্রাচীনত্বের একটি প্রমাণ, কারণ নিকটে কোন গাছই জন্মায় না ॥ মানুষের স্মরণে ইহা দেখা যায়নি ॥ নিকটবর্তী অঞ্চলগুলোর তরুলতা শূন্যতা ফাঁকটির পরে যাতে টোপেট নেমে পড়েছে সৌল-এর ঠিক নীচে– এ অঞ্চলের সবচাইতে দৃষ্টি আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ॥ গোটা সঙ্গীতটি খুবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ– খোচ্‌বারের অহংকার এবং সাহস, তার প্রিয় ঘোড়াগুলোকে যখন হত্যা করা হয় তার তখনকার অবিচলিত দৃঢ়তা ॥ যখন তার বিশ্বস্ত বর্শাটি ভেঙ্গে গেল, তার মৃত্যুসঙ্গীতের করুণ রাগিনী, যার মধ্যে ছিলো সত্যের উপর ভিত্তি করে অপবাদের মালা, সত্যের উপর ভিত্তি করে হলেও উদ্দেশ্যমূলকভাবে আতিশয্যপূর্ণ ॥ এসবই পার্বত্যবাসীদের মধ্যে চরম প্রশংসা কীর্তন জাগ্রত করার জন্য এবং চূড়ান্ত বিপর্যয়ের পরও উৎসাহের সীমা থাকে না ॥ অনুমান করা কঠিন নয় যে, হাজী মুরাদ একই অবস্থায় এর একই ব্যবহার করেছিলেন ॥ যেমনটি করেছিলে– খোচ্‌বার ॥

এই সময় হাজী মুরাদ এবং তার সঙ্গীরা কি গেয়েছিলেন তা জানা যায় না ॥ কিন্তু হামজাদের মৃত্যুসঙ্গীত আমাদেরকে দেয় একই দৃশ্যের এক উজ্জ্বল চিত্র এবং

চেচেন কবিতার একটি আদর্শ নমুনা হিসাবে যা আকর্ষণীয়– "সাদা বাজপাখি উড়ে এসে তার শিকারকে ধরে ফেলে এবং সে এভাবে তাকে চঙ্গলে ধরে ফেলে, ধরে সরাসরি রক্তে তার ঠোঁট রঞ্জিত করে– চিত্রিত চিতাবাঘ যা দ্রুতগতি সম্পন্ন দৌড়ে তার শিকারকে ধরে ফেলে এবং তার শক্তিশালী থাবা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার উপরে।"

"বীর হামজাদ ঘিকের দ্রুতগামী অশ্বারোহীসহ পার হয়ে, তেরেক নদীর বামপার্শ্বে চলে যান, নদীটিকে তাঁর পিছনে রেখে। বীর হামজাদ তেরেক পার হয়ে নুগাই স্তেপ অঞ্চলে প্রবেশ করেছেন। তিনি একপাল সাদা ঘোড়া দখল করে আবার তেরেক পার হয়ে যান, পালটিকে পিছনে পিছনে তাড়িয়ে নিলেন চারকেস পাহাড়ের উপর; দিনের বেলায় ছিলো বিপদের আশঙ্কা এবং অশ্বারোহীরা ছিলো ক্লান্ত। তারা শিরওয়ানে থামলো এবং জঙ্গলে তাদের যুদ্ধলব্ধ মালমাত্তাগুলো লুকিয়ে রাখলো। যখন সে তার যুদ্ধলব্ধ সম্পদ গোপন করলো, জঙ্গলে তার সঙ্গীগণ হামজাদসহ উঁচু কুলগাছে আরোহন করলেন এবং তার দুরবীনের সাহায্যে দেখতে পেলেন রাশিয়ানরা আসছে। হামজাদ তাকিয়ে দেখলেন যেখানে তিনি পায়ে হেঁটে নদী পার হয়েছিলেন, সেখানে জায়গাটিকে অন্ধকার করে তুলেছে বহুসংখ্যক দল, বায়ুতাড়িত কালো মেঘের মতো দ্রুতগতিশীল দলটি ঘোড়া হাঁকিয়ে ছুটে আসছে!"

"বিশাল সৈন্যবাহিনী দেখে তিনি কুরগান থেকে নীচে নামলেন এবং তার সঙ্গীদের বললেন– তারা আমাদেরকে অনুসরণ করছে বাতাস যেমন মেঘপুঞ্জকে অনুসরণ করে, তেমনি দ্রুতভাবে। তোমরা ভয় পেও না, আমরা দুর্দান্ত চিতা বাঘের মতো লড়াই করবো। আবার তিনি বললেন, আমরা আমাদের ঘোড়া এবং গরু-ভেড়াগুলোকে হত্যা করবো এবং আমাদের চারদিকে তাদেরকে রাখবো বেড়ার মতো। তাহলেই আমরা নিজেদেরকে রক্ষা করতে সক্ষম হবো।"

তার সঙ্গীগণ আনন্দের সঙ্গে তাদের সম্মতি জানাল। তারা তাদের ঘোড়াগুলোকে জবাই করে এবং গরু-ছাগল ও মেঘগুলোকে আস্তাবলে নিয়ে যায় এবং ওদেরকে চারপার্শ্বে দাঁড় করিয়ে দৃঢ় প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করে। আবার হামজাদ তার সঙ্গীদেরকে বলেন, ঘিখের নায়েব আখ্‌রওয়ার্দি মোহুমা একইভাবে দাঁড়িয়ে আছেন তার লোকজনদেরকে নিয়ে পাহাড়ের মাথায় এবং যখন তিনি রাশিয়ানদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধের ধ্বনি শুনবেন, তখন আকাশের পাখির মতো তিনি ছুটে আসবেন। কিন্তু একথা তিনি বলেছিলেন তার সঙ্গীদের মধ্যে মনোবল সৃষ্টি করার জন্য।

হামজাদ তার অশ্বারোহী সৈন্যদের নিয়ে বসলেন রক্তাক্ত ব্রেকওয়ার্কের পেছনে এবং একজনকে আদেশ দিলেন শত্রুর উপর নজর রাখতে। প্রহরীটি আগ্রহের সঙ্গে দৃষ্টি প্রখর করে রাখে এবং তোমরা দেখতে পাও– জনতার সামনে একজন অশ্বারোহী ছুটে এলেন, 'প্রিন্স কাঘেরমান এবং বেষ্টনীর ভিতরে এসে চিৎকার করে জিজ্ঞেস

করলেন, তোমরা কোন প্রিন্সের লোক? ওয়ার্ডার একটা শব্দও উচ্চারণ করলো না। বরং হামজাদের নিকট আবার প্রশ্নটির পুনরাবৃত্তি করেন। "প্রিন্স কাগেরমান জানতে চান– আমরা কোন প্রিন্সের লোক।"

"সাহসী হামজাদ পিছন দিক থেকে বেরিয়ে আসেন এবং অশ্বারোহীর নিকটবর্তী হন।"

"আপনি আমাদের কাছ থেকে কি চান?" "জানতে চাই তোমরা কোন প্রিন্সের লোক?" হামজাদ হেসে উঠলেন, আমরা কোন প্রিন্সকে জানি না, জানতে চাই না, আমরা ঘিখের অশ্বারোহী, মালে গণিমতের জন্য এসেছি, আপনি কি হামজাদ নন?"– জিজ্ঞাসা করলো কাগেরমান। "হ্যাঁ, আমি হামজাদ"। "হামজাদ, দুঃখের কথা যে তুমি এখানে দেরী করে এসেছো। একটি রাশিয়ান ফৌজ তোমার উপরে এসে পড়েছে এবং তোমাদেরকে ঘেরাও করে ফেলেছে। যদি না তুমি বিদেশগামী পাখির মতো হয়ে উঠো এবং আকাশে ডানা মেল, তোমার পরিত্রাণ নেই। রুশ কমান্ডার আমাকে পাঠিয়েছেন, আপনি যদি যুদ্ধ না করে আত্মসমর্পণ করেন, তাহলে আপনাকে তিনি অব্যাহতি দিবেন। আপনার কোন ক্ষতি করবেন না।"

"এতে হামজাদ উত্তর করলেন– হে কাগেরমান, আমি অভাবের কারণে এখানে আসিনি, আমি এসেছি গাজাওয়াতের মৃত্যু দেখতে! আমি যদি তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করি, ঘিখের সকল মানুষ আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করবে, বিদ্রুপ করবে।"

"ক্লান্ত এবং ক্ষুধার্ত নেকড়ে যেমন জঙ্গলে ফিরে যেতে চায়, কিন্তু উপবাসী সাহসী ঘোড়া টাটকা পরিচ্ছন্ন ময়দানে ফিরে যেতে চায়, ঠিক তেমনি আমার সঙ্গীদের পিপাসা মৃত্যু পর্যন্ত সংগ্রাম। কাগেরমান, আমি তোমাদের ভয় করি না। তোমার সমস্ত ফৌজকে নিয়ে আমি হাসি, কারণ আমার বিশ্বাস আমার বিশ্বাস আল্লাতে, যিনি সর্বশক্তিমান।"

আবার হামজাদ কাগেরমানকে বললেন, "এতোদিন আমরা সব সময়ই যুদ্ধলব্ধ সম্পদ এবং স্বর্ণ খুঁজেছি, কিন্তু আজকের দিনের মতো সুন্দর কালো পাউডারের মতো কিছুই এতো মূল্যবান নয়"। আবার তিনি বললেন, "আজ স্বর্ণ আমার সম্পদ নয়। আজকে বিশ্বস্ত ক্রিমিয়ান চকমকি পাথর হচ্ছে খাঁটি সোনা"।

কাগেরমান রুশ কমান্ডারের হাতে ফিরে গেলেন এবং হামজাদ আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করেন। হামজাদ তার বেষ্টনীর মধ্যে ফিরে গেলেন এবং তার সঙ্গীদের নিয়ে বসলেন। "ফৌজ এসে গুলি বর্ষণ করতে শুরু করলো, প্রত্যুত্তরে হামজাদ এবং তার অশ্বারোহীরাও গুলি বর্ষণ করতে শুরু করলো।"

"তাদের গুলি বর্ষণের ধোঁয়া ছিলো গাঢ়। হামজাদ বললেন অভিশপ্ত এই দিন, আজ এতো গরম যে, আমাদের তরবারী ছাড়া আর কোন কিছুরই ছায়া নেই।" আবার তিনি বললেন, "গাঢ় এই ধুম্র এবং দিবসটি কত অন্ধকার, আমাদের একমাত্র আলো হচ্ছে আমাদের কামান বন্দুকের ঝলকানি।"

"হামজাদ তার সঙ্গীদেরকে আবার বললেন, বেহেস্তের হুরিগণ, বেহেস্তে তাদের জানালা দিয়ে নীচে আমাদের দিকে তাকাচ্ছে এবং বিস্ময় প্রকাশ করছে ও বিস্মিত হচ্ছে। তারা নিজেদের মধ্যে তর্কে-বিতর্কে লিপ্ত হয়, তারা কে কার হবে এবং যে হুরি আমাদের মধ্যে যে অধিকতর সাহসী তার ভাগ্যে পড়বে সে তার বন্ধুদের কাছে এ নিয়ে গল্প করবে এবং যে জন অপেক্ষাকৃত কম সাহসীজনের ভাগ্যে পড়বে সে লজ্জায় অধোবদন হবে। সে ঝরোকা তার প্রতি বন্ধ করে দিবে এবং যদি কেউ আজকের দিনে কাপুরুষ হয়, তার মুখমন্ডল যেন কালো হয়ে যায়, যখন সে আল্লাহর সম্মুখে দাঁড়ায়।"

"হামজাদ মনে মনে বললেন, যখন মৃত্যু তার জন্য আসন্ন তিনি আর বেশী কিছু আশা করতে পারছেন না। উচ্চ আকাশে তিনি দেখতে পেলেন পাখিরা উড়ে যাচ্ছে এবং তিনি তাদের ডেকে বললেন, হে আকাশের পাখিরা, তোমরা আমাদের সর্বশেষ অভিনন্দন জানাও, আমাদের চূড়ান্ত অবস্থান অবহিত কর, ঘিখের নায়েব আখওয়ারদি মোহম্মাকে আমাদের অভিনন্দন জানাও, সুন্দরী তরুণীদের এবং তাদেরকে বল যে, আমাদের গর্বিত বক্ষ, রুশ বুলেট ঠেকানোর জন্য ব্যবহৃত হলো। তাদেরকে আরো জানাও, আমাদের অভিপ্রায় হচ্ছে মৃত্যুর পর ঘিখের কবরস্থানে সমাধিস্থ হওয়া– যেখানে আমাদের ভগিনীরা আমাদের কবরে মাতম করবে এবং গোটা জাতি দুঃখ প্রকাশ করবে। কিন্তু আল্লাহ্ এই ধরনের রহমত করেন না আমাদের উপরে, আমাদের বোনদের কান্না শোনা যাবে না। শোনা যাবে কেবল ক্ষুধার্ত নেকড়ের চিৎকার। কোন ফৌজ আমাদের চারিদিকে জমায়েত হবে না– কেবল একপাল দাড়কাকের ভিড় ছাড়া।"

"তাদেরকে আরো বলো চারকেস পাহাড়ে, জাহান্নামীদের ময়দানে আমরা আমাদের উন্মুক্ত তরবারী হাতে নিয়ে মৃত পড়ে আছি। দাড়কাকেরা আমাদের চোখ তুলে নিচ্ছে এবং নেকড়েরা আমাদের শরীর ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করছে।

রুশ অনুবাদক বলেন যে, তিনি একাধিকবার, এমন কি সবচাইতে কঠিন হৃদয় চেচেনকেও অশ্রুতে আচ্ছন্ন দেখেছেন যখন সে হামজাদের গান শুনতো, যখন তিনি ছিলেন একজন আব্রেক (বহিষ্কৃত), তিরেকের একটি গ্রাম থেকে। তিনি মুরিদিজমের প্রথম দিকের বছরগুলোতে পালিয়ে গিয়েছিলেন পার্বত্য অঞ্চলে এবং একটি ক্ষুদ্র আক্রমণগামী দলের নেতা হিসাবে তিনি কোসাক লাইনে নিরবিচ্ছিন্নভাবে সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন, সেখানে তার প্রচন্ড সাহস এবং অঞ্চলের

বিশদ জ্ঞানের জন্য তার প্রত্যেকটি হানাই প্রায় সবসময়ই হয়েছে সফল।"

আর একটি চেচেন মৃত্যুসঙ্গীতের অনুবাদ করা যায় এভাবে– "আমার কবরের উপর মাটি শুকিয়ে যাবে, আমার মা, ওগো আমার জননী এবং তুমি ভুলে যাবে আমাকে এবং আমার উপর ঘাস আন্দোলিত হবে। পিতা, এসো আমার পিতা, তুমি আমার জন্য করুণা প্রকাশ করো না। যখন অশ্রুপাত বন্ধ হয়ে যাবে এবং তোমার কালো চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে উঠবে। বোন ওগো, আমার বোন, সুখ আর কখনো তোমাকে শোকাভিভূত করবে না। কিন্তু হে আমার জেষ্ঠ্য ভ্রাতা, তুমি কখনো ভুলবে না, প্রতিহিংসাবশতঃ তুমি আমাকে অস্বীকার করেছো এবং তুমি আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, তুমিও ভুলে যাবে চিরদিনের জন্য, যতক্ষণ না তুমি শায়িত হও আমার পাশে।"

তুমি দ্রুতগতিতে আস, হে মৃত্যুবহনকারী গোলক, যা আমি ঘূর্ণির আকারে ছুঁড়ে মেরেছিলাম, কারণ তুমি ছিলে সান্ত্বনা এবং হে কৃষ্ণ ধরিত্রী, যাকে আমার যুদ্ধের ঘোড়া পদতলে দলিত করেছে, তুমি আমার কবরকে ঢেকে দিয়ো। হে মৃত্যু, তুমি শীতল তবু আমি ছিলাম তোমার প্রভু এবং মালিক। আমার শরীর দ্রুত নিমজ্জিত হচ্ছে মাটিতে এবং আমার আত্মা আকাশে উড্ডীয়মান হচ্ছে আরো দ্রুত গতিতে।

রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণকারী হিসাবে ভ্রাতার প্রতি পরম বিশ্বাস প্রশংসার যোগ্য।

১. *লেখক জেনারেল উসলার, জর্মিয়ান রাস্তার পূর্বদিকে কিসত অঞ্চলের গভীরে একটি দুর্গে এই গানের আবৃত্তি শুনেছিলেন।*

২. *জেদাতল বা জীদ ছিলো খানেতের দক্ষিণের একটি আতর সদৃশ্যায় এবং তার অনুকূল পরিস্থিতির জন্য একটি প্রশস্ত উপত্যকার চারদিকে পর্বত দ্বারা ছিলো বেষ্টিত, যার জলবায়ু এবং উর্বর ভূমির কারণে একটি সবচাইতে সুরক্ষিত এবং অতি সমৃদ্ধশালী গ্রামবাসীরা প্রায়ই লিপ্ত হতো যুদ্ধে, তাদের আশওয়াশ এবং খানেতের ভাইদের সাথে এবং তাদের ফসলগুলি সাধন করে, তাদের সীমান্তকে সন্ত্রাসিত করতো। তারা তাদের সিংওয়ালা গরু মোষ এবং ঘোড়ার উৎপন্ন দ্রব্যের জন্য ছিলো সমৃদ্ধ। তারা এগুলোকে তাদের প্রতিবেশীদের কাছে এবং রুশ গ্যারিসনে বিক্রি করতো। নামটি এখন কেবল দেয়া হয় একটি পল্লীকে, শেল এর উদ্যানে তাকে যার কোন পাখা নেই, সে এখন এই পাখার উপর তার ঝোলা চড়াক, যার কোন পর্দা নেই, সে তার নিজের পিঠের উপর তা বহন করুক। আমাদের দুশমন খুচরার এখন আমাদের হাতে পড়েছে। চলুন আমরা তাকে তপ্ত করি একটা চিতা সাজিয়ে!*

"চিৎকারকারী গামলো এবং ছয়জন মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়লো খোচ্বারের উপর এবং তাকে বেঁধে ফেললো। খুনজাকের দীর্ঘ পার্শ্বদেশে তারা এমন এক অগ্নি প্রজ্বলিত করলো যে তার নীচে শিলাগুলি লাল উত্তপ্ত হয়ে উঠলো। তারা খোচ্বারকে আগুনের কাছে নিয়ে এলো। তারা তাদের তরবারী দিয়ে খোচ্বারকে হত্যা করলো। তারা তীক্ষ্ণধার বর্শাকে ভেঙ্গে দু'টুকরা করে ফেললো। এবং টুকরাগুলোকে নিক্ষেপ করলো আগুনে। কিন্তু বীর একবারও ভ্রূক্ষেপ করলেন না।

এখন আস খোচ্বার, আমাদের কিছু গেয়ে শুনাও, আমরা শুনেছি তুমি সঙ্গীতের একজন মাষ্টার, আমাদেরকে বাজিয়ে শুনাও। হ্যাঁ, আমি গান গাইতে পারি, কিন্তু আমার মুখ বন্ধ করা হয়েছে, আমি বাজাতে পারি অবশ্যই, কিন্তু আমার হাত দুটো যে বাঁধা। তরুণেরা চিৎকার করে বললো, খোচ্বারকে বন্ধন মুক্ত করে দেয়া হোক। কিন্তু বয়স্ক লোকেরা বললো, নেকড়ের বন্ধ থেকে আমরা নেকড়ের কর্ম আশা করি। তরুণেরা জয়ী হলো। বীরকে বন্ধনমুক্ত করে দেয়া হলো। শোন তোমরা হে খুনজাকের লোকেরা, আমি তোমাদেরকে একটি গান শুনাব এবং তোমরা ঘাসের উপরে আমাকে রক্ত দিও না। (তিনি সিদমের তালে তালে গান গাইতে থাকেন)।

৩. *পার্বত্য ছাগল, ক্যাপরা রকেশীন*

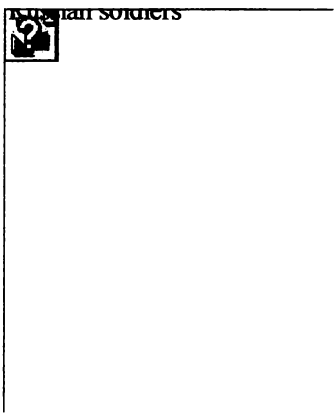
বিদেশের দেশে-বিদেশের বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে চেচেন যুদ্ধের উপর রিপোর্ট (১৯৯৯)

Russians stymied trying to seize town outside Grozny

December 3, 1999
Web posted at: 10:59 a.m. EST (1559 GMT)

From staff and wire reports

ARGUN, Russia (CNN) -- Russian military commanders retracted earlier claims that they had taken a key Chechen town outside Grozny on Friday, reporting instead that Russian forces have surrounded Argun and shelled Islamic militants who are inside the town.



Russian soldiers load ammunition into a tank near the town of Argun

The badly mismatched militants -- 500 rebels are reportedly battling 20,000 Russian soldiers -- have held off the Russians for three days on Grozny's doorstep. Argun is just five kilometers (three miles) outside the Chechen capital.

South of Grozny, where Russian forces have made little headway, a column of Chechens fleeing the fighting reportedly came under Russian fire. Survivors of the attack, on several cars and a bus, said at least 50 people were killed. The report could not be confirmed either independently or by Russian officials.

Russian troops have faced little resistance during their slow march from Chechnya's northern border -- towns such as Gudermes and Achkhoi-Martan surrendered without a shot fired when town leaders persuaded the rebels to evacuate. But as they neared Grozny, militant opposition stiffened.

Russia entered Chechen territory more than two months ago after Islamic rebels twice invaded the neighboring Russian republic of Dagestan from Chechnya, a rebellious Russian republic left out of Moscow's control following the disastrous 1994-1996 war.

Chechen Rebels Counterattack

Guerrilla Raids Recapture Towns Near Grozny; Russian Losses Mount

By Daniel Williams
Washington Post Foreign Service
Thursday, January 6, 2000; Page A13

SLEPTSOVSKAYA, Russia, Jan. 5—Rebel fighters defending Grozny, the besieged and bombed-out Chechen capital, are carrying out surprise raids in and around the city that appear to be throwing Russian forces off balance.

Reports from Grozny, and from refugees who recently fled the Grozny suburbs, say that the rebels have broken the ring of Russian armor and troops around the capital, at least temporarily, and occupied at least two adjoining towns. To the west, Alkhan-Kala was said to be under rebel control as late as this morning, and Alkhan-Yurt until Tuesday. To the east, the guerrillas made inroads into Khankala today, according to unconfirmed reports. All three towns were taken by the Russians more than three weeks ago.

Reports are necessarily incomplete and confirmation of fighting is complicated by Russia's tight control over information and limits on access to the front. In the past few days, official Russian announcements have all but dropped references to advances in Grozny, and today Defense Minister Igor Sergeyev said his forces were regrouping.

The reported Chechen counterattacks seem to call into question assumptions by Russian officials that the rebels could not hold out in Grozny for long because of a limited supply of ammunition and nearly continuous bombing and shelling. Rather than launch an all-out attack on the city and risk high casualties, the Russians have counted on long-range firepower to drive out the rebels.

In the first two months of the more than three-month-old ground offensive, Russian forces met little resistance as they swept through northern Chechnya and onto the plains south of the Terek River. Since mid-December, when the Russians began to probe Grozny, the rebels have put up stiff resistance. Chechen refugees here in Ingushetia, the Russian region west of Chechnya, predicted that when Ramadan, the Muslim month of fasting, ends on Friday, rebel attacks will intensify.

Latest News From the Front-Line

18 JAN 2000 Russians Have Not Entered Grozny
18 JAN 2000 Announcement from the Mujahideen Command with Regards to the Latest Events in Chechnya
17 JAN 2000 Enemy Forces Maintain Ferocious Bombardment Near Khankala
16 JAN 2000: Disastrous 'Undercover' Operation Led by Lieutenant-Colonel
15 JAN 2000: Announcement From the Mujahideen Command
15 JAN 2000 Vicious Battles Around the Town of Deberyort. Heavy losses amongst Russian Special Forces
14 JAN 2000 Congratulations to Our Brothers
14 JAN 2000 They Ran Back with a Humiliating Defeat
10 JAN 2000 The Martyrdom of a Number of Chechen and Foreign Mujahideen
09 JAN 2000 Russia is Bombing Argun Without Leniency
09 JAN 2000 The Day of Conquests
06 JAN 2000 O Allah! O Destroyer of the Armies, Destroy Them!
05 JAN 2000 Russian Forces do Not Cease to Undertake Losses
04 JAN 2000 Indeed Allah Defends Those who Have Faith
04 JAN 2000 A Statement From the Leadership in the Capital of Grozny
03 JAN 2000 The Mujahideen Surprise the Russians With Shamil's Attack
02 JAN 2000 Russian Special Forces Entered a Village...
01 JAN 2000 Allah Will be Sufficient for Them....

December 1999 News Archive
November 1999 News Archive

গ্রোজনীতে স্থল হামলা চালাতে রাশিয়া ভয় পাচ্ছে

চেচেন মুজাহিদদের প্রচণ্ড আক্রমণে ২৫০ জন রুশ সৈন্য নিহত

এপি ঃ চেচেন মুজাহিদদের প্রচণ্ড আক্রমণে ২৫০ জনের মত রুশ সৈন্য নিহত হয়েছে। প্রচণ্ড লড়াইয়ে চেচেন মুজাহিদরা একটি রুশ সেনা ইউনিটকে ঘিরে ফেলে তাদের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়। প্রতিবেশী ইঙ্গুসেটিয়া প্রজাতন্ত্রের উপ-স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলী দুদারভ বলেছেন, গতকাল সকালের দিকে রুশ সৈন্যদের এই মর্মান্তিক পরিণতি ঘটে। তিনি বলেন, রুশ কর্মকর্তারা তাকে বলেছেন যে, চেচনিয়ার উরুস-মারতান শহরের কাছে রাশিয়ার সেনা ইউনিটটি আক্রান্ত হয়।

তিনি বলেন, ওঁৎ পেতে থাকা চেচেন মুজাহিদরা রুশ সৈন্যদের উপর প্রবল শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। উভয়পক্ষে প্রচণ্ড লড়াই হয়। মুজাহিদদের আক্রমণে রণক্ষেত্রে ২শ' রুশ সৈন্য নিহত হয় এবং ৫০ জনকে ধরে নিয়ে যাওয়া যায়। পরে মুজাহিদরা এসব রুশ সৈন্যের গলা কেটে তাদের হত্যা করে।

গতকাল পৃথক এক ঘটনায় রুশ সৈন্যরা ৪০ জন চেচেন উদ্বাস্তুকে হত্যা করেছে। রুশ সৈন্যরা চেচেন রাজধানী গ্রোজনীর কাছে একটি উদ্বাস্তু বহরের উপর গুলী চালালে তারা প্রাণ হারান। বেঁচে যাওয়া উদ্বাস্তুরা একথা জানিয়েছেন।

রুশ কর্তৃপক্ষ গতকাল চেচনিয়া থেকে ইঙ্গুসেটিয়া প্রবেশের সীমান্ত পথগুলো বন্ধ করে দিয়েছে। তারা বলছে, বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থায় গোলযোগের ফলে উদ্বাস্তুদের কাজগপত্র পরীক্ষা করতে অসুবিধা হচ্ছে, এই কারণে সীমান্ত বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। তবে ইঙ্গুসেটিয়ার মন্ত্রী বলেন, রুশ কর্মকর্তারা তাকে বলেছেন যে, সীমান্ত বন্ধ করে দেয়ার আসল কারণ হচ্ছে একটি রুশ সেনা ইউনিট ধ্বংস হয়ে যাওয়া। সামরিক বিশ্লেষকরা বলছেন, এই খবর যদি সত্যি হয় তাহলে সাম্প্রতিক চেচনিয়া যুদ্ধে এটাই হচ্ছে রুশ বাহিনীর এযাবতকালের সর্ববৃহৎ ক্ষতি এবং চরম বিপর্যয়।

এই খবর সম্পর্কে রাশিয়ার সরকার কোন মন্তব্য করেনি।

অপর ঘটনায় উদ্বাস্তুরা জানিয়েছে, গতকাল দিনের প্রথমদিকে রুশ সৈন্যরা অত্যন্ত কাছ থেকে তাদের উপর গুলী চালায় এবং চেচেন উদ্বাস্তু বহনকারী বাসটি আগুনে জ্বালিয়ে দেয়। এতে ৪০ জন উদ্বাস্তু নিহত এবং ৭ জন আহত হয়। বেঁচে যাওয়া উদ্বাস্তুদের ইঙ্গুসেটিয়ার একটি হাসপাতালে চিকিৎসা করা হচ্ছে। তারাই সাংবাদিকদের কাছে এই বর্বরোচিত ঘটনা বর্ণনা করেছে।

উরুস-মারতানে রুশ বাহিনীর ভয়াবহ বিপর্যয়ের খবর যখন আসছে তখন রুশ কর্মকর্তারা গ্রোজনীর কাছে আরগুন শহরটিতে তাদের বিজয় ঘটেছে বলে দাবী করেছে। তারা বলছে, রুশ সৈন্যরা গুরুত্বপূর্ণ আরগুন শহরটি দখল করেছে। লড়াইয়ে বিপুলসংখ্যক চেচেন মুজাহিদ নিহত হয়েছে বলেও রুশ পক্ষ দাবী করেছে। স্বতন্ত্র কোন সূত্র থেকে মুজাহিদ হতাহতের কোন সমর্থন পাওয়া যায়নি। তবে চেচেন কর্মকর্তারা বলেছেন, সামরিক কৌশলগত কারণে চেচেন মুজাহিদদের আরগুন থেকে সরিয়ে রাজধানী গ্রোজনী ও উরুস-মারতানের আশপাশে মোতায়েন করা হয়েছে।

রাশিয়া গ্রোজনীতে স্থল হামলা চালাতে ভয় পাচ্ছে। তাদের আশংকা স্থলযুদ্ধে তাদের বিপুল ক্ষতি হতে পারে। ১৯৯৪-৯৬ সালের রক্তক্ষয়ী বিপর্যয়ের পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে। সে সময় রুশ বাহিনী গ্রোজনীতে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছিল।

নিঃসঙ্গ চেচেনরা যুদ্ধ করছেন

সাহাদত হোসেন খান

চেচনিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর গুদায়মেসের পতন ঘটেছে। রুশ সৈন্যরা রাজধানী গ্রোজনী ঘেরাও করে ফেলেছে। রুশ প্রধানমন্ত্রী ভ্লাদিমির পুটিন বলেছেন, গ্রোজনীর পতন না হওয়া পর্যন্ত অভিযানে বিরতি দেয়া হবে না। রুশ হামলায় হাজার হাজার বেসামরিক মানুষ নিহত হয়েছে। এ পর্যন্ত প্রায় ২ লাখ শরণার্থী পার্শ্ববর্তী ইঙ্গুশেটিয়া, দাগেস্তান ও জর্জিয়ায় আশ্রয় নিয়েছে। চেচনিয়া থেকে পালিয়ে যাওয়ার সময় রুশ জঙ্গী বিমানে হামলায় চেচেন বেসামরিক লোকজন নিহত হয়েছে। রাশিয়া বলেছে, বেসামরিক লেবাসে সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। তাই তাদের ওপর গোলাবর্ষণ করছে। কিন্তু রাশিয়ার এই বক্তব্য কেউ বিশ্বাস করছে না। রয়টারের একজন সাংবাদিক রুশ ট্যাংকের একটি গোলাবর্ষণের দৃশ্য ধারণ করেন। এই দৃশ্য পরে টিভিতে প্রচার করা হয়। তাতে দেখা গেছে, যাদের ওপর গুলী চালানো হয়েছে তাদের সবাই নারী, শিশু ও বৃদ্ধ। রুশ ট্যাংকের গোলায় এদের দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়।

চেচনিয়ায় কী ঘটছে বাইরের দুনিয়া তা জানতে পারছে না। রাশিয়া কোন বিদেশী সাংবাদিক ও প্রতিনিধি দলকে চেচনিয়া সফরের অনুমতি দিচ্ছে না। বিবিসি'র সংবাদদাতা বেন ব্রাউন ইঙ্গুশেটিয়া সীমান্ত থেকে সংবাদ পরিবেশন করছেন। তার প্রেরিত সচিত্র প্রতিবেদন টিভি'র পর্দায় যে কেউ দেখলে শিউরে উঠবেন। চেচনিয়ায় কোন মানুষ নেই। শুধু ট্যাংক আর ট্যাংক। আকাশে জঙ্গী বিমান ও হেলিকপ্টার, গানশীপ। জনমানবহীন প্রান্তরে রুশ সামরিক যানবাহনের গর্জন। একটানা গোলাবর্ষণ। এখানে-সেখানে কুণ্ডলি পাকিয়ে ধোঁয়া উঠছে। গোলার আঘাতে মাটিতে বিশাল গর্ত হচ্ছে। গত ৩০ সেপ্টেম্বর রাত থেকে এ তাণ্ডব শুরু হয়েছে। মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা স্যান্ডি বার্গার চেচনিয়া সংকটের কারণে রাশিয়াকে অর্থনৈতিক সহায়তা থেকে বঞ্চিত করার সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়ে বলেছেন, পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ ও গণতন্ত্রে উত্তরণের প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার জন্য রাশিয়াকে অর্থনৈতিক সহায়তা দিয়ে যাওয়া হবে। তিনি আরও বলেছেন, মার্কিন স্বার্থেই রাশিয়ার স্থিতিশীলতা প্রয়োজন।

চেচনিয়া সংকট দেখা দেয়ার পর ইউরোপীয় সহযোগিতা ও নিরাপত্তা সংস্থার শীর্ষ সম্মেলন ছাড়া আর কোন আন্তর্জাতিক বৈঠক হয়নি। আলোচনায় চেচনিয়া প্রসঙ্গ প্রাধান্য লাভ করলেও এ সম্মেলন থেকে চেচনিয়া সংকটের কোন সমাধান বের হয়ে আসেনি। প্রেসিডেন্ট ইয়েলৎসিনের সাথে মৃদু বাগবিতণ্ডা হলেও ইউরোপীয় নেতৃবৃন্দ মূলত রাশিয়ার কৌশলগত স্বার্থের পক্ষেই অবস্থান গ্রহণ করেন। রাশিয়া একথা ভাল করেই জানে যে, কসভোর মত চেচনিয়াকে রক্ষা করতে কেউ এগিয়ে আসবে না। রাশিয়া ও যুগোশ্লাভিয়া এককথা নয়, যুগোশ্লাভিয়ার না আছে পারমাণবিক অস্ত্র না আছে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা পরিষদে ভেটো প্রয়োগের ক্ষমতা। পক্ষান্তরে রাশিয়া নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য এবং তার হাতে এখনো মজুদ রয়েছে ১৯ হাজার পারমাণবিক অস্ত্র। তাই তাকে সবাই সমীহ করে। চেচনিয়াকে সে গুড়িয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিলেও জাতিসংঘ একচুল অগ্রসর হতে পারবে না। চেচনিয়ায় যুদ্ধ বন্ধের যে কোন প্রস্তাবে রাশিয়া ভেটো দেবে। ন্যাটো অথবা ইউরোপীয় সহযোগিতা ও নিরাপত্তা সংস্থাও কোন ঝুঁকি নেবে না। ওআইসি কি করবে তা তো জানাই আছে। বড়জোর মহাসচিব আজেদ্দীন লারাকি একটি বিবৃতি দেবেন। তিনি এ পর্যন্ত এর বেশী কিছু করতেও পারেননি। চেচেন প্রেসিডেন্ট আসলান মাসখাদভ ওআইসি'র সাহায্য চেয়ে তার কাছে একটি জরুরী বার্তা পাঠিয়েছেন। এ বার্তা পেয়ে ডঃ লারাকি তার মস্কো সফর বাতিল করেছেন। তিনি প্রেসিডেন্ট মাসখাদভের বার্তা মুসলিম দেশের রাষ্ট্রনায়কদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু এখনো কোন মুসলিম দেশ গা-ঝাড়া দিয়ে জেগে উঠেনি। মুসলিম দেশগুলোর এ নীরবতা ও নিষ্ক্রিয়তা আমাদের জন্য সত্যিই অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়। হয়তোবা মুসলমান হিসেবে জন্ম নেয়াটাই আমাদের জন্য দুর্ভাগ্য। আজ যদি চেচনিয়ায় খ্রীষ্টানরা মুসলমানদের মত এ দুর্ভোগের শিকার হত তাহলে কি সারা পৃথিবীর খ্রীষ্টান দেশগুলো ছুটে আসতো না? পূর্ব তিমুরে তো আমরা তাই দেখেছি। কি হয়েছে মুসলিম দেশগুলোর? রাশিয়া চেচনিয়ার ওপর নয়,

মস্কো ওয়াশিংটনের কাছে একটি গোপন বার্তা পাঠিয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, আমেরিকা চেচনিয়ার ব্যাপারে চুপচাপ থাকলে রাশিয়া ইরাকের ওপর ইঙ্গ-মার্কিন আগ্রাসনের ব্যাপারেও চুপচাপ থাকবে।

ফটো গ্যালারী



ঈমাম শামিলের প্রতিকৃতি



ঈমাম শামিলের স্ত্রী– সুআনেত



যুদ্ধ ক্ষেত্রে ঈমাম শামিল



তাপা চেরমোভ– জার দ্বিতীয় নিকোলাসের ব্যক্তিগত দেহরক্ষী বাহিনীর চেচেন সদস্য



চেচেন মুসলমানদের আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির নির্মাতাবৃন্দ



আলেক্সান্ডার চেচেনেস্কি– জারের সেনাবাহিনীর চেচেন কমান্ডার



ঈমাম শামিলের আর্টিলারী



জেনারেল এরমোলভ- উনিশ শতকে প্রতারণা ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে চেচেন জনগোষ্ঠীর প্রভুত ক্ষতি করেন



নায়েবদের সাথে ঈমাম শামিল



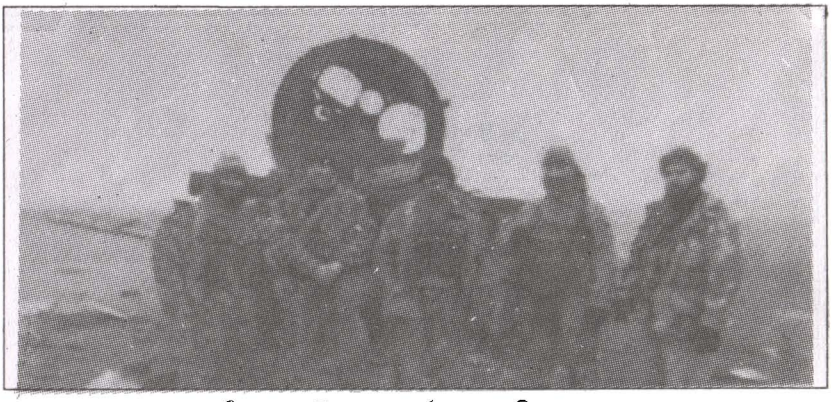
১৯৯৪-৯৫ সনে চেচনিয়া যুদ্ধে নিহত রুশ সৈনিকদের লাশ



স্ট্রিংগার মিশাইল হাতে চেচেন যোদ্ধা



স্ট্রিংগার মিশাইল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে চেচেন যোদ্ধারা–২০০০



যুদ্ধ বিধ্বস্ত রুশ ট্যাংকের পার্শ্বে চেচেন গেরিলা দল–২০০০



যুদ্ধে পর্যুদস্ত রুশ বাহিনী–২০০০



চেচেন মুজাহিদদের মধ্যকার সংলাপ–২০০০



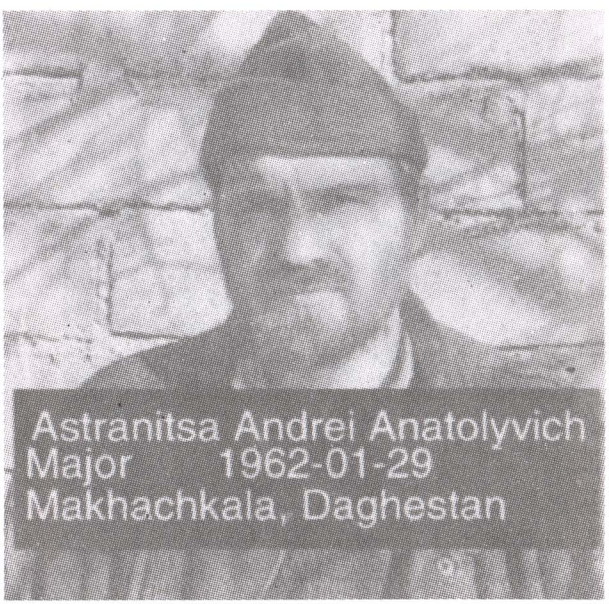
আক্রমণের মুখে রুশ বাহিনী–২০০০



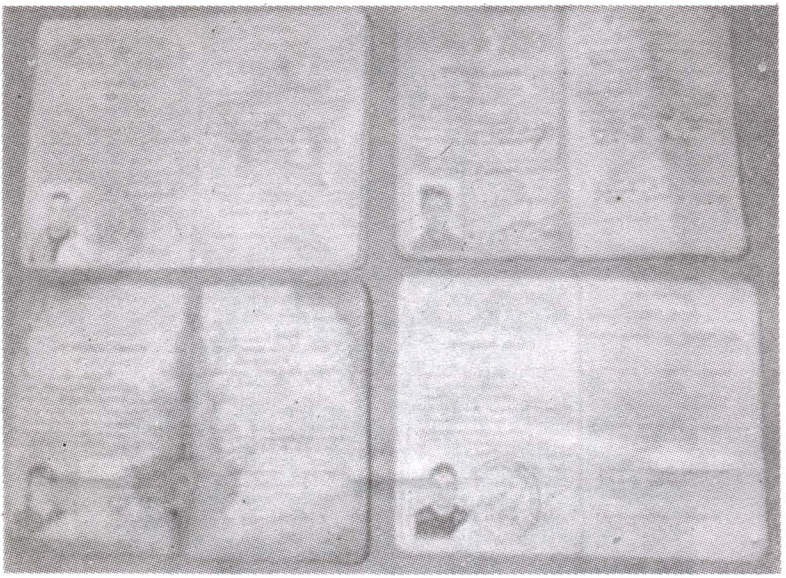
যুদ্ধে নিহত রুশ সৈনিকের লাশ–২০০০



রুশ কিশোর যুদ্ধবন্দী–২০০০



দাগেস্থানে বন্দী রুশ বিশেষ বাহিনীর মেজর–২০০০



আহত-নিহত রুশ সৈন্যদের পরিচয় পত্র–২০০০



রণাঙ্গনে দুই চেচেন যোদ্ধা



যুদ্ধে মারাত্মকভাবে আহত কমান্ডার শামিল বাসায়েভ



চেচেন যুদ্ধে শহীদ আরব যুবক আবু আনসার আস শামালী–২০০০



চেচেন যুদ্ধে শহীদ মিসরীয় যুবক আবু হাফস আল মিশরী–২০০০





রুশ গোলায় নিহত চেচেন শিশু



আহমেদ জাকিয়েভ– প্রাক্তন মন্ত্রী



মৌলভী উদাগভ– প্রাক্তন মন্ত্রী



লাওমা উসমানভ– আমেরিকায় চেচেন প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রদূত



ভ্লাদিমির পুটিন –রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট

এই কাহিনীর যোগসূত্র আমরা পাচ্ছি জারের সরকারের বিরুদ্ধে ইমাম শামিলের সংগ্রামে। ইমামকে দমন করার জন্য জারের এই অভিযান--উন্মুক্ত ময়দানে একতরফা লড়াই ছিলো না। শেষ পর্যন্ত এই সংগ্রাম সাময়িকভাবে ব্যর্থ হয়। কারণ এই সংগ্রাম পরিচালনা করেছিলেন মুষ্টিমেয় সংগতিবিহীন অথচ প্রচন্ড সাহসী যোদ্ধা এক সুবৃহৎ এবং সুসংগঠিত শত্রুর বিরুদ্ধে। ক্যাপ্টেন হামিদ ইমাম শামিলের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে মুসলিম জগতের সামনে নির্ভরযোগ্য তথ্য পরিবেশন করে উম্মাহর যথার্থ খেদমত করেছেন। তিনি পরিশ্রমের সঙ্গে তথ্য সংগ্রহ ও বাছাই করেছেন। আমার বিশ্বাস আগ্রহের সাথে এই বইটি পাঠ করা হবে এবং এই উত্তেজনাময় কাহিনীর বিবরণে এমনকি মৃত অন্তরও উত্তপ্ত হয়ে উঠবে।

- আই, এইচ, কোরেশী

এই সব পার্বত্য জনগোষ্ঠীর প্রতি আমাদের অবশ্যই শ্রদ্ধা নিবেদন করতে হবে। যারা প্রায় অর্ধ শতাব্দী জারের বিশাল সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। তাদের ঘর-বাড়ী ধ্বংস করে ফেলা হয়েছিলো। তাদের পরিবার পরিজনকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়; তবু তারা কখনো আত্মসমর্পন করতে চায়নি। তাদের বাগ-বাগিচা ও ফলের বাগানসমূহ আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলা হয় এবং তাদের জীবিকার সমস্ত উপায় ব্যর্থ করে দেওয়া হয়, তবুও তাদের সংগ্রামের নেশা ছিলো সর্বদাই প্রচন্ড। নিঃশংক চিত্তে তারা এই সব অত্যাচার ও ধ্বংসলীলার মোকাবেলা করে।

- গ্রন্থকার

মুসলিম মিলিটারী ইতিহাস সম্পর্কিত সাহিত্যে ইমাম শামিলের জীবন নিয়ে রচিত এই গ্রন্থ একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

- ফজল মুকীম খান
মেজর জেনারেলর (অবঃ)